ঃ উৎসর্গ ঃ

॥ শ্রীমতী কল্যাণী দেবী

শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু ॥

এই লেখকেব ঃ

॥ উপন্যাস ॥

নারী ও নগরী (৩য় সং)

ইরাবতী (২য় সং)

আরাকান (২য় সং)

উপকূল (২য় সং)

অন্যতমা (২য় সং)

পূর্বরাগ

মৃত্তিকাব বং

অবরোধ

বনকপোতী

॥ গল্প-গ্রন্থ ॥

পঞ্চরাগ

মৃগশিরা

সুরবাহার (২য়

স্বপ্নমঞ্জরী

প্রান্তিক

শঙ্খলিপি

সপ্তকন্যার কাহিন

অন্য দিগন্ত

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়



শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট,
কলিকাতা ৬

প্রথম সংস্করণ
কার্তিক
১৩৬৫

প্রকাশক
শ্রীভুবন মোহন মজুমদার, বি এস সি,
শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট্
কলিকাতা ৬

মুদ্রক
শ্রীভোলানাথ হাজরা
রূপবাণী প্রেস
৩১, বাদুড় বাগান স্ট্রীট্
কলিকাতা ৯

পাঁচ টাকা

শাল আর সুঁদুরি গাছের জঙ্গল মাঝে মাঝে গোলপাতার ঝোপ, আশ-শ্যাওড়া আর ঘোড়া-নিমের জটলা।

রাতের কথা তো ওঠেই না। দিনের বেলাতেই ঘুটঘুট্টি অন্ধকার। পাঁচ হাত দূরের মানুষ দেখা যায় না।

বাঘের ভয় আছে, সাপেরও, কিন্তু এ-সবের হাত থেকে কোন রকমে নিস্তার পাওয়া যায়। এক সঙ্গে অনেকগুলো মানুষ টিন পিটতে পিটতে আর চেঁচাতে চেঁচাতে গেলে বাঘ ধারে কাছে ঘেঁসে না, সাপ থাকলেও সরে যায়। কিন্তু বিশালের হাতে বাঁচোয়া নেই। সঙ্গের ধন-অলঙ্কার তো যাবেই, প্রাণ নিয়েও বেশী লোক কোপাই চণ্ডীর এ জঙ্গল পার হ'য়ে যেতে পারে না।

একলা নয়, জনদশেক অনুচর আছে। সারা জঙ্গলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। কখনো গাছের ওপর, কখনও জঙ্গলের ফাঁকে। একটু সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় না, পায়ের আওয়াজও নয়, হঠাৎ জঙ্গল ফুঁড়ে যেন সামনে এসে দাঁড়ায়। যমের চরকেও হার মানান চেহারা। কপালে ত্রিপুণ্ড্রক, ঝাঁকড়া চুলে লাল কাপড়ের ফেট্টি বাঁধা, গলায় শঙ্খের মালা, হাতে ভোজালী কিংবা তেলচুকচুকে লাঠি।

জিনিস দিতে একটু দেরী হ'লে আর ক্ষমা নেই। তাজা রক্তে গোল পাতার ঝোপ স্নান করে ওঠে। রুক্ষ মাটি ভিজে যায়। একটা আর্তনাদ কিংবা কিছুক্ষণ ধরে অস্পষ্ট গোঙানি, ব্যস একটা মানুষের পরমায়ুর ইতি। পরনের কাপড়টি পর্যন্ত এরা খুলে নিয়ে যায়।

দু'একজন বেঁচে যায়। যারা সঙ্গে সঙ্গে লুকোনো জিনিস এদের

হাতে তুলে দেয়। পরনের কাপড়টি টান দিয়ে খুলে ফেলে বলে, দেখো বাবারা, আর কোথাও কিছু নেই। শেষ তামাটি পর্যন্ত তোমাদের হাতে তুলে দিয়েছি।

তাদের ভাগ্যে দু'একটি চড় চাপড়। অবশ্য তাতেই দিন তিনেক ব্যথা থাকে। নড়ে বসতে পারে না। তবু প্রাণটা বাঁচে।

মেয়েছেলে নিয়ে লোকেরা পারতপক্ষে এ পথ দিয়ে হাঁটে না। যতই তাড়া থাক। কিন্তু পুরুষ থাকলে একটু ঝক্কি নেয়। এ ছাড়া উপায়ও নেই। অনেকটা ঘুরপথ হয়।

ভুবনপুরের চটি থেকে সদব রাস্তায় যেতে হ'লে অন্ততঃ পাঁচ ক্রোশ পথ বেশী। তাও না হয় যাওয়া যায় টুক টুক ক'রে, কিন্তু পথে বাণেশ্বরী নদী। নদী তো নয়, সাগর। এপার ওপার দেখা যায় না। তা ছাড়া স্রোতের কি ফোঁসফোঁসানি। একটা কুটো ফেললে তিন টুকরো করে দেয়।

বর্ষাকালে এপার ওপার করতে কোন মাঝিই সাহস করে না। বললে, হাত যোড় করে, না গো বাবু, বর্ষায় বাণেশ্বরীর বুকের ওপব দিয়ে বাইতে পারব না। ঘূর্ণি আছে, সোঁত রয়েছে, বেকায়দায় পড়লে আর দেখতে হবে না।

মাঝিরা কিনারায় বেয়ে বেয়ে মাছ ধবে, গুগলী ধরে, কেউ পার হ'তে চায় না। হাজার টাকা দিলেও নয়।

কাজেই কোপাইচণ্ডীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাওয়া ছাড়া আর উপায় থাকে না।

কম করেও মাইল তিনেক। তাও কি সোজা পথ। কোন কোন জায়গায় পথই নেই। কাঠুরেদের পায়ে চলা সরু পথও মিলিয়ে যায়। পথ হারিয়ে মানুষ এদিক ওদিক ঘোরে।

ভুবনপুরের চটিতে অনেকে অপেক্ষা করে। দল ভারী হ'লে তবে যাত্রা শুরু হয়।

মাঝে মাঝে অবশ্য সুযোগও জোটে। জমিদারের খাজনা নিয়ে দপ্তরে লোক জমা দিতে যায়। সঙ্গে চকচকে বর্শা আর গাদা বন্দুক। লোক-লস্করও কম নয়। সেই সঙ্গে যাত্রীরাও নির্বিঘ্নে পার হ'য়ে যায়। কিন্তু সে তো বছরে বার দুই-তিন, তার বেশী নয়। তাও তাদের নির্দিষ্ট সময় থাকে না। বেশীর ভাগ যাত্রীই বরাত ঠুকে বেরিয়ে পড়ে। কপালে মৃত্যু থাকলে আর খণ্ডাবে কে!

প্রাচীন লোকেরা বিশাল সর্দারের কাহিনী জানে। পেট থেকে পড়েই সে সর্দার হ'য়ে ওঠেনি। রামনিধি ঘোষালের ছেলে। লোকে বলে বাপখেকো। জন্মাবার আট দিনে বাপ ওলাউঠায় চোখ বুজল। মা গেল সাত মাসের মধ্যে। পাড়ার লোকেরা পরামর্শ করে বিশালকে দূরসম্পর্কের এক খুড়োর কাছে দিয়ে এল।

খুড়োর তিন বৌ, ঘর ভর্তি ছেলেপুলে। বিশালকে প্রথমে অস্বীকারই করল, তারপর পাড়ার মাতব্বরদের চাপে নিমরাজি হ'ল। কিন্তু বৌরা এগিয়ে এল না, কোলে তুলে নিল বাগদী ঝি সৈরভি। বুকের দুধ দিয়ে সেই মানুষ করে তুলল।

তখন বিশাল নয়, বিশু, বিশ্বেশ্বর।

বিশু খুড়োর সংসারে চাকরের মতনই মানুষ হ'তে লাগল। পাঁচনবাড়ী নিয়ে মাঠে যায়, সঙ্গে গরুর পাল। গোয়াল নিকোয়, উঠান দাওয়া ঘরদোর ঝাঁট দেয়, রাজ্যের লোকের ফরমাশ খাটে। ওরই ফাঁকে মাটির পিদ্দিম জ্বেলে অক্ষর চেনার চেষ্টা। কিন্তু সে চেষ্টাও বেশীদিন চলল না। খুড়োর নজরে পড়ে গেল।

একটু রাত ক'রে খুড়ো বেপাড়া থেকে ফিরছিল। দাবার আসর শেষ করে। ঝাঁপের ফাঁক দিয়ে আলো দেখতে পেয়েই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল।

গোয়ালঘরের পাশেই ছোট্ট আর একটা চালা। খুদের বস্তা,

খোল জাব ঠাস বোঝাই। চালে মাকড়শার জাল, নিচে সাপের আস্তানা। ভাঙা নড়বড়ে একটা তক্তপোশ। তার ওপরই বিশুর সংসার। গোটা তিনেক ছেঁড়া কাপড়, একটা উড়ুনি তাও সাত তালি দেওয়া, একটা ছাতা, এক সময়ে রং কাল ছিল, এখন ফ্যাকাসে। একটা তেলচটচটে বালিশ আব একটা মাতুব। কাজকর্ম সেবে বিশু এখানে এসে শুয়ে পড়ে। প্রায়ই এক ঘুমে রাত কাবাব।

মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে যায়। আচমকা গোঙানির আওয়াজে। ঠিক তক্তপোশের নিচে ব্যাঙেব আর্তনাদ। কারণও বিশুব অজানা নয়। একটু পরে নজবেও আসে ব্যাঙটা মুখে ক'বে এঁকে বেঁকে কোণে রাখা ঝুড়িব মধ্যে গিয়ে ঢুকছে। ম্লান চাঁদেব আলোয় চিক চিক ক'রে মসৃণ দেহ।

দু'হাঁটু বুকেব মধ্যে জড় কবে বিশু নিথব হ'য়ে বসে থাকে। তারপর এক সময়ে ক্লান্ত দেহটা নেতিয়ে পড়ে মাতুবেব ওপব।

ঝাঁপেব ফাঁকে চোখ বেখেই খুড়ো চিৎকাব কবে উঠল, হাবামজাদা, তাই তো বলি, মাসে এত তেল খবচ হ'চ্ছে কেন? তুমি মাঝ বাত্তিবে পণ্ডিতি জাহিব কবছ? বিদ্যে ফলাচ্ছ?

তাবপবই চুলেব মুঠি ধ'বে এলোপাথাড়ী মাব।

সেই থেকে বিশু সাবধান হ'যে গেল। কাপড়েব ভাঁজে ছেঁড়া বইটা মাঠে নিয়ে যেতে শুরু কবল। কোন অসুবিধা নেই। অঢেল সময়। গরুব পাল ছেড়ে দিয়ে গাছেব নিচে বই খুলে বসল।

কিন্তু বিধি বাদী।

গাঁয়েব পঞ্চানন চক্রবর্তী মাঠ পাব হ'য়ে সদবে যাচ্ছিল। ব্যাপার দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

পঞ্চাননের নিজেব কাজ বলে কিছু নেই। এ জীবনটা প্রায় পরের কাজেই কাটাল। কোথায় বাঁশঝাড় নিয়ে ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া বেধেছে, পঞ্চানন দু'ভাইকে উস্কানি দিয়ে মকদ্দমা বাঁধাল।

ছোট আদালত থেকে বড় আদালতে। ছোট উকিলের কাছ থেকে বড় উকিলের কাছে। পঞ্চাননের স্নান আহারের সময় নেই। তদ্বির, তদারক সব কিছুর ভার তার ওপর।

কোন বাড়ীর বিধবা মেয়ে ঘাটে যাবার পথে কার দিকে চেয়ে একটু মুচকি হেসেছে, পঞ্চাননের নজরে পড়লে আর রক্ষা নেই! ব্যাপার পঞ্চায়েত অবধি গড়াল। তিল, তুলসী, গোবর খেয়ে প্রায়শ্চিত্ত। তেমন তেমন হ'লে, একঘরে। ধোপা, নাপিত, বন্ধ। পাড়ার পুকুরের জল পর্যন্ত সরতে পারবে না।

পাড়ার মেয়েরা আড়ালে বলে, নারদমুনি। ঢেঁকিতে চড়ে সর্বদাই পাড়া টহল দিচ্ছে। এ বাড়ির কোঁদল ও বাড়ি নিয়ে যাচ্ছে। ঘরের কথা হাটের মাঝখানে।

বিশুকে নজরে পড়তেই পঞ্চানন আর দাঁড়াল না। হনহন করে একেবারে তার খুড়োর বাড়ী।

উঠানে দাঁড়িয়ে নরহরি ধান মাপছিল, পঞ্চাননকে দেখেই মুখটা শুকিয়ে গেল।

বাড়ীতে তিনটি বৌ। সব সময়ে সবাইকে চোখে চোখে রাখা সম্ভব নয়। কার কি বেচাল পঞ্চাননের চোখে পড়ল, ভগবান জানেন।

আড়চোখে পঞ্চাননের দিকে চেয়ে শুকনো গলায় বলল, ওরে টেঁপী, তোর পঞ্চুজ্যাঠা এসেছে, দাওয়ায় একটা আসন পেতে দে।

পঞ্চানন হাত নাড়ল, উহুঁ আমার বসবার সময় নেই। ঘাড়ের ওপর তিন তিনটে মামলা ঝুলছে।

তিনটে?

হ্যাঁ। এ পাড়ায় শান্তিতে থাকবার যো আছে। কিছু না কিছু একটা লেগেই আছে। আরে, হারাধনের কাণ্ডটা দেখ। রাতারাতি বেড়া সরিয়ে দিয়েছে প্রায় আধ হাত। কুলগাছ অবধি সীমানা ছিল। বাঁশের খুঁটি এগিয়ে নিয়ে গেছে চালতাগাছ বরাবর।

তারপর দিগম্বর মালো জাল ফেলে রায়েদের পুকুরের চুণো-পুঁটিটা পর্যন্ত তুলে নিয়েছে। শুধু তুলে নেওয়া? এক রাতে দশ মাইল রাস্তা পাড়ি দিয়ে ভুবনপুরের হাটে সব বেচতে বসেছিল। ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। রায়েদের গোমস্তা তোলা আদায় করতে হাটে ঘুরছিল, পড়বি তো পড় একেবারে তার সামনে। ব্যস, মামলা রুজু।

মনে মনে বিরক্ত হ'য়ে উঠল নরহরি। ধানমাপার দেরী হ'য়ে যাচ্ছে। মিছিমিছি মানুষগুলোকে আটকে রাখা। এ কাজ শেষ হ'লে খেতের কাজ আছে। কিন্তু নিরুপায়। মুখে বিরক্তির একটা আঁচড় প্রকাশ পেলেই সর্বনাশ। পঞ্চাননকে চটিয়ে এ গাঁয়ে বাস, কুমীর তাতিয়ে খালে বাস করার সামিল।

ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে নরহরি বলল, ঈস, দেখো কাণ্ড। তাবপর উঠানের দিকে চেয়ে বলল, নে, নে, বাবারা, তোরা আর দাঁড়িয়ে থাকিসনি। মাথার ওপর উঠে গেছে সূয্যি। ধানমাপা শেষ করতেই বেলা পড়ে যাবে।

পঞ্চানন ব্যাপারটা কিছুটা আঁচ করল। গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, তা'হলে মুখুজ্জে, ব্যস্ত আছ, অন্য সময় আসব এখন।

নরহরি প্রমাদ গুণল। হন্তদন্ত হ'য়ে এসে পঞ্চাননেব ছুটো হাত চেপে ধরল, ক্ষেপেছ। তুমি দয়া করে বাড়ীতে পায়ের ধুলো দিয়েছ আর আমি ব্যস্ত আছি? ধান মাপা তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। কাল হবে, পরশু হবে। ওরে কে আছিস্। তোদের কি ম'লে আক্কেল হবে? পঞ্চুদা এসে বসে আছে, এখনও তামাক দেবার সময় হ'ল না।

কাজ হ'ল। পঞ্চানন ছু'হাত তুলে বলল, তোমার কেমন ব্যস্ত-বাগীশ স্বভাব মুখুজ্জে। আরে তামাক খাওয়াও তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। তোমাকে যে কথা বলতে এসেছি শোন।

ততক্ষণে ছোট ছেলে, হরিশ এসে চৌকাঠে দাঁড়িয়েছে। তার

দিকে চেয়ে নরহরি নির্দেশ দিল, ওরে শিগ্গির আন। দেখিস, বামুনের হুঁকো আনবি। কড়ি বাঁধা আছে। গোলমাল করে ফেলিসনি।

অন্য কেউ হলে এত কথা বলবার দরকার ছিল না। হরিশ একটু পাগলাটে ধরনের। মৃগীরোগ আছে। এক কাজ বললে আর এক কাজ করে। পঞ্চাননের সামনে কায়েতের হুঁকো এনে ধরলে মুখুজ্জেকে আর এ গাঁয়ে পরিবার ছেলেপুলে নিয়ে বাস করতে হবে না।

তামাক এল। চোখ বন্ধ করে পঞ্চানন বার কয়েক টান দিয়ে হুঁকোটা মুখুজ্জের হাতে তুলে দিল।

ঠাকুরের প্রসাদ নেবার ভঙ্গিতে মুখুজ্জে ভক্তিভরে হুঁকোটা হাতে তুলে নিল।

রামনিধির ও কুষ্মাণ্ডটাকে তুমি কিসের আশায় পুষছো হে মুখুজ্জে ?

কিসের আশায় ? মুখুজ্জে হাত দিয়ে সশব্দে কপাল চাপড়াল।

আশা আবার কিসের পঞ্চুদা। বাপখেকো মাখেকো ছেলে। তিনকুলে কেউ কোথাও নেই। আমার তো জান দয়ার শরীর। আমি না রাখলে শেয়াল কুকুরে টেনে নিয়ে যেত। তাই ভাবলাম, যা-হোক লতায় পাতায় একটা সম্বন্ধ যখন রয়েছে, থাক বাড়ীতে। দু'বেলা দু'মুঠো ভাত, আর পরনের ত্যানা বই তো নয়। কতদিকে কত টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে।

মুখুজ্জে মুখে চোখে স্বর্গীয় উদারতার একটা ভাব ফোটাবার চেষ্টা করল।

তা'হলে এক কাজ কর। আমাকে তো মাঝে মাঝে কলকাতায় যেতেই হয়, খরচপত্র দাও আমি ওকে সঙ্গে করে শহরে নিয়ে যাই।

এবার মুখুজ্জের অবস্থা কাহিল। এ আবার কি কথা। ছোঁড়া

তিনজন যোয়ান পুরুষের কাজ দেয়। ওকে ছাড়লে মুখুজ্জের চলবে কি ক'রে!

শহরে? বিস্মিত গলায় মুখুজ্জে প্রশ্ন করল।

হ্যাঁ, বিদ্যেসাগরের হাতে একেবারে তুলে দিয়ে আসি।

মুখুজ্জে অনেকখানি হাঁ করে ফেলল। ব্যাপারটা কি? নেশা ভাং পঞ্চানন করে বটে, কিন্তু তার তো সময় আছে। আর কোন দিনই পঞ্চানন মাত্রা ছাড়ায় না। বেফাঁস কথা একটি বেরোয় না মুখ দিয়ে।

ব্যাপারটা পঞ্চাননই ভাঙ্গল।

ওর হাতে আবার গরু বাছুর ছেড়ে দেয় মানুষে। তোমার যেমন কাণ্ড। গাছের ছায়ায় বিশেটা-বই নিয়ে মশগুল আর এদিকে বাছুরদের পোয়া বারো। বাঁটে আর দুধ রাখছে না।

এই ব্যাপার। মুখুজ্জে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। মনে ভেবেছিল কি জানি কোন ছিদ্রপথে এই শনির নজর পড়েছে। পঞ্চায়েতের কর্তাদের খুশী করতে গাছের ফলপাকুড়, তরি-তরকারি যাবে। তেমন তেমন হ'লে ঘরের কড়ি।

পঞ্চানন বলেই চলল, তাই বলছিলাম, ওকে নিয়ে যাই। সংস্কৃত কলেজে একেবারে খোদ বিদ্যেসাগরের হাতে তুলে দিয়ে আসি। বলি, নিন মশাই, আপনি যেমন বিদ্যেসাগর তেমনি বিদ্যেপগাড় ধবে এনেছি। মানুষ করুন।

কথা শেষ করে পঞ্চাননের উচ্ছ্বসিত হাসি। নিজের রসিকতায় নিজেই আত্মহারা।

কিন্তু মুখুজ্জে মশাইয়ের মেজাজ তখন সপ্তমে। রক্ত টগবগ করে ফুটছে।

চালের বাতা থেকে মোটা লাঠি বের করে বিপুল বিক্রমে ঘোরাতে লাগল।

আজ আমি বিশুকে খুনই করব। তোমাকে এই বলে রাখলাম পঞ্চুদা, তুমি দেখে নিও। ওর হাড় একজায়গায়, মাস একজায়গায় করব। রক্ত দেখব, তবে আমার নাম নরহরি মুখুজ্জে। উঁঃ, দুধকলা দিয়ে কালসাপ পোষা। তাই বলি, অত টাকা দিয়ে কেনা দুধেল গাই, অথচ এক ফোঁটা দুধ পাই না।

পঞ্চানন উঠে পড়ল।

উঠি মুখুজ্জে, এরপর আবার ঘাটে ফেরি পাব না। দেরী হ'য়ে যাবে।

খড়মজোড়া পায়ে গলাতে গলাতে সান্ত্বনার ভঙ্গিতে বলল, বিশেষ মারধোর কর না। শুধু বেশ ক'রে ধমক দিয়ে দিও। ওতেই কাজ হবে। তা কথাটা ঠিকই বলেছ, দুধকলা দিয়ে কালসাপ পোষাই বটে। ভাগ্যিস আমার নজরে পড়ল।

পঞ্চাননের খড়মের শব্দ মিলিয়ে যেতেই তিন বৌ ঘোমটা টেনে দাওয়ায় এসে দাঁড়াল।

পঞ্চানন বাড়ীতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে তিনজনেব বুকের ধুকপুকুনি শুরু হয়েছিল। কি জানি, আবার কি হাঙ্গামা বাঁধাবে!

কি বলে গেল গো পঞ্চানন? বড় বৌ ঘোমটা একটু সরিয়ে নথের ফাঁক দিয়ে কথাগুলো বলল।

আড়ালে পঞ্চানন বলেই ডাকে। পাড়ার দু'একটা বৌ আরও খারাপ নামও করে। বলে পেঁচোভাস্থর। যে বাড়ীর চৌকাঠ মাড়াবে সে বাড়ীতে কান্নাগোল তুলে ছাড়বে।

অন্য কেউ হ'লে, বাড়ীর বৌরা ঠিক আড়ি পাতত। দরজার পিছনে এসে দাঁড়াত, ঘোমটা টেনে।

কিন্তু পঞ্চাননের বেলা সাহসে কুলোয়নি। কোন রকমে যদি ঘোমটার একটু কোণও নজরে পড়ে যায়, তা' হলেই সর্বনাশ। পাড়ায় পাড়ায় বলে বেড়াবে, মুখুজ্জেবাড়ীর মতন এমন বেহায়া বৌ কোথাও

দেখিনি। লোকজন এলে বেআব্রু হ'য়ে প্যাঁট প্যাঁট করে চেয়ে থাকে। ছি, ছি, ছি, ঘেন্না ঘেন্না।

মুখুজ্জে তেতেই ছিল। কথাটা বলল তিন বৌকে।

ভাত ছড়ালে আবার কাকের অভাব। দেবো বিশেটার ঘাড় ধরে তাড়িয়ে। এ বাড়ীতে আর ঢুকতে দেব না। যার বুকে বসবে, তারই দাড়ি ওপড়াবে।

তিন বৌ কথাটা শুনল, কিন্তু টুঁ শব্দ করল না। কোন উত্তর নয়। ভাত ছড়ালে কাকের হয়তো অভাব হবে না, কিন্তু কাকে তো আর গৃহস্থর অর্ধেক কাজ করে দেবে না। ভোর থেকে সারারাত অবধি গতর খাটাবে না। কাজেই তাড়িয়ে দেওয়া একটা কথার কথা।

সত্যিই তাই। মুখুজ্জে তৈরীই ছিল। গোয়ালে গরু বেঁধে বিশু উঠানে এসে দাঁড়াতেই চোরের মার শুরু হল। চোখে দেখা যায় না। উঠানে অজ্ঞান হয়ে পড়তে বড় বৌ ছুটে এল।

কি পাগলামী করছ? মেরে ফেলবে নাকি ছেলেটাকে! তারপর হাতে দড়ি পড়বে যখন?

অবস্থা দেখে মুখুজ্জেরও একটু ভয় হয়েছিল। লাঠিটা ফেলে দিয়ে গজগজ করতে করতে বলেছিল, মরবে না আরো কিছু। বাপমাকে গিলেছে, ওর মরণ কি আর অত সহজে হবে। বদমাইসি ক'রে ভিরমি গিয়েছে। থাক পড়ে, আজ ওর ভাত বন্ধ। পেটে কিছু না পড়লেই, রস ঝরে যাবে। বিটলেপনাও কমে আসবে।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশুর কাজও বাড়ল।

ধান ভাঙ্গা, পাঠশালায় ছেলেদের নিয়ে আসা, নিয়ে যাওয়া, খেতখামারে যোগান দেওয়া। ফাঁকে ফাঁকে মুখুজ্জে মশাইয়ের সঙ্গে সদরে যাওয়া।

ঠিক এমনি সময়ে বিশুর জীবনে নতুন এক ঘটনা ঘটল।

ছেলেদের পাঠশালায় পৌঁছে দিয়ে বিশু ফিরছিল। সোজা শড়ক ধরে ফিরলে দেরী হবে। এক রাশ কাজ পড়ে রয়েছে। ধানের গোছা গোলায় তোলা, জমির একদিকের বেড়া ভেঙ্গে গেছে, মজবুত দেখে বাঁশ কেটে বেড়া লাগান। তাছাড়া এদিক ওদিক ফাই ফরমাশ তো আছেই। সময় সংক্ষেপ করার জন্য বিশু সোজা জঙ্গলের পথ ধরেছিল। রাধাগোবিন্দজীর মন্দিরের কাছ বরাবর আসতেই দাঁড়িয়ে পড়ল। কে যেন ডাকছে, অথচ এদিক ওদিক চেয়ে কাউকেই নজরে পড়ল না।

কিগো কানে কালা নাকি?

অনেক ঠাওর করে তবে বিশু দেখতে পেল।

মন্দিরের ভাঙ্গা পাঁচিলের গা বেয়ে একটা সোনাচাঁপার গাছ। ঘন পাতার ফাঁকে ছোট একটি মুখ দেখা যাচ্ছে। প্রায় চাঁপার বরণ রং। কালো ভ্রমরের মতন কাজল দুটি চোখ। শ্রাবণের মেঘের মতন চুলের গোছা

বিশু পিছিয়ে গিয়ে গাছতলায় দাঁড়াল।

আমায় ডাকছ?

তা নয় তো আর কে রয়েছে এই জঙ্গলে? ড্যাব-ড্যাব করে আমার দিকে চাইছ কেন? চার ধারে চেয়ে দেখ, আর কোন মনিষ্যি আছে এখানে?

বিশু অপ্রস্তুত। বলল, কি বলবে বল?

পাতার গোছা দুলে উঠল। কচি ডালগুলোও নড়ল, তারপর ঝুপ করে এক শব্দ।

গাছের তলায় মেয়েটি লাফিয়ে পড়ল। জীবন্ত সোনাচাঁপা ফুলই যেন।

তুমি কোথায় থাক?

মুখুজ্জে বার বার সাবধান করে দিয়েছিল, খবরদার, সোহাগ

জানিয়ে কাউকে যেন সম্পর্কের কথা বলতে যেও না। রামনিধির সঙ্গে আমার লতায় পাতায় সম্পর্ক। সে-রকম সম্পর্ক ধরলে লালমুখো কালেক্টারও আমার ভায়রাভাই হয়।

সেই থেকেই বিশু সাবধান। খুড়ো বলে ডাকে ওই পর্যন্ত। সম্পর্কের কথা উঠলে বলে, কেউ নই। উনি দয়া করে আমায় আশ্রয় দিয়েছেন। আমি অনাথ।

সেই কথাই বলল, মুখুজ্জে বাড়ীতে থাকি।

কোন মুখুজ্জে? মেয়েটি সোনালী ভ্রূ দুটো ধনুকের মত বাঁকা করল।

নরহরি মুখুজ্জে। বামুনপাড়ার।

কে জানে, এ গাঁয়ের কাউকে চিনি না। মরুকগে, যেজন্য তোমায় ডাকছিলাম। গাছে উঠতে পার? চাঁপা গাছে?

বিশু হেসে ফেলল। অনেকদিন পরে জোর গলায় হাসল। মুখুজ্জে বাড়ীতে হাসবার উপায় নেই। অবকাশও নয়।

বলে কি মেয়েটা! তরতর করে বিশু খাড়া তাল নারকোল গাছে উঠে যায়। পায়ে দড়িও বাঁধে না। মুখুজ্জে পর্যন্ত তারিফ করে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে কাঁদি কাঁদি তাল দড়িতে বেঁধে নিচে ফেলে দেয়। আর এতো ঝাঁকড়া চাঁপাগাছ। অন্ধ মানুষও উঠে যেতে পারে ডাল ধরে ধরে।

এ আবার শক্ত কাজ নাকি?

এদিকে এসো? মেয়েটি হাত নেড়ে ডাকল।

বিশু কাছে যেতেই মেয়েটির গায়ে আলতো ছোঁয়া-ছুঁয়ি হয়ে গেল।

শীতকাল নয়, তবু যেন বিশুর সমস্ত শরীর শির শির করে উঠল। কাঁটা দিল সারা গায়ে।

বছর এগারো বারো বয়স হ'বে বৈকি, তার কম নয়। বাড়ন্ত

গড়নের জন্য বয়স একটু বেশীই দেখায়। এই বয়সে মুখুজ্জের দুই মেয়ে নেত্য আর আন্না শ্বশুরঘর করতে গিয়েছে। এত বড় কুমারী মেয়ে এ গাঁয়ে আছে বিশুর জানা ছিল না। কুলীনের মেয়েরা অবশ্য বড় থাকে। বিশ বাইশ বছর অবধি বিয়ের পাট নেই। সাদা সিঁথি নিয়ে ঘোরাফেরা করে। পাত্র পাওয়া নাকি মুস্কিল। কুলীনের মেয়েই হবে বোধ হয়।

ওই যে দেখছ মগডালে দুটো ফুল, পেড়ে দেবে ওই দুটো ?

এ আবার একটা কথা। মালকোচা দিয়ে বিশু তরতর ক'রে ওপরে উঠে গেল। কিছুক্ষণ আর দেখা গেল না। পাতার আড়ালে নিশ্চিহ্ন। তারপরই মেয়েটি উচ্ছ্বসিত হ'য়ে হাততালি দিয়ে উঠল। বিশু মগডালে পৌঁছে গেছে। হাত বাড়িয়ে ছিঁড়েও নিয়েছে ফুল দুটো।

মেয়েটি নিচে থেকে চেঁচিয়ে একবার সাবধান করে দিল, দেখো, পায়ে যেন লাগে না, তা'হলে রাধাগোবিন্দজীর পূজো হবে না ও ফুলে। খাটুনিই সার হবে।

বিশু নামতেই মেয়েটি এগিয়ে গিয়ে আঁচল মেলে দিল।

দাও, ফেলে দাও কাপড়ের ওপর।

বিশু ফুল দুটো আঁচলের ওপর ফেলে দিয়ে মেয়েটির মুখোমুখি দাঁড়াল।

নামবার সময় পায়ে ফুল ঠেকার কথা কি বলছিলে ? ডাল ধরবার দিকে নজর ছিল কিনা, ভাল করে তোমার কথা শুনতে পাইনি।

মেয়েটি বিস্ময়ে দুটি চোখের তারা বড় করে ফেলল। লাল টুকটুকে ঠোঁট দুটো ফুলিয়ে বলল, তুমি কি রকম বামুনের ছেলে গো। গলায় তো তেলচিটে পৈতে ঝুলছে দেখছি। পায়ে ফুল লাগলে সে ফুলে ঠাকুরের পূজো হয় না, তা জানো না।

ও, পূজোর জন্য ফুল পাড়তে বললে ? আমি ভাবলাম তুমি খোঁপায় দেবে।

বিশুর কথার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটির সারা মুখে আবির ছড়িয়ে গেল। রোদলাগা কাচের মতন জ্বলে উঠল দু'চোখের তারা। দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়ে বলল, ছি, ও কথা বলতে আছে। আমি বিধবা মানুষ, আমি খোঁপায় ফুল পরব!

বিধবা! চমকে উঠে বিশু কয়েক পা সরে এল।

বিধবার কষ্ট তার খুব জানা আছে। মুখুজ্জে মশাইয়ের বোন অন্নদা। সম্পর্কে ওর পিসিই হয়। বয়স বড়ো জোর কুড়ি একুশ। একাদশীর দিন যেন নেতিয়ে পড়ে। উঠানে ঘুরে ফিরে কাজ করতে করতে বিশু কতদিন দেখেছে। দাওয়ার খুঁটিতে হেলান দিয়ে মড়ার মতন ধুঁকছে। ফ্যাকাসে মুখ, একফোঁটা জলের জন্য ঠোঁট দুটো শুকিয়ে কাঠ।

তেমনি কষ্ট হয় এই এক ফোঁটা মেয়ের!

কি, হাঁ করে চেয়ে আছ যে? দেখছ না থান পরে আছি। হাত খালি।

এবার কিন্তু মেয়েটির স্বর অনেক নিস্তেজ। রাগ নয়, কেমন একটা বিষাদের রেশ গলার আওয়াজে।

আচ্ছা, আমি চলি। খুব আস্তে আস্তে কথাগুলো বলে বিশু সরে যাচ্ছিল, হঠাৎ মেয়েটির চিৎকারে আবার ফিরে দাঁড়াল।

ঈস্ তোমার কপাল কাটল কি করে? রক্ত পড়ছে যে?

কপালে হাত দিয়ে বিশু বুঝতে পারল। কপাল থেকে ভ্রূ পর্যন্ত রক্ত গড়িয়ে এসেছে।

গাছে উঠতে গিয়ে খোঁচাটোঁচা লেগে গেল বুঝি?

বিশু ঘাড় নাড়ল। আগেই লেগেছিল। বোধ হয় ডালের খোঁচা লেগে নতুন ক'রে রক্ত ঝরতে শুরু হয়েছে।

মেয়েটিকে সে সেই কথাই বলল।

তা অমন জায়গায় লাগল কি ক'রে? পড়ে গিয়েছিলে বুঝি?

এবারও বিশু ঘাড় নাড়ল। না। যেখানে কাজ করি, তারা মেরেছে। কাজ করতে দেরী হয়েছিল বলে।

সত্যিই তাই, নরহরি মুখুজ্জের হাতের চিহ্ন নয়, মেজ বৌয়ের। বিশুর মেজো খুড়ি। নারকোল পাতা চিরে কাঠি বের করছিল বিশু। ঝাঁটা তৈরী হবে। পাহাড় প্রমাণ পাতা। বোধ হয় পঞ্চাশ গাছা ঝাঁটা হয়। কাজ করতে করতে একটু ঢুলুনি এসেছিল। খুঁটিতে হেলান দিয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন হ'য়ে পড়েছিল। মেজ বৌ ঘাট থেকে ফেরার পথে থমকে দাঁড়িয়েছিল। অবাক কাণ্ড গা। ছ'বেলা ছ'শানকী ভাত মারবার যম, আর কাজ করতে দিলেই গাফিলতি।

হাতের ঘটিটা দিয়েই তাই দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করে দিয়েছিল। এমন ভুল যাতে আর না হয়।

আহা। মেয়েটির ছটো চোখ জলে ভরে এল। ছ'এক পা এগিয়েও এল। আঁচলটা মুঠোর মধ্যে ধরে। তারপর কি ভেবে পিছিয়ে গেল।

কপালে হাত দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশুর মনে পড়ে গেল। সর্বনাশ. এতটা সময় যে এখানে কাটাচ্ছে, বাড়ী গিয়ে কি কৈফিয়ৎ দেবে। ওর কৈফিয়ৎ শুনছেই বা কে।

বিশু তীরবেগে ছুটতে শুরু করল। এখনও অনেকটা পথ। সময়ে না পৌঁছোতে পারলেই বিপদ। আবার অদৃষ্টে কি আছে কে জানে।

বরাত ভাল বিশুর। উঠান খালি। কেউ কোথাও নেই। নরহরি মুখুজ্জে জমিজমার ব্যাপারে সদরে গেছে আজ তিন দিন। বাড়ীর বৌরা বোধ হয় দিবানিদ্রায় অচেতন।

বিশু নিজের কাজ করতে শুরু করল।

পরের দিনও বিশু ঐ এক রাস্তা ধরল। মাঠে পা দেবার মুখে

একটু ভাবল। সামান্য ইতস্ততঃ ভাব। কি জানি আবার নতুন কোন ফরমাশের জন্য যদি দেরী হয়ে যায়। একদিন বেঁচেছে বলে রোজই বাঁচবে, তা কি বলা যায়। মারের হাত এড়ান রোজ কি আর সম্ভব।

বিশু মনকে বোঝাল, মাঠ ভেঙ্গে গেলে কম সময় লাগবে। রোজই তো এই পথ ধরেই যাচ্ছে। আজ নতুন নাকি!

চাঁপাগাছতলায় এসে বিশু দাঁড়াল। কেউ নেই। ঠাওর করে করে দেখল। আজও একটা সোনাচাঁপা ফুটে রয়েছে। মগডালে নয়, আরো নিচে। আজ কিন্তু চাঁপারঙা সে মেয়েটি ধারে কাছে কোথাও নেই।

বেশ কিছুক্ষণ বিশু ঘোরাফেরা করল। চাঁপাগাছতলায় বসলও একটুখানি। কিন্তু কেউ নেই। দু'একটা কাঠবেড়ালী ওঠা-নামা করল গাছের ডাল বেয়ে বেয়ে। অনেক দূরে ঘুঘুর একটানা ডাক। কোন গাছের ফোকর থেকে বার দুই তক্ষকও ডাকল।

বিশু উঠে পড়ল, আর দেরী করা সম্ভব নয়। নরহবি মুখুজ্জেব আজ ফেরার কথা। এতক্ষণে ফিরেছে কিনা কে জানে। বিশু জোর পায়ে চলতে শুরু করল।

আশ্চর্য, সারাটি দিন বিশুর কাজে মন লাগল না। গরুগুলোকে স্নান করাল, গোয়ালঘব ধুল, উঠান ঝাঁট দিল। খাওয়া সেবে নিজের বাসন খিড়কীব ঘাটে নিয়ে বসে বসে অনেকক্ষণ ধরে মাজল। কিন্তু মন রইল অন্য কোথাও। কেবল কে যেন ওর সামনে থান কাপড়ের আঁচল মেলে রইল। মিষ্টি গলায় বলল, দাও, দাও, আমার আঁচলে ফেলে দাও।

কি দেবে বিশু! কি তার দেবার আছে। নিজের এই ধিক্কৃত, নির্যাতিত জীবন? আজন্ম স্নেহের কথা দূরে থাক, নরম সুরের কোন কথাও বোধ হয় তার ভাগ্যে জোটেনি। কেউ সহানুভূতিমাখা

স্নুরে ওকে ডাকেও নি কোনদিন। আজ তাই একজনের প্রীতির আহ্বানে বিশুর সমস্ত জীবন যেন পাল্টে গেল।

কিন্তু অমন সোনাগলা রং মেয়ের, অথচ ভগবান সমস্ত রং মুছে নিল তার জীবন থেকে। এত অল্প বয়সে চিতার আগুন শুধু কাছের মানুষকেই নয়, তার ভবিষ্যতও পুড়িয়ে ছাই করে দিল।

মনে পড়ল বিশুর। নরহরি মুখুজ্জের কাছে প্রচণ্ড মার খাওয়ার পর, বাড়ীর ছেলেমেয়েরা তাকে ঠাট্টা করে বলত, বিদ্যাসাগর।

কথাটার মানে সে বোঝে নি। যারা ঠাট্টা করত, তাদের জিজ্ঞাসা ক'রেও সদুত্তর পায় নি। শুধু এইটুকু বুঝেছে, গরু ছেড়ে দিয়ে গাছের নিচে বই নিয়ে বসত ব'লে সবাই ওকে ওই নাম দিয়েছে। ওর বিদ্যার নাকি সীমাপরিসীমা নেই।

কথাটা অনেকদিন ধরে ওর মনে খচখচ করছিল। সেদিন সুযোগ জুটে গেল।

মাঠ থেকে ফিরছিল, দেখল বট গাছের নিচে টোলের পণ্ডিত কাশীপতি ন্যায়রত্ন মশাই উড়ুনি নেড়ে বাতাস খাচ্ছেন।

বৃদ্ধ মানুষ। পাকা আমের মতন টুকটুকে রং। মাথার একগাছি চুলও কালো নেই। দশখানা গাঁয়ের লোক সম্মান করে।

হঠাৎ বিশুর কি মনে হ'ল। এগিয়ে গিয়ে টিপ করে একটা প্রণাম করে ফেলল।

কে রে? কাশীপতি চোখ কুঁচকে দেখবার চেষ্টা করলেন।

আজ্ঞে আমি বিশ্বেশ্বর। কি ভেবে বিশু কদাচিৎ ব্যবহার করা নিজের ভাল নামটাই বলে ফেলল।

বিশ্বেশ্বর! কাশীপতির প্রশস্ত ললাটে চিন্তার আঁচড় পড়ল। বিশু লজ্জিত হ'য়ে বলল, আজ্ঞে, আপনি আমাকে চিনবেন না। আমি নরহরি মুখুজ্জের বাড়ীতে কাজ করি।

কাশীপতি দরাজ গলায় হেসে উঠলেন। সে হাসির রেশ প্রান্তরে প্রান্তরে প্রতিধ্বনিত হ'ল।

একটা হাত বিশুর মাথায় রেখে বললেন, বিশ্বেশ্বরকে চিনতে পারব এমন অহঙ্কার আমার নেই বাবা। তুমি চিনিয়ে না দিলে কার সাধ্য তোমাকে চেনে। তারপর একটু থেমে বললেন, নরহরি মুখুজ্জের বাড়ী কেন বাপধন, তোমার কাজ তো সারা বিশ্ব জুড়ে?

এত কথা বিশু বুঝল না। বোঝার চেষ্টাও করল না। কেবল কাশীপতি ন্যায়রত্নের পায়ের কাছে বসে বলল, একটা কথা জিজ্ঞেস করব আপনাকে।

কি বল? সস্নেহে কাশীপতি বিশুর দিকে চাইলেন।

আচ্ছা, বিদ্যাসাগর মানে কি?

মুহূর্তে কাশীপতি ন্যায়রত্নের চেহারা পাল্টে গেল। লাল রং আরো আরক্ত হ'য়ে উঠল। গালে, মুখে নীল শিরার জট। রাগে সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগল ঠকঠক করে।

বিদ্যাসাগর মানে, বিদ্যাসাগর মানে ব্রাহ্মণ কুলের কুলাঙ্গার, অর্বাচীন পাষণ্ড, কালাপাহাড়। প্রাচীন হিন্দু ধর্মের সর্বনাশ করতে যার জন্ম।

বিশু থতমত' খেয়ে গেল। হঠাৎ কাশীপতি এতটা চটে উঠবেন এমন একটা নিরীহ প্রশ্নে তা ভাবে নি। একদৃষ্টে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের দিকে চেয়ে রইল।

কাশীপতি থামলেন না, নিজের মাকে যে চটুল বাইজির পোষাক পরায়, স্বামীহীনাকে সহমৃতা হবার নির্দেশ না দিয়ে যে পুনর্বিবাহের বিধান দেয় তার নাম মুখে আনলেও শত গো-বধের পাপ হয়। হুঁ, দেবভাষা সংস্কৃতকে শোধন করে প্রাকৃত বাংলাভাষায় রূপান্তর করার অপচেষ্টা আরম্ভ করেছে মূঢ়। ঘোর কলি। এদেরই তো যুগ। মূর্খের অভ্যুদয়ের যুগ।

কথার সঙ্গে সঙ্গে লাঠিতে ভর দিয়ে কাশীপতি ন্যায়রত্ন উঠে দাঁড়ালেন।

হয়তো আরো কিছুক্ষণ বসতেন এখানে। রোদ একটু পড়ে গেলে তবে পথে পা দিতেন, কিন্তু উত্তেজনায় আত্মবিস্মৃত হলেন। বিশুর দিকে আর না ফিরে লাঠি ঠুকে ঠুকে হাঁটতে শুরু করলেন। উড়ুনিটা মাথার ওপর জড়িয়ে।

সেদিন থেকে বিশুর ধারণা হয়েছিল, বিদ্যাসাগর একজন ম্লেচ্ছ। জাত, ধর্ম কিছুই মানে না। অনেকটা বোধ হয় ও পাড়ার গাঙ্গুলী-মশাইয়ের বড় ছেলের 'মতন।

অবশ্য গাঙ্গুলীমশাইয়ের বড় ছেলেকে বিশু কোনদিন চোখেও দেখে নি। পাড়ায় শুনেছে। বাড়ীতে খুড়িমারা গল্প করেছিল, তাই কানে গিয়েছে।

বলিহারি সাহস। এ যেন একেবারে বাঘের গুহায় গিয়ে তার বাচ্ছা টেনে আনা। কুমীরের ছানা তুলে নিয়ে আসা কুমীরের সামনে থেকে।

কলকাতার কেল্লা। চারধারে গিজ গিজ করছে সেপাই সান্ত্রী। একশ গজ অন্তর ভারি ভারি জোর পাল্লার কামান। তার মধ্যে সব জাঁদরেল সায়েব মেমের বাস। সায়েব মেম খুড়িমারাও কখনও দেখে নি, কিন্তু বর্ণনার চটক শুনে বিশু অবাক।

শনের নড়ির মতন চুল। মাথায় বাহারে টুপি।

খিড়কীর পুকুরের ধারে সিঁদুরে আমের মতন সব রঙ। মেমরা আবার গালে আলতা মাখে। দিনরাত মদের চৌবাচ্ছায় ডুবে আছে। গন্ধে কাছে যায় কার সাধ্য। আজ-কাল বুঝি কয়েকটা সায়েব এদেশের লোকের দেখাদেখি গড়গড়া টানতে শুরু করেছে। কলকের মধ্যে তামাক দেয়, না মদ দেয়, ভগবান জানেন।

সেই কেল্লার সব চেয়ে যে বড় কর্তা, তার হঠাৎ খেয়াল হ'ল বাংলা

শিখবে। যে দেশের লোককে শাসন করতে এসেছে তাদের ভাষাটাই জানবে না, তা কি হয়।

চারদিকে লোক ছুটল। শুধু বাংলা জানা পণ্ডিত হ'লেই হবে না, কিছু কিছু ইংরেজি জানতেও হবে। নইলে বোঝাবে কি ক'রে সায়েবকে।

হু'একজন লোক পাওয়া গেল কিন্তু তারা কেউ রাজী নয়। কেল্লার ভিতরে গিয়ে পড়াতে পারবে না। সায়েবদের মতিগতির কিছু ঠিক নেই। জোর করে গোমাংস মুখে পুরে দিলেই হ'ল। জাত ধর্ম সব যাবে। খৃষ্টান হওয়া ছাড়া গতি থাকবে না। অবশ্য, সায়েবরা তো তাই চায়। যত লোক খৃষ্টান হয়, ততই ওরা দলে ভারি হবে।

শেষকালে অনেক ঘুরে ঘুরে গাঙ্গুলীদের বড় ছেলেকে পাকড়াও করল।

ছ ফুট চেহারা, ইয়া বুকের পাটা, পাকা কামরাঙার মতন গায়ের বর্ণ। বেশীর ভাগ সময়ই বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত শিকারের খোঁজে। পাখী আর হরিণ শিকার নয়, বাঘ আর বরা। কত যে মেরেছে, তার আর লেখা জোখা নেই। শিকারে গিয়েই সায়েবদের সঙ্গে আলাপ। তারাই ধরে নিয়ে গেল।

নিয়ে তো গেল। রোজ বিকেলে ফিটনে করে নিয়ে যায় নদীর ঘাট থেকে, আবার ফেরৎ দিয়ে যায়। সায়েবকে বাংলা পড়ান চলল।

এইখানে খুড়িমারা গলার আওয়াজ খাদে নামায়। ফিস ফিস করে কথা বলে। চাপা গলায় হাসি, মুখ চোখের অদ্ভুত ভঙ্গি।

ঢেঁকি বন্ধ করে বিশু চুপি চুপি জানলায় গিয়ে কান পাতে।

তারপর সায়েবের প্রথমভাগ শেষ হবার আগেই মেমের প্রেমের প্রথমভাগ শেষ। রোজ বিকেলে মেম ফিটন নিয়ে যেতে আসতে লাগল। কোন কাজে সায়েব না থাকলে, গাঙ্গুলীর কামাই নেই। ঠিক যেতে হ'ত কেল্লায়।

এই নিয়ে কেল্লার অন্য সায়েবরা তেতে লাল। কালা-আদমিকে নিকেশ কব।

কিন্তু নিকেশ করবে কি, তার আগেই কালা আদমি রাঙা-মুখো মেমকে নিয়ে হাওয়া।

বলিস কি দিদি? মেমকে নিয়ে হাওয়া কি লো?

অখাদ্যি কুখাদ্যি খায় তাকে নিয়ে এক ঘরে বাস? কি ঘেন্নার কথা মা।

অন্য খুড়িরা এ ওর গায়ে হেলে পড়ে নানা মন্তব্য করল।

ঝাঁটা মার, ম্লেচ্ছোর আবার জাতবিচার। বাপ বাড়ী ঢুকতে দেয় নি, মেমকে নিয়ে পশ্চিমে না কোথায় পালিয়েছে।

এই অবধি বিশু শুনেছিল। গাঙ্গুলীদের বড় ছেলে ম্লেচ্ছ। মেম নিয়ে ঘর করে।

বিদ্যাসাগর মেম নিয়ে পালায়নি বটে, কিন্তু হিন্দু ধর্মের আচার বিচার মানে না। মেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে চায়। বিধবা মেয়েছেলের বিয়ে দিতে চায় আবার।

কথাটা মনে হ'তেই বিশু চমকে উঠে বসল। চোখ ঘুরিয়ে এদিক ওদিক দেখল। মনের কথাটা আবার কেউ শুনে ফেলে নি তো।

চাঁপাতলায় দেখা সেদিনের মেয়েটিকে নিয়ে চুপি চুপি যাওয়া যায় না বিদ্যাসাগরের কাছে।

এই দেখ, এইটুকু মেয়ে, কাপড়েব পাড়ে রং নেই, চুলে তেল নেই, হাতে একগাছা চুড়িও নেই। একে আবার বিয়ে দিতে পার না। জীবনের সব রঙ যাতে ফিরে পায় তার ব্যবস্থা!

কি জানি বিদ্যাসাগর মশাই আবার কেমন লোক হবে। হয়তো চটেই উঠবে। চেঁচিয়ে বলবে, তোমার এত মাথা ব্যথা কিসের হে ছোকরা। রাজ্যের যত বিধবা এনে জড়ো করছ।

নরহরি মুখুজ্জের গলার আওয়াজে বিশুর চিন্তার সুতো ছিঁড়ে গেল।

বিশে, বিশে কোন চুলোয় গেল ?

গরুর জাবনা মাখা থামিয়ে বিশু ছুটে এসে দাঁড়াল।

শোন, বাতিটা নিয়ে চল আমার সঙ্গে। রাত বিরেতে চোখেও ভাল দেখি না। শেষকালে সাপ খোপের গায়ে পা দেব।

হাত ধুয়ে বিশু তেলের কুপিটা তুলে নিল। শালপাতার ঠোঙা আড়াল দিয়ে। জোর বাতাসে না নিভে যায়। হাতে একটা বাঁশের লাঠিও নিল।

এখান থেকে প্রায় মাইল দুয়েক। ভৈরব মিত্র। গাঁয়ের বর্ধিষ্ণু কায়স্থ। তাঁর বাড়ীতেই দাবার আসর। নরহরি মুখুজ্জের রোজ একবার ক'রে হাজিরা না দিলে পেটের ভাত হজম হয় না। আজকাল একটু অসুবিধা হয়। অনেকখানি একটানা হাঁটলে বুকেব ভিতর দুপদাপ করে। মাঝে মাঝে চোখেও একটু ঝাপসা দেখে। বৌরা বলে, বয়স হচ্ছে, তারই নিশানা।

নরহরি মাথা নাড়ে। আপত্তি জানায়।

এমন আর কি হ'য়েছে বয়স। আমার বাপ মহেশ মুখুজ্জে নব্বই বছর বয়সে বার দুই শ্রীক্ষেত্র গিয়েছিলেন। সেই বয়সেও আধখানা কাঁটাল একলা খেতেন। নরহরির বয়স বড় জোর আটান্ন। এ বয়সে কত লোক টোপর মাথায় দিয়ে নতুন বৌ আনে।

বয়সের জন্য নয়। পাড়ার অনঙ্গ কবিরাজ বলেন, বয়স নয়, নরহরি বয়স নয়। তোমার তো সবে যৌবন। অকালে জরার আক্রমণ হয়েছে। চোখে ছানি পড়বার আয়োজন হচ্ছে। আর হৃদরোগ বলেই মনে হচ্ছে। বুকের ব্যথাটাথা এ বয়সে ভাল লক্ষণ নয়। তুমি আমার এক কৌটো হৃদয়ারোগ্য বটিকা নিয়ে যাও কিংবা মালিসের জন্য বিশুদ্ধ ইঙ্গুদী তৈল। মাসখানেকের মধ্যে ঠিক হ'য়ে যাবে।

বটিকা আর মালিশ দুই নরহরি মুখুজ্জে কিনেছিল। ব্যবহারও

করেছিল মাস দুয়েক। ব্যথা একটু কমেছে, কিন্তু চোখের ছানি একই রকম। রাত হ'লেই অবস্থা কাহিল। সব কেমন ঝাপসা।

সদরে দুএকজন অন্য পরামর্শ দিল।

নরহরিদা, ওসব মালিস ফালিস ছাড়। টাকা যখন রয়েছে তখন সোজা কলকাতায় চলে যাও। অনেক সায়েব ডাক্তার এসেছে। ছানি কাটানোর কি সব যন্ত্রপাতিও এনেছে। দেখিয়ে এসো না একবার!

কথা শুনে নরহরি আঁতকে উঠেছিল। জলজ্যান্ত সায়েবের কাছে গিয়ে দাঁড়াবে চোখের ছানি কাটাতে! তার আগেই হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হ'য়ে যাবে। আর চোখ মেলে চাইতে হবে না। নদীর এপারে সায়েব দেখলে নরহরি অন্য পার দিয়ে হাঁটে।

একবার আদালতে কোথা থেকে ছিটকে এক সায়েব এসে পড়েছিল। মফঃস্বলের আদালতে এক আশ্চর্য ব্যাপার। নরহরির সামনাসামনি পড়ে যেতেই সে চোখ বন্ধ করে ফেলেছিল। হাতটা চাদরের মধ্যে ঢুকিয়ে আঁকড়ে ধরেছিল পৈতার গোছা। গায়ত্রী,. সূর্যস্তব তারপর গীতার দু-একটা শ্লোক আওড়াতেই কাজ হ'ল। সায়েব ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে সোজা উত্তরমুখো ছুটে গিয়েছিল।

সে কথা ভাবলে এখনও নরহরির বুকটা ঢিপ ঢিপ করে। এই থেকেই তার বুকের রোগ আরম্ভ হ'ল কিনা কে জানে।

সায়েব-ডাক্তার মাথায় থাক, নরহরির অনঙ্গ কবিরাজই ভাল।

বিশু বাঁ হাতি মোড় ঘুরতেই নরহরি ধমক দিয়ে উঠল, ওদিকে কোথায় চলেছ নবাবপুত্তুর।

সঙ্গে সঙ্গে বিশু দাঁড়িয়ে পড়ল। সেকি, এদিকে নয়তো কোথায়? ভৈরব মিত্রের বাড়ি তো বাঁ হাতি। রথতলা ছাড়িয়ে সোজা।

জমিদার বাড়িতে যেতে হবে। ডান দিকে ঘোর।

তেলের কুপি সামলে নিয়ে বিশু ডানদিকে ঘুরল।

জমিদার বাড়ির কাছ বরাবর গিয়েই বিশু অবাক।

গাঁয়ের গণ্য মান্য সবাই হাজির। মাঝখানে পঞ্চানন চক্রবর্তী। রামগোবিন্দ গোসাঁই, জমিদার প্রতাপ নন্দী, কাশীপতি ন্যায়রত্ন, পীতাম্বর চাটুজ্জে, ফকির মৈত্র, গাঁয়ের সব মাথা পাশাপাশি বসেছে।

নরহরি মুখুজ্জে ঢুকতেই প্রতাপ নন্দী কথা বললেন, বড্ড দেরী করে ফেললে মুখুজ্জে, আমরা অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছি।

নরহরি দাওয়ার একপাশে বসতে বসতে বলল, আজ্ঞে, কাছারী থেকে ফিরতে একটু দেরী হ'য়ে গেল। বিকেলের ফেরিটা পেলাম না। আরো রাত হত, নকুলগঞ্জের রায়েদের বজরা আসছিল, আমাকে দেখে তুলে নিল।

নকুলগঞ্জের শেতল রায়, খুব বুঝি রবরবা হয়েছে এখন। ওর বাপ গোলক রায় আমাদের চাঁদহাটির নায়েব ছিল, মাস গেলে তিন টাকা মাইনে। দু হাতে চুরি করেছে। তা না হলে এ ক বছরে মৌজার পর মৌজা কিনে জমিদারীর পত্তন করতে পারে।

আজ্ঞে, তিনি তো গত হয়েছেন। নরহরি সসম্ভ্রমে উত্তর দিল।

তা জানি। কিসে গেল তাও জানি। এত পাপ কি আর সয়!

ফকির মৈত্র অনেকক্ষণ ধরে কথা বলবার সুযোগ খুঁজছিল, ফাঁক পাচ্ছিল না। এবার বলল, রোগটা কি?

প্রতাপ নন্দী গোঁফের ফাঁক দিয়ে হাসলেন, বললেন, আর কি রোগ! একেবারে মহাব্যাধি। কুষ্ঠ রোগে শরীরের কোন স্থানে ফাঁক রইল না। ধর্মের কল, বুঝলে মুখুজ্জে।

গরম পড়েছে। একটি গাছের পাতাও নড়ছে না। অথচ আকাশে চাপ চাপ মেঘ রয়েছে। রাতে হয় তো বৃষ্টি নামবে। তা নামুক, বসুমতী ঠাণ্ডা হোক একটু।

প্রতাপ নন্দীর পিছনে দাঁড়িয়ে মতি বাগ্দী পাখা নাড়ছিল,

জমিদার সেই দিকে ফিরে বললেন, তুমি যে যাদুর গায়ে হাত বোলাচ্ছ বাগ্দীর পো। একটু জোরে জোরে হাত নাড়ো।

একটু হাওয়া খেয়ে প্রতাপ নন্দী আবার নরহরির দিকে ফিরলেন, তারপর বজরায় ছিল কে? শেতল রায় একলা? নতুন জমিদার হাওয়া খেতে বেরিয়েছিলেন বুঝি?

শুধু বক্রোক্তিই নয়, কোথায় যেন একটু খেদের মিশেলও ছিল। প্রতাপ নন্দীর অবস্থা পড়তির মুখে। মহাজনের কাছে মাথার চুল বিক্রী। খাজনা যা আদায় হয়, দেনা শোধ করতেই খতম।

নরহরি আস্তে আস্তে বলল, আজ্ঞে না, একলা ছিলেন না।

তবে?

নরহরি একটু ইতস্ততঃ করল। বয়োজ্যেষ্ঠদেব মুখের দিকে বার কয়েক চাইল, তারপর বলল, বজরায় বাইজিও ছিল। গানবাজনা চলছিল।

বাইজি! বাহবা, বাহবা, প্রতাপ নন্দী নিজের উরুতে বার কয়েক চাপড় মারলেন, বাপকা ব্যাটা, বাপের রোগ পাবে বৈ কি। তুমি দেখে নিও মুখুজ্জে, ও জমিদারী লাটে উঠতে আর দেরী নেই।

কাশীপতি ন্যায়রত্ন নড়ে চড়ে বসলেন। কাজের মানুষ, অযথা সময় নষ্ট ভালবাসেন না।

একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন, চুলোয় যাক তোমার শেতল রায় আর তার বাইজি। আজ আমরা যেজন্য সবাই এখানে জমায়েত হ'য়েছি, সেই কথা হোক।

অবশ্য একমাত্র কাশীপতিই পারেন। জমিদারের ওপর কথা বলার সাধ্য আর কারো নেই। কিন্তু কাশীপতির কথা আলাদা। দেশ বিদেশে নাম। বড় বড় জায়গায় চলাফেরা করেন। দাপটে সবাই তটস্থ। প্রতাপ নন্দীর বাপ রামজয় নন্দী পর্যন্ত সমীহ করতেন। যাগ যজ্ঞে, শান্তি-স্বস্ত্যয়নে আগে তাঁর ডাক পড়ত।

হ্যাঁ, এবারে কাজের কথা শুরু হক। রামগোবিন্দ গোঁসাই সায় দিলেন, ঈশানকোণে কালো মেঘ, ভয়ের লক্ষণ। পথের মধ্যে না ঝড়-জলে পড়তে হয়!

একটু দূরে জমিদারের পাইকরা গোল হ'য়ে বসে জটলা করছিল। বিশু বাতিটা নিভিয়ে দিয়ে তাদের কাছে গিয়ে বসল। কান রইল অবশ্য এদিকে। কি ব্যাপার। গাঁয়ের হোমরা চোমরা সবাই এক-জোট হয়েছে যে? কার ধোপা নাপিত বন্ধ হবে। ঘরের চালা কেটে কার বাস ওঠাবে এখান থেকে।

শুরু করলেন পীতাম্বর চাটুজ্জে। মিশমিশে কালো গায়ের রং। মহাজনী কারবার। পাড়ার লোকে বলে অন্ধকার চাটুজ্জে। অঢেল পয়সা। ছেলেপুলে নেই। হবে যে এমন বয়সও নেই। কুলীন। বিয়ে দু ডজনের ওপর। সব শ্বশুরবাড়ীর ঠিকানা বোধ হয় পীতাম্বরেরও জানা নেই। রাতবিরেতে বাগ্দীপাড়ায় যাতায়াত আছে। গাজনের সং কিংবা জন্মাষ্টমীর মেলার সময় দেখা যায় ঘুরঘুর করছেন ছোট-জাতের উঠতি বয়সের মেয়েদের কাছাকাছি। এ বয়সে ওইটুকুতেই সুখ।

কলকাতা থেকে সদ্য ফিরেছেন।

বিদ্যাসাগর সুবিধা করে উঠতে পারছে না। ঘরের কড়ি খরচ করে কাঁহাতক আর বিধবার বিয়ে দেবে। তার ওপর বিধবা নিয়ে কেউ সংসার করতে পারছে না। সংসারে অমঙ্গল হ'চ্ছে। এক জায়-গায় তো ফুলশয্যার পরের দিনই বর সাপের কাপড়ে মারা গেল। অধর্মেরও একটা সীমা আছে তো। বরের মা এসে বিদ্যাসাগরকে অভিসম্পাত দিয়ে গেল। এক ঘর পণ্ডিতের সামনে। সায়েব সুবোও সেখানে অনেক ছিল। মেয়েছেলে কিছু পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু পুরুষ কেউ এগিয়ে আসছে না। যারাই বিধবা বিবাহ করেছে, কেউ সুখী হয়নি। অসুখ বিসুখ, নানা অশান্তি, সংসারে আগুন ধরে গেছে।

উত্তেজনায় রামগোবিন্দ গোসাঁই দাঁড়িয়ে উঠলেন, আরে এ যে হ'তেই হবে। এখনও চন্দ্র সূর্য উঠছে, দিন রাত্রি হচ্ছে। এত বড় একটা পাপ হ'লেই হ'ল।

প্রতাপ নন্দী আলবোলার নলটা সরিয়ে মুচকি হাসলেন। বললেন, পীতাম্বর খুড়ো, টোলের ছোকরার সেই কথাটা শুনিয়ে দাও না।

পীতাম্বর হাসলেন। কাঁধের উড়ুনি দিয়ে কপালের ঘাম মুছে নিয়ে বললেন, টোলের এক ছোকরা স্পষ্টই গিয়ে বলল বিদ্যা-সাগরকে। মশাই যখন বিধবাদের জন্য এতটা করছেন, আরো একটু না হয় করে যান।

বিদ্যাসাগর আর একজনের সঙ্গে বসে গল্প করছিলেন। খ্রীষ্টান কবি। একমাথা চুল আর দাড়ি। মুখ তুলে বললেন, কি ?

বয়স তো হ'চ্ছে। চোখ বোজবার আগে নিজের বিধবার জন্য একটা বন্দোবস্ত করে যান। সতীর্থদের মধ্যে কাউকে আমমোক্তার নামা দিন, নয়তো কার ঘরে গিয়ে ঠাকরুণ উঠবেন, ঠিক আছে।

সমবেত সবাই উচ্চস্বরে হেসে উঠল। হাসির রেশ থামতেই চায় না। কাশীপতি হাসি চেপে বললেন, উপযুক্ত প্রস্তাব। তারপর ?

তারপর বিদ্যাসাগরের মাথা হেঁট। চুপচাপ বসে বইয়ের পাতা ও'ল্টাতে লাগলেন। তবে সেই খ্রীষ্টান কবি তেড়ে এল। চিৎকার ক'রে বলল, এ দেশে তোমাদের মতন অর্বাচীনের সংখ্যা যত কমে, ততই দেশের মঙ্গল।

এই বীরপুঙ্গবটি কে ? প্রতাপ নন্দী পীতাম্বরের দিকে চোখ ফেরালেন।

কি একটা ইংরেজী নাম বললে বাপু, স্মরণ নেই। খুব কবিতা নাটক লিখছে। বেলগাছিয়ার রাজবাড়ীতে দু একটা নাটকের অভিনয়ও বুঝি হয়েছে।

কিন্তু সেই টোলের ছাত্রটির পরিচয় কি ? স্বাধীনচেতা ছোকরাটির খবর জানা দরকার।

শুনলাম তাকে নাকি টোলের পণ্ডিতেরাই পাঠিয়ে ছিলেন। মজা দেখবার জন্য।

এতক্ষণ পরে পঞ্চানন কথা বলল, যাক ওসব কথা। আমাদের গাঁয়ের কথাটা বল রামগোবিন্দ। কোথায় কি হ'চ্ছে, তাতে আমাদের দরকার নেই। নিজেদের সামলাই আগে।

তা তো নিশ্চয়। সকলেই ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

তারপবে সকলেব 'গলার আওয়াজ খাদে। চাপা গলায় শলা পরামর্শ। কান খাড়া করেও বিশুর কানে সব পৌঁছল না। দু একটা কথা ছাড়া।

পূবপাড়ার ঘোষালদের বাড়ীর কীর্তি। সেজ বৌয়ের এক মামা ব্রাহ্ম হয়েছে। অখাদ্য কুখাদ্য খায়। দেবদেবী মানে না। প্রতিমা পূজাকে বলে পুতুল পূজা। মামা জাত হারানো মানে ভাগ্নী কি আব জাতে থাকে। অথচ ঘোষালদের সেজ কর্তা বৌ ত্যাগ কবতে নারাজ। মুখের ওপরই বলেছে, পাড়া ছাড়ব তবু পরিবার ছাড়ব না।

আর মনে নেই বিশুর। দু হাঁটুর ওপর মাথা রেখে বসে থাকতে থাকতে কখন তন্দ্রায় ঢলে পড়েছে। সমস্ত দিন খাটুনির পর ক্লান্তি এসেছে।

ঘোর কাটল সকলের চিৎকারে। ধড় মড় করে বিশু উঠে বসল। সবাই দাঁড়িয়ে উঠেছে। দু একজন আল ধবে ধরে এগিয়েও চলেছে।

সোঁ সোঁ বাতাস। জোর হাওয়ায় গাছপালাগুলো দুলছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝিলিক। অনেক চেষ্টা করেও বিশু তেলের কুপী জ্বালাতে পারল না।

নে, চল, বাতি জ্বেলে লাভ নেই। জোব পায়ে না গেলে, বৃষ্টিতে ভিজতে হবে।

হ'লও তাই। তবু ভাগ্য ভাল, বৃষ্টি নামল বাড়ীর কাছ বরাবর বিশু গায়ের কাপড়ের খুঁটটা খুলে মাথায় জড়াল।

সেদিন নরহরি মুখুজ্জে ভোর ভোর সদরে বেরিয়ে গেল। ছেলে-দের পাঠশালার ছুটি। গরুর কাজ শেষ করে বিশু বাইরে বেরিয়ে পড়ল। বেলা দুপুরের আগে আর তার ডাক পড়বে না। অফুরন্ত সময়।

চাঁপাতলা পার হ'য়ে কেয়াঝোপের পাশ দিয়ে বিশু আরো ভিতরে ঢুকল। নামই শুনে এসেছে, কিন্তু কখনও চোখে দেখে নি। এদিক-টায় বড় কেউ আসেও না। রাস ঝুলন সব উৎসব হয় শ্যামসুন্দরের মন্দিরে। নতুন মন্দির। প্রতাপ নন্দীর বাপ রামজয় নন্দী প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। মেলা, উৎসব সব কিছু হয় সেই মন্দিরের চত্বরে।

জঙ্গলের মধ্যে রাধাগোবিন্দজীর মন্দির একটা আছে এটুকু সবাই-য়ের জানা। অনেক আগে এক বৈষ্ণবের আখড়া ছিল এখানে। চেহারা দেখে বোঝা যেত না, বোঝা গেল মারা যেতে। ছোটখাট একটা মন্দির করাব মতন টাকা বেরোল তার পুঁতে যাওয়া পেতলের ঘড়া থেকে। শুধু টাকা নয়, ব্যবস্থাপত্রও পাওয়া গেল। কি এক সম্প্রদায়ের ওপর ভার দিয়ে গেছে মন্দির প্রতিষ্ঠার। প্রথম প্রথম খোল-করতালে জায়গাটা সরগরম থাকত। পাড়া-প্রতিবেশী অনেকে এসে জুটতো। কিন্তু রামজয় নন্দীর মন্দির প্রতিষ্ঠার পরে ভিড় কমে গেল। জমিদারের আদেশ। সবাইকে ওখানকার উৎসবে যোগদান করতে হবে।

অবশ্য জমিদারের নির্দেশ না থাকলেও সবাই ওখানেই যেত। এদিকে শুধু শশার কুচি আর বাতাসা, আর ওদিকে প্রথম প্রথম রাধা-বল্লভী, কাঁচাগোল্লা আর সরের নাড়ু।

বিশু এসব দেখেনি। গোবিন্দপুরে শ্যামসুন্দরের মন্দির ছাড়া

আর একটা মন্দির আছে, তাই জানা ছিল। কিসের মন্দির জানত না। সেদিন মেয়েটির মুখে রাধাগোবিন্দজীর কথা প্রথম শুনল।

একটু এগোতেই মন্দির চোখে পড়ল।

জরাজীর্ণ অবস্থা। জায়গায় জায়গায় পলেস্তারা খসে ইঁটের পাঁজর বেরিয়ে পড়েছে। ফাটলে ফাটলে বসন্তের গুটিব মতন বট অশথের চারা।

পায়ে পায়ে মন্দিরের দিকে যেতেই পিছনের শুকনো পাতার খস খস শব্দ। চোখ ফিরিয়েই বিশু অবাক।

নাতিদীর্ঘ চেহারা। রং একসময়ে হয়তো গৌরবর্ণ ছিল, বয়সের পলিমাটি পড়ে পড়ে এখন একটু তামাটে। গলায় কণ্ঠি, মাথায় শিখা। টানা ছুটি চোখ। ভাব রসে আপ্লুত। সব সময় মনে হয় কাছের নয়, দূরের কোন জিনিস দেখছেন। অনেক দূরের।

কে? গলার আওয়াজেও নূপুরের ঝঙ্কার।

বিশু কোন উত্তর দিল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

বৈষ্ণবটি আরো কাছে এগিয়ে এলেন। বিশুর সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, কি চাই বাবা? কাকে চাই?

বিশু বলল, চাই না কাউকে। রাধাগোবিন্দজীর মন্দির দেখতে এসেছি।

রাধাগোবিন্দজীর মন্দির? বৈষ্ণব ম্লান হাসলেন। ছুটি চোখ ছল-ছলিয়ে এল। চাদর দিয়ে চোখ ছুটো রগড়ে নিয়ে বললেন, বহুদিন আব এদিকে কেউ আসে না বাবা। আমিই যুগলমূর্তি সাজাই, আমিই আরতি করি, আমিই চোখ ভরে দেখি।

কথার সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণবটি এগিয়ে চললেন। পিছন পিছন বিশু। বাইরের অবস্থার তুলনায় মন্দিরের ভিতরের অবস্থা অনেক ভাল। কোথাও একটু অপরিচ্ছন্নতা নেই। মনে হয় সকাল বিকাল মাজাঘসা হয়।

ঠিক সামনে যুগল বিগ্রহ। পাথরের অপূর্ব মূর্তি। গোবিন্দজী কালো পাথরের, শ্রীরাধিকা শ্বেত পাথরের। জীবন্ত। চেয়ে চেয়ে আশ যেন মেটে না বিশুর।

প্রণাম কর।

বৈষ্ণব নিজেও হাঁটু মুড়ে বসলেন। দু হাত বুকের ওপর যোড় করে। দেখাদেখি বিশু বসল। ঠাকুর দেবতার সামনে বসলেই বিশুর নিজের লাঞ্ছিত জীবনের কথা মনে পড়ে যায়। অনাদর আর অবজ্ঞা, অবহেলা আর নির্যাতন, ওর দিগন্তে আর কিছু নেই। জমাট অন্ধকার, আলোর সামান্য রেখাও নয়।

অনেকক্ষণ কাটল। বিশু নিরুপায়। বৈষ্ণব না উঠলে সেও উঠে দাঁড়াতে পারছে না।

বাবা।

বিশুর সমস্ত শরীর থরথরিয়ে কেঁপে উঠল। এমন একটা কণ্ঠস্বরের অপেক্ষাতেই তার দেহমন উন্মুখ হয়েছিল। রাধাগোবিন্দজীর মন্দির দেখতে সে আসে নি। এ শুধু উপলক্ষ্য, লক্ষ্য সেদিনের কনকচাঁপা।

বিশু ঘাড় ফেরাতেই চোখাচোখি হ'ল।

সদ্য স্নান সেরে এসেছে। আলুলায়িত কেশ সারা পিঠ ছেয়ে পড়েছে। ছোট ছোট জলের কণা কপালের ওপর। আরক্ত দুটি গাল। আলতা-টুকটুকে ঠোঁট।

বৈষ্ণবও উঠে দাঁড়ালেন, এই যে কুমু। তুই যে বড় বলিস এ মন্দিরে কেউ কখনও আসবে না। সব ভিড় জমিদারবাবুর মন্দিরে। এই দেখ।

বৈষ্ণব একটা হাত রাখলেন বিশুর কাঁধে। হেসে বললেন, এই আমার মেয়ে কুমুদিনী। বাপবেটিতে রাধাগোবিন্দের পায়ের তলায় পড়ে আছি। ওঁদেরই সাজাচ্ছি, গোছাচ্ছি, মালা-পরাচ্ছি। আর এ ছাড়া আমাদের করবারই বা কি আছে। বরাত বাপবেটির

একেবারে সমান। পেছনে চাইবার মতনও কিছু নেই, সামনে তো মরুভূমি। কি বলরে কুমু?

বাপ স্নেহার্দ্রদৃষ্টিতে মেয়ের দিকে চাইলেন।

কুমুর নজর কিন্তু বিশুর দিকে, তুমি সেই একদিন মগডাল থেকে আমায় সোনাচাঁপা পেড়ে দিয়েছিলে না?

বিশু ঘাড় নাড়ল।

তাই নাকি? বৈষ্ণব উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলেন, তা'হলে আড়াল থেকে রাধাগোবিন্দজীকে তুমিও সাজাচ্ছ। তবে তো তুমি আমাদের দলের লোক গো।

আমি বরাতের দিক দিয়েও আপনাদের দলেরই লোক।

হঠাৎ কথাটা বিশুর মুখ থেকে বেরিয়ে গেল। বিগ্রহের সামনে, বিশেষ করে কুমুর সামনে দাঁড়িয়ে বুকের চাপা দুঃখ যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়। বাধা মানে না।

কেন বাবা, কেন এমন কথা বললে? বৈষ্ণব বিচলিত হ'য়ে পড়লেন, তোমার এই কাঁচা বয়স। পুরুষ-মানুষ তুমি। সারাটা জীবন তোমার পড়ে রয়েছে।

বিশু কোন উত্তর দিল না। মাথা নিচু করে ফেলল।

মারধোর, গালিগালাজ সব বিশু সহ্য করতে পারে টুঁ শব্দটি না করে। মুখ বুজে চোরের মত মার খায়। দাঁতে দাঁত চেপে পড়ে থাকে। একটু গোঁঙানীও বের হয় না। কিন্তু সহানুভূতির কথা, সান্ত্বনার কথা, সমবেদনার কথা কেউ বললেই চোখ ফেটে জল আসে। ব্যথায় মোচড় দিয়ে ওঠে বুক।

তুমি তো কার বাড়ী কাজ কর? তাই না? সেদিন তাই যেন বলেছিলে। তোমার ওপর অত্যাচার করে। ঘটি ঠুকে দিস্‌ল কপালে। এই এতখানি হ'য়ে ফুলে উঠেছিল, বাবা। তার ওপর সোনাচাঁপা গাছের ডাল লেগে সে কি রক্ত! আমি তো ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম সেদিন।

এক মুহূর্তে গোটা জন্মের ব্যথা বেদনা সব মুছে গেল। বিশুর মনে হ'ল বিগ্রহের সামনে লুটিয়ে পড়ে কেবল কাঁদবে। এতদিন যে অশ্রু জমা ক'রে রেখেছিল, সে অশ্রু অঝোর ধারায় ঝরাবে।

আহা। বৈষ্ণব মাথা নাড়লেন, তোমার লীলা বোঝা ভার দয়াময়। তোমারই হাতে তৈরী মানুষ, কাউকে কাঁদাও, কাউকে হাসাও। কাউকে দিয়ে আঘাত করাও, কাউকে আবার বুক পেতে সে আঘাত নিতে বল।

এত কথা বিশুর কানে গেল না। কানে গেলেও বুঝত কিনা সন্দেহ। একদৃষ্টে শুধু কুমুর দিকে চেয়ে রইল। শুধু যদি একান্তে একবার বলতে পারত তাকে। মন্দির দেখতে আমি আসি নি, বিগ্রহ দেখতেও নয়, আমি শুধু তোমায় দেখতে এসেছি। তোমায় বলতে এসেছি একটা কথা।

কি কথা, কেমন করে বলবে ভাবতেও বিশু ঘেমে উঠল। আর এভাবে কুমুকে কষ্টের জীবন-যাপন করতে হবে না। শাড়ী নয়, গয়না নয়, এই রিক্ত বেশ আবার পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠবে। ঝলমলে জীবনে সার্থক। অনেক দূরে শহরের এক কোণে বসে একজন ভাবছেন তার কথা, তাদের মতন অনাথা মেয়েদের কথা। কিন্তু এ গাঁয়ে থাকলে হবে না। এ গাঁয়ে কাশীপতি ন্যায়রত্ন রয়েছেন। জমিদার প্রতাপ নন্দী, পঞ্চানন চক্রবর্তী, রামগোবিন্দ গোসাঁই রয়েছেন, তাঁরা বাধা দেবেন। একঘরে করবেন। হয়তো লাঠিয়াল দিয়ে বের করে দেবেন গাঁ থেকে, পাইক বরকন্দাজ লাগিয়ে ঘরে আগুন দিয়ে দেবেন। এ গাঁয়ে হবে না। চুপি চুপি নদী পার হ'য়ে শহরে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। বিদ্যাসাগরের কাছে। তিনি ঠিক একটা বন্দোবস্ত করে দেবেন।

বিশুর চমক ভাঙল কুমুর কথায়, বাবা, এক প্রহর বেলা হ'য়ে গেল। চল, খাবে চল।

যাই মা, বৈষ্ণব একটু এগিয়েই থেমে পড়লেন। বিশুর দিকে

ফিরে বললেন, তুমিও চল না বাবাজী। রাধাগোবিন্দজীর প্রসাদ পাবে।

আমি? বিশু বিব্রত হ'য়ে পড়ল। এখানে প্রসাদ পেলে বাড়ীতে গিয়ে কি বলবে। অবশ্য সেখানে থালা সাজিয়ে কেউ ওর অপেক্ষা করবে না। রান্নাঘরের দাওয়ায় শানকিতে ভাত তরকারী পড়ে থাকবে। কুকুরে বাঁদরে মুখ দিলেও দেখবার কেউ নেই।

কিন্তু তবু না খেলে হাজার কৈফিয়ৎ দিতে হবে। অনেক কটু কথা শুনতে হবে। মরা মা-বাপকে টেনে গালিগালাজ।

আজ নয়, আর একদিন আসব। কোন রকমে কথাগুলো বলা শেষ ক'রেই বিশু আর দাঁড়াল না। বাড়ীর দিকে ছুটতে শুরু করল। পথের বাঁকে এসে একবার ফিরে চাইল।

বাপ আর মেয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। একদৃষ্টে তুজনে ওর দিকেই চেয়ে রয়েছে। বিশু চলার গতি আরো বাড়িয়ে দিল।

সারা মন জুড়ে একটা অতৃপ্তি। শুধু কি কুমুকে দেখতেই এসেছিল বিশু। শুধু চোখের দেখা। ওর তুঃখে ওর কষ্টে সহানুভূতি দেখাতে এসেছিল। এমন কিছু বলতে এসেছিল যাতে ওর জীবনের মোড় ঘুরে যায়। সারা জীবন রাধাগোবিন্দকে সাজাতে সাজাতে নিজের সাজের কথা সে ভুলেই গেছে। নিজেব মনের গোপন সাধ-আহ্লাদ কামনা-বাসনা সব পুরণ করছে এই পাথরের বিগ্রহের মধ্য দিয়ে।

কিন্তু বিশু কিছু বলার আগে, এরা তুজনেই করুণা করল বিশুকে। ওর তুঃখে সমবেদনা জানাল। আশ্চর্য, এরা তুজন যেন পৃথিবী ছাড়া। অন্ততঃ বিশুর পৃথিবীতে এত স্নেহ, এত দরদ নিয়ে আজ পর্যন্ত কেউ দেখা দেয়নি।

এর পরেও বার কয়েক বিশু গিয়েছিল।

কুমু আর কুমুর বাপের সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল। কথাও হ'য়েছিল।

এদিক ওদিক সাধারণ কথাবার্তা। সাহস করে বিদ্যাসাগরের কথা আর তুলতে পারেনি।

একদিন একটু এগিয়েই কুমুর বাপের সঙ্গে দেখা। গামছাটা গায়ে জড়িয়ে তিনি হন হন করে নদীর দিকে রওনা হচ্ছিলেন বিশুকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন।

এসো, এসো, কুমু বাড়ীতেই আছে। বস গিয়ে, আমি এখনি স্নান সেরে ফিরে আসছি।

কুমুর বাবা চলে গেলেন কিন্তু বিশু আর একটি পাও এগোতে পারল না। মনে মনে সে অনেক কথা ভেবে আসে কিন্তু কুমুর সামনে এলেই সব গোলমাল হ'য়ে যায়। একটি কথাও বলতে পারে না।

বিশু চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পেয়ারা গাছের ডাল ভাঙতে লাগল।

আচমকা পিছন থেকে চিৎকার, কে রে, কে ওখানে ?

বিশু ঘুরে দাঁড়িয়েই অবাক।

কোমরে আঁচল জড়ানো, সারা মুখ আরক্ত, কপালে ঘামের মুক্তো, হাতে তপ্ত হাতা।

বিশুকে দেখেই কুমু হেসে ফেলল, ওমা তুমি, আমি ভাবলাম বুঝি পাড়ার কোন দুষ্টু ছেলে কিংবা ছাগল টাগলই হবে।

বিশু নির্বাক।

কি হ'ল ? বোবা হ'য়ে গেলে না কি ?

না, মানে, বিশু আমতা আমতা করল, তোমার বাবার সঙ্গে দেখা হ'ল, তিনিই বসে যেতে বললেন।

কুমু খিলখিলিয়ে হেসে উঠল।

বলল, বেশ তো এসে বস না। বাবা তোমায় বসে যেতে বলেছেন আমি কি তোমায় চলে যেতে বলছি ?

পায়ে পায়ে বিশু এগিয়ে এল।

মাটির দেয়াল, খড়ের চাল। তকতকে ঝকঝকে। উঠানে একটি শুকনো পাতার চিহ্ন নেই।

কুমু কাঠের একটা পিঁড়ি পেতে দিল চৌকাঠের কাছাকাছি।

এখানে বস, আমি রান্না করতে করতে তোমার সঙ্গে গল্প করতে পারব।

বিশু বসল। দুটো হাত কোলের ওপর জড়ো করে। একদৃষ্টে চেয়ে রইল কুমুর দিকে। আগুনের আঁচে সারা মুখ লাল। মাঝে মাঝে একটা হাত দিয়ে কপালের ঘাম মুছে নিচ্ছে।

কি গো বামুন ঠাকুর, কথা বলছ না যে?

কি বলব?

বলবার মতন কোন কথা নেই? কুমু ঠোঁট মুচকে হাসল। বলবার মতন কথা। হ্যা, তা আছে বৈ কি। কিন্তু সে কথা বলবার সাহস নেই বিশুর। মরে গেলেও বলতে পারবে না। অথচ আশ্চর্য, সারা দিন রাত ধরে এমন একটা কথাই সে মনে মনে জপ করেছে। এমনভাবে নির্জনে বাপের সংসারে কেন দিন কাটাবে কুমু। সারাটা জীবন ভরে এই দুঃখ বইবে। পণ্ডিতের বিধান যখন রয়েছে, কলকাতায় বিধবা বিবাহও হচ্ছে, তখন কিসের বাধা! শুধু যদি একবার কুমু গিয়ে দাঁড়ায় বিদ্যাসাগরের কাছে। বলে, ঠাকুর দয়া কর।

চোখ তুলে চেয়েই বিদ্যাসাগরের মন গলে যাবে। সহজে মন না গললে দয়ার সাগর বলা হয় কেন তাঁকে? বাংলা দেশের বিধবাদের দুঃখে কেন তাঁর হৃদয় বিগলিত হয়! হাজার বাধা, হাজার বিপত্তি ঠেলে কেন তিনি এদের ভাঙা কপাল আবার জোড়া দেবার চেষ্টা করেন!

এ সবই বিশুর শোনা কথা। জমিদারবাড়ীর চাতালে লোকের মুখে শুনেছিল। অবশ্য তারা শুধু ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছিল। বিদ্যাসাগরকে

আমলই দেয় নি। কিন্তু তবু তাদের কথার ফাঁকে ফাঁকে এটুকু বুঝতে বিশুর অসুবিধা হয় নি। দেশের অন্যলোক সাহস করে যে কাজ করতে এগিয়ে আসে নি, সে কাজ করতে বিদ্যাসাগর বুক ঠুকে এগিয়ে এসেছেন। সব ঝক্কি ঝামেলা নিজের ঘাড়ে নিয়েছেন। তাঁর কথার সামনে, যুক্তির মুখোমুখি মানুষ দাঁড়াতে পারছে না বলেই, আড়ালে তাঁকে নিন্দামন্দ করছে, গালিগালাজ করছে প্রাণ খুলে।

কিন্তু এসব কথা কুমুকে বলা চলে না, তাই বিশু আস্তে আস্তে বলল্, এই জঙ্গলে, লোকালয় থেকে এত দূরে থাক কি করে? ভয় করে না?

সাবধানে আঁচলচাপা দিয়ে কুমু কড়াটা নামাল। বসে কড়ার তরকারি বাটিতে ঢালতে ঢালতে বিশুর দিকে ফিরে বলল, ভয় কিসের? ভয় তো মানুষকেই। তারা ধারে কাছে না থাকলে কাকে ভয়?

এমন একটা উত্তরে বিশু যেন চমকে উঠল। ভয় বুঝি কেবল মানুষকে! আজ যদি নরহরি মুখুজ্জে আর তার পরিবাররা এমন করে ঘিরে না থাকত বিশুকে, কথায় কথায় গায়ে হাত না তুলত, চোদ্দপুরুষ উদ্ধার না করত মুখের বুলিতে, তা হ'লে বিশুর কোন ভয়ই থাকত না। দু মুঠো ভাতের বদলে উদয়াস্ত পরিশ্রম, তাও কোন দিন ভুলেও কেউ একটু মিষ্টি কথা বলে না, একটু আদর আপ্যায়ন নয়।

এসব অবশ্য বিশুর অদৃষ্ট। দুনিয়ায় যার মা বাপ নেই, তার তো কেউ নেই। সে বুঝি পথের কুকুরের সামিল। চলতে ফিরতে মানুষ মাড়িয়ে যাবে। তাকে বাঁচতে হবে পথচারীর করুণার ওপর নির্ভর করে।

এবার কুমু কথা বলল, তুমি তো থাক লোকজনের মাঝখানে, তবে তোমার ভয় কিসের? একটু দেরী হ'য়ে গেলে ছুটতে শুরু কর যে বড়?

বিশু বলতে চায় নি কথাটা, হঠাৎ তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, আমার যে মা বাপ নেই। আপনজন বলতে কেউ নেই।

এমন একটা উত্তর কুমু আশা করে নি। চমকে সরে এল বিশুর কাছাকাছি। দু চোখের কোলে জলের বিন্দু না ঘামেব ফোঁটা বিশু ঠিক বুঝে উঠতে পারল না।

কেউ নেই তোমার? খুব কোমল গলার স্বর কুমুব।

বিশু ঘাড় নাড়ল। মাথা নিচু করে একদৃষ্টে মেঝের দিকে চেয়ে রইল। দু চোখে তীব্র জ্বালা। মুখ তুলতে গেলেই বিপর্যয় ঘটবে। কুমুর সামনে আর সামলাতে পাববে না নিজেকে।

খুব আস্তে বলল, জানো আমি খুব অপয়া। জন্মাবাব পবেই আমি মা বাপ সব খেয়েছি।

কিছুক্ষণ কুমু বিশুর দিকে চেয়ে রইল। সংসাবে আপনজন কেউ নেই, তাই এত হেনস্তা বিশুব। পান থেকে চুণ খসলে সবাই তেড়ে আসে।

চৌকাঠ চেপে কুমু বসল। রান্নার হাঙ্গামা শেষ। একবাব স্নান সেরেছে, আর একবাব স্নান সেরে আসবে। বাবা না আসা পর্যন্ত আর কোন কাজ নেই। বসে বসে অনায়াসে বিশুর সঙ্গে গল্প কবতে পারে।

আমারও মা মারা গেছে খুব ছেলেবেলায়, কিন্তু মা মারা যাবার কষ্ট আমি টেরও পাই নি। বাবাই আমাকে বুক দিয়ে ঢেকে রেখে-ছিলেন। বাবার মধ্যেই আমি দুজনকে পেয়েছিলাম।

হঠাৎ সংস্কৃত শ্লোকের শব্দ শোনা গেল। সুললিত কণ্ঠ। কুমুর বাবা স্নান সেরে ফিরছেন।

বিশুকে দেখে একগাল হাসলেন, গোবিন্দজীর প্রসাদ খেয়ে যাও বিশু। ঠাকুরের ভোগ এখনি হ'য়ে যাবে।

বিশু উঠে দাঁড়াল। আর নয়, এমনিতেই অনেক দেরী হ'য়ে

গেছে। বাড়ী ফিরে কারো মুখোমুখি পড়লেই সর্বনাশ। হাতে যা থাকবে তাই দিয়েই আপ্যায়ন শুরু হবে।

আজ চলি। বিশু উঠানে নামবার চেষ্টা করল।

সে কি, এত বেলায় অভুক্ত অবস্থায় বাড়ি থেকে গেলে গৃহস্থের অকল্যাণ হবে যে।

বিশু থেমে পড়ল। কল্যাণ-অকল্যাণের প্রশ্ন তুললেই তার ভয় করে। কথায় কথায় তাকে খোঁটা সহ্য করতে হয়। সে নাকি মূর্তিমান অকল্যাণ। সংসারে যা কিছু অনিষ্ট, বিপদ, আপদ সব তার জন্য।

বিশু থামতেই কুমুর বাপ তার একটা হাত নিজের হাতে টেনে নিলেন, এস, এস, দুটি প্রসাদ পেয়ে যাবে। এ সময়ে না খেয়ে যেতে আছে?

অগত্যা, বিশু আবার পায়ে পায়ে দাওয়ার ওপর উঠে এল।

একটা সুবিধা। নবহরি মুখুজ্জে সদরে। পাতিচরের জমি নিয়ে মামলা বেঁধেছে। মামলা দুঃখীরাম মোদকের সঙ্গে, কিন্তু পিছনে নীলকর সায়েবরা রয়েছে। তারাই খরচপত্র জোগাচ্ছে। উস্কানি দিচ্ছে। নয়তো দুঃখীরাম মোদকের সাহস নেই নরহরির সঙ্গে লড়বার। ছোট্ট একটু দোকান সম্বল, তাও পড়তি অবস্থা দোকানের। কোনরকমে সংসার প্রতিপালন হয়। সামান্য জমি আছে, নরহরির জমির লাগোয়া। রাতারাতি খোটা পুঁতে সেই জমি দুঃখীরাম বাড়িয়ে নিয়েছে। বেশ খানিকটে। তাই নিয়ে মামলা ঠুকে দিয়েছে নরহরি।

এত কথা বিশুর জানবার নয়। তাকে বাড়ির লোক মানুষ বলেই গণ্য করে না। সে যেন অনেকটা গোয়ালে বাঁধা গরুগুলোর সামিল, কিংবা তার চেয়েও অধম। তারা তবু সময়ে খড় বিচালি পায়, তদ্বির তদারক করার লোক আছে। তাদের অসুখ বিসুখ হ'লে গো-বদ্যির

খোঁজ পড়ে। বিশুর অবস্থা আরো খারাপ। তেতে পুড়ে যাচ্ছে গা। ধান দিলে খই হ'য়ে যায়। তাই নিয়ে উদয়াস্ত খেটেছে। মুখটি বুজিয়ে। একটু শব্দ বেরোয় নি দাঁতের ফাঁক দিয়ে। জল দেওয়া ভাত খেয়েছে দু বেলা। কতদিন বিচালির গাদার ওপর মুখ গুঁজড়ে পড়েছে। আহা বলতে কেউ এগিয়ে আসে নি।

অসুখের সময়ই যখন এমন, তখন সহজ বেলায় খেল কি না খেল তার খোঁজ করতে কেউ আসবে না।

কুমুর বাপের নির্দেশে বিশু বসে পড়ল কুমুর পাতা পিঁড়ির ওপর। গোবিন্দের ভোগ দেওয়া শেষ হ'ল। মন্দিরে নয়, কুমুর বাপ চোখ বন্ধ করে এখানেই ঠাকুরকে সব নিবেদন করলেন।

বসে বসে বিশু দেখল। কুমু সযত্নে পিঁড়ির সামনে জল ছড়া দিল। কাঁসার থালায় মল্লিকা ফুলের মতন ভাতের রাশ এনে রাখল। পাশে তরকারি। ছোট একটা বাটিতে দুধ। খেতে বসেই বিশুর চোখে জল ভরে এল। এমন যত্ন করে কেউ তাকে খেতে দেয় না। খাবার সময় পাখা হাতে করে কাছে বসা দূরে থাক, কেউ দেখতেও আসে না।

নরহরি মুখুজ্জের মেজবৌ তাকে খেতে দেয়। বিশুর মেজ খুড়ি। কলাপাতা বিশু নিজে কেটে নিয়ে বসে। ঘটিতে করে জল নিয়ে আসে। মেজ খুড়ি ভাত ঢেলে দেয়। পুঁই শাকের চচ্চড়ি, মাঝে মাঝে ডালের ছিটে। বাড়িতে বেশী হ'লে, দু'একদিন মাছের টুকরোও জোটে। খাওয়াটা কোন রকমে যেন গর্ত বুজানো। পরের দিন সকাল-সন্ধ্যা যাতে খাটতে পারে তার জন্য পেটে রসদ বোঝাই করা।

এমন নিপুণভাবে জলের ছিটে দেওয়া। মন্দিরের চূড়োর আকারে ভাত সাজানো। পরিচ্ছন্নভাবে গোছানো তরকারির স্তূপ। ঠিক যেন গোবিন্দজীর ভোগ দেওয়ার মতনই। মানুষ আর দেবতাকে

এরা বুঝি আলাদা করে দেখে না। সেবায়, যত্নে, স্নেহে, মমতায় মানুষকেই তুলে নিয়ে যায় দেবতার সিংহাসনের কাছে।

কুমুর বাপও বসলেন বিশুর সামনে। স্বল্পাহারী ব্রাহ্মণ ভাত তরকারির মাত্রা নাম মাত্র। খাবার আগে হাতে পৈতে জড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে আচমন করলেন, মন্ত্রপাঠ, তারপর খেতে শুরু করলেন।

বিশুরও গলায় পৈতে আছে। তেলচিটে ময়লা সুতোর সমষ্টি। বিশুর যখন পৈতে হয়, তখন তার বয়স বছর আষ্টেক। ধুম-ধাম কিছু নয়, মন্দিরে নিয়ে গিয়ে পুরোহিত মশাই মন্ত্র পড়ে তার গলায় পৈতে পরিয়ে দিয়েছিল। বিশু একলা নয়, এদিক-ওদিক গাঁ থেকে প্রায় জন পঞ্চাশেক ছেলে জড় হয়েছিল। বাপ নেই, মা নেই এমনি সব অনাথ ছেলের দল। বিশুর সগোত্র। কিছু দিন বিশুকে বাড়ির মধ্যে থাকতে হয়েছিল। দণ্ডী ভাসাবার আগে পর্যন্ত। তাতেই নরহরি মুখুজ্জে ক্ষেপে লাল। এই ক'দিন সংসারের কোন কাজ করতে হয় নি। ঘরের কাজ নয়, বাইরের কাজও নয়। দরজা-জানলা বন্ধ করে চুপ-চাপ বসে থাকা। সকাল বিকাল গায়ত্রী জপ।

সেই ক'দিন বিশুর মন্দ লাগে নি। কাজ করতে হয় নি ব'লে নয়, কাজকে সে মোটেই ভয় পায় না। তার ভাল লেগেছিল যখন নরহরি মুখুজ্জের তিন বৌ থালায় করে আলু আর চাল নিয়ে এসে তার ঝুলিতে ঢেলে দিয়েছিল। তাদের সামনে দাঁড়িয়ে বিশু বলেছিল, ভগবতী, ভিক্ষাং দেহি। কথাটা সত্যি। নরহরি মুখুজ্জের ভিক্ষার ওপরেই নির্ভর করছে বিশুর জীবন। তার দাক্ষিণ্যের ওপর ওর সমস্ত ভবিষ্যত হেলান দিয়ে রয়েছে। সেটা এমন কিছু বড় কথা নয়। কিন্তু মজা হয়েছিল তার পরে। তিন বৌ গলায় আঁচল দিয়ে হাঁটু মুড়ে বসে ওকে প্রণাম করেছিল।

বিশু ব্রহ্মচারী হয়েছে। পৃথিবীর সব লোকের প্রণম্য। কথাটা বিশুর উপহাসের মতন মনে হয়েছিল। কটা দিন পরে যাকে

সবাইয়ের লাথি ঝাঁটা খেতে হবে, পদে পদে লাঞ্ছনা, নির্যাতন, তাকে এই ক'দিনের জন্য ঠাকুর বানিয়ে বৃথা পরিহাসের বস্তু করে তোলার কোন মানে হয়!

উড়ুনিটা সরিয়ে বিশু ডান হাত দিয়ে নিজের পৈতেটা চেপে ধরল। গায়ত্রী মুখস্থ ছিল, বিড় বিড় করে উচ্চারণ করল, তারপর গণ্ডূষ করে ভাতে হাত দিল।

বাড়িতে এসব করে না বিশু। তেতে পুড়ে ভাতের থালা নিয়ে যখন বসে, গায়ত্রীও মনে থাকে না, দেবতাকে নিবেদন করার কথাও ভুলে যায়। নিজের পেট ছাড়া অন্য কিছুর চিন্তাও তার মনে আসে না।

ভাতের পরিমাণ খুব বেশী নয়। ভাতটা বিশু বেশী খায়। কুমু চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়েছিল। বিশুর পাতের ভাত শেষ হতেই এগিয়ে গেল। বলল, একটু ভাত এনে দিই তোমাকে?

বিশু হাত নাড়ল। এমন পরিবেশে চেয়ে খেতে ওর ভারি লজ্জা করল। কুমুর বাপ খাওয়া শেষ করে বিশুর জন্য অপেক্ষা করছেন। ঘাড় নেড়েই বিশু উঠে পড়ল।

ওকি দুধটা পড়ে রইল যে? কুমু হাত দিয়ে পড়ে থাকা দুধের বাটিটা দেখিয়ে দিল।

দুধ আমি খাই না। বিশু কুমুর বাপের পিছন পিছন খিড়কির পুকুরের দিকে যেতে যেতে বলল।

কথাটা মিথ্যা নয়। নবহরি মুখুজ্জের বাড়ি দুধেল গরুর কমতি নেই। গরুর সেবা করে বিশু কিন্তু ভাতের সঙ্গে দুধ খাওয়ার কথা তো সে ভাবতেই পারে না। অনেক দিনের অনভ্যাস। দুধে চুমুক দিলে হড়হড় করে হয়তো বমিই হয়ে যাবে।

তা ছাড়া আর একটা জিনিসও বিশু লক্ষ্য করেছে। দুধ শুধু তাকেই দেওয়া হয়েছে, কুমুর বাপকে নয়। হয়তো বাপের জন্য

বরাদ্দ দুধই উটকো অতিথির সামনে ধরে দিয়েছে। সেইজন্যই বিশু লজ্জায় দুধ ছুঁতে পারে নি।

মুখ ধুয়েই বিশু দৌড়োতে শুরু করিল।

কুমুর বাবা হেসে ফেললেন, ভাত মুখে দিয়েই অমনভাবে ছুটো না। আস্তে আস্তে যাও।

ছুটতে ছুটতে বিশু ঘাড় ফেরাল, বড্ড দেরী হয়ে গেছে, অনেক কাজ পড়ে রয়েছে বাড়ীতে।

বাড়ীর কাছ বরাবর পৌঁছে বিশু এদিক ওদিক চেয়ে দেখল, না, কেউ কোথাও নেই। খুড়িরা বোধ হয় শুয়েছে কিংবা পিছনের দাওয়ায় বসে গল্প-গুজবে মেতেছে।

গল্প-গুজব মানেই তো পরচর্চা আর পরনিন্দা। বিচালি কাটতে কাটতে কিংবা ঢেঁকিতে পাড় দিতে দিতে কতদিন বিশুর কানে এসেছে।

কায়েত পাড়ার দোলগোবিন্দ ঘোষ। মস্ত তেজারতী কারবার। পাড়ার মাথা। তারই প্রথম পক্ষের মেয়ে শ্যামনলিনী। বিয়ে হয়েছিল ছেলেবেলায়, বর নেয় না। মেয়ে বাপের বাড়ীই থাকে বরাবর। ছোট খুড়ি তাকে কয়েকবার দেখেছে। মন্দিরে পূজো দিতে যেত। স্বামী যাতে ফিরে আসে, ঘরে নেয়, সেজন্য ব্রত উপোস নানা রকম করত। হঠাৎ রটে গেল শ্যামনলিনীকে তার স্বামী এসে নিয়ে গেছে। সবাই অবাক। পাড়ায় জামাই এল, কেউ জানতেও পারল না। হুট করে এল আর হুট করে নিয়ে গেল মেয়েকে। এ যেন চিলের ছোঁ মারা। যার হাত থেকে খাবার গেল, সে ছাড়া আর জানতেও পারল না কেউ।

খবর চাপা রইল না। বজনী জেলে মাঝরাতে জাল নিয়ে বেরিয়েছিল, সেই খবর আনল। কায়েত কর্তার মেয়ে আর মন্দিরের

পুরোহিত মশাইয়ের ছেলেকে দেখেছে নদীর পাড় দিয়ে যেতে। চাঁদিনী রাত নয় কিন্তু জ্বলজ্বলে নক্ষত্রের সার আকাশে। তাছাড়া রজনী জেলের চোখ অন্ধকারে বাঘের চোখের মতন জ্বলে।

কিন্তু কথাটা বিশেষ ছড়ায় নি। দিন দুই পরেই দোলগোবিন্দ ডেকে পাঠাল রজনী জেলেকে। চণ্ডীমণ্ডপের দালানে জানলা-দরজা বন্ধ করে অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা হ'ল। ঘণ্টাখানেক পরে যখন রজনী জেলে বেরোল, তখন সে সোজা হয়ে হাঁটতে পারছে না। সারা পিঠে রক্তের আঁচড়। তারপর থেকে রজনী জেলের কাছ থেকে কেউ আর টুঁ শব্দটি শোনে নি।

অন্য দু বৌ অবাক। গালে হাত দিয়ে বলেছে, তুই এত কথা জানলি কি করে র‍্যা ছোট-বৌ?

ছোট খুড়ি হেসেছে। দোক্তার ছিটে মুখে ছিটিয়ে একগাল হাসি।

দুজনে পালিয়ে আমার বাপের বাড়ির দেশে গিয়ে উঠেছিল যে। একদিন পালকির দরজা দিয়ে স্পষ্ট দেখলাম দুজনে চলেছে রাস্তা দিয়ে। এক গলা ঘোমটা দেওয়া, কিন্তু মেয়ে মানুষের মরণ তো। পালকি পাশ দিয়ে যেতেই ঘোমটা তুলে চাইল। ব্যস, একেবারে চোখাচোখি।

তিন বৌ মিলে প্রচণ্ড হাসি। হাসি আর থামতে চায় না।

না, আজ কিন্তু কেউ কোথাও নেই। তিনজনে বোধ হয় শুয়েছে তিন ঘরে।

আস্তে আস্তে বিশু ঝাঁপ ঠেলে নিজের ঘরে ঢুকল। নরহরি মুখুজ্জে বলে গিয়েছিল, বাঁশ কেটে পুকুর পারের জমিটা বেড়া দিয়ে দিতে। নতুন শাক লাগানো হয়েছে। আলগা থাকলে উটকো ছাগলে মুখ দিয়ে সব মুড়িয়ে খাবে। যেমন বুদ্ধি খুড়োর। আগে জমি ঠিক না করে কেউ কখনো গাছ লাগায়!

বেড়া দিতে দুপুর গড়িয়ে এল। খাওয়ার খুব তাড়া নেই, তবে কিছু একটু না খেলে চলবে না। কুমুদের বাড়ি লজ্জা করে খেয়েছে। প্রায় আধপেটা। খাটুনির পরে পেটটা খালি হয়ে আসছে।

চোখ তুলে দেখল দাওয়ায় বড় খুড়ি এসে বসেছে। ঘুম জড়ানো চোখ। এক হাতে চিরুনি দিয়ে চুলের জট ছাড়াচ্ছে।

বিশু কাছে গিয়ে দাঁড়াল। গিয়েই অবাক। কবে কোন ব্রতের সময় দাওয়ার ওপর আলপনা আঁকা হয়েছিল। চালের গুঁড়ি দিয়ে। এখনও বেশ স্পষ্ট। আলপনার দিকে চেয়ে চেয়ে বিশুর আর একটা কথা মনে পড়ল।

কুমুর জল ছড়িয়ে ঠাঁই করার ব্যবস্থা। ঠিক এমনি পরিচ্ছন্ন, আলপনার মতনই অপরূপ।

কি রে বিটলে, রোদটা আড়াল করে দাঁড়ালি কেন? শত্তুর কোথাকার।

বড় খুড়ির কথা বলার এটাই সনাতন পদ্ধতি। সর্বদাই দাঁত খিঁচিয়ে থাকে। ভাল কথাও বলে ঠিক এমনি ভাবে।

রোদ ছেড়ে বিশু দু একটা ধাপ নেমে দাঁড়াল।

খেতে দাও বড় খুড়ি, বড্ড খিদে পেয়েছে।

তবে আর কি, নবাবপুত্তুরের জন্য থালা সাজিয়ে আমি বসে আছি যেন। নে, পিঁড়ে নিয়ে বসগে যা, দেওয়া হচ্ছে। কেন, তোর মেজ খুড়ি দিতে পারে না?

অনেক রাত অবধি বিশু ছটফট করল। ঘুম এল না, ঘুম যখন এল, তখন কেবল এলোমেলো স্বপ্ন।

তিনজনে চলেছে জঙ্গলের পথ ধরে। কলকাতা কি এখানে। গোবিন্দপুরের ঘাট থেকে নৌকা চড়লে দু দিন দু রাত। রেলেও যাওয়া যায়, কিন্তু ষ্টেশন অনেক দূর। তার চেয়ে নৌকাতেই ভাল।

সবচেয়ে আগে বিশু, তারপর কুমুর বাপ, একেবারে পিছনে কুমু। অনেক কষ্টে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বিশু রাজি করিয়েছে। কোনরকমে একবার বিদ্যাসাগরের সামনে কুমুকে নিয়ে যেতে পারলেই একটা সুরাহা হয়ে যাবে। আবার নতুন করে সে জীবন আরম্ভ করতে পারবে।

কিন্তু আশ্চর্য, সারাটা দিন ঘুরে ঘুরে ঘাটে যাবার রাস্তা কেউ খুঁজে পেল না। অজগর বন ক্রমেই আরো গভীর হ'য়ে উঠল।

হঠাৎ কুকুরের ডাকে বিশুর ঘুম ভেঙে গেল। ভীষণ চেঁচাচ্ছে কুকুরটা। কি আবার হ'ল ?

ঘরের কোণে রাখা লাঠিটা নিয়ে বিশু উঠানের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল। বেড়ার ওধারে কাদের একটা দড়িছেঁড়া গরু এসে দাঁড়িয়েছে, সেই জন্য কুকুরটা তারস্বরে চিৎকার আরম্ভ করেছে।

গরু তাড়িয়ে বিশু আবার বিছানায় গিয়ে শুল।

অনেকদিন আর কুমুর সঙ্গে বিশুর দেখা হ'ল না। নরহরি মুখুজ্জের সঙ্গে সদরে যেতে হ'ল বিশুকে। নথিপত্র বগলে নিয়ে। বড়ো উকিল শিবতারণ মজুমদার। লোকে নাম করে না। বলে হাঁড়ি-ফাটা মজুমদার। নাবালক আর বিধবার সম্পত্তি কোনরকমে মুঠোয় এলে আর ছিটকে বেরোতে পারে না। জমি জেরাতের লেখাজোখা নেই। পয়সা অঢেল কিন্তু মনে সুখ নেই। একমাত্র ছেলে ব্রাহ্ম হয়ে গেছে। বিয়েও করেছে সেই সমাজে। ছেলের বৌকে শিবতারণ দেখেও ছিলেন। কোর্টে কি একটা কাজে ছেলে এসেছিল ছোট হাকিমের কাছে। বৌয়ের পায়ে সবুজ মোজা, কালো জুতো। শ্বশুরের দিকে চেয়ে হাত যোড় করে নমস্কার করেছিল। মাথা যেন কাটা গিয়েছিল শিবতারণবাবুর। কোন উত্তর না দিয়ে এজলাসের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলেন।

শিবতারণবাবুই বলছিলেন নরহরি মুখুজ্জেকে। কোণে বসে তামাক সাজতে সাজতে বিশু শুনছিল।

মেয়েছেলের পায়ে জুতো মোজা! বিশু অবাক। বাপের জন্মে সে এমন ব্যাপার শোনে নি, দেখা তো দূরের কথা। শুনেছে মেমরা নাকি জুতো মোজা পরে। মেমও বিশু কখনও চোখে দেখে নি। মেমরা শুধু জুতো মোজাই পায়ে দেয় না, ব্যাটাছেলে ছাড়াই হুট হুট করে একলা একলা এখানে সেখানে ঘোরফেরা করে। স্বাধীন জেনানা। এক স্বামী ছেড়ে তারা নাকি দরকার হ'লে আর একজনকে বিয়ে করে। এক ডাল ছেড়ে বানরের আর এক ডাল আঁকড়ে ধরার মতন।

কথাটা মনে হ'তেই বিশু খুক খুক করে হেসে ফেলল। নরহরি মুখুজ্জের তিন বৌ নরহরি খুড়োকে ছেড়ে অন্য বর জোগাড় করে নিলে কি অবস্থা হয় খুড়োর! আধবুড়ো বয়সে কপাল চাপড়ে বেড়াতে হয়। অবশ্য পাত্রীর অভাব হবে না। অনেক মেয়ের বাপ ধর্ণা দেবে নরহরি মুখুজ্জের দরজায়। কিন্তু আবার বিয়ে করে, বৌয়ের সঙ্গে এ বয়সে মানিয়ে চলাই মুস্কিল।

কি হ'ল রে, তামাক আনতে যে বুড়ো হয়ে গেলি। নরহরি মুখুজ্জে তাড়া দিয়ে উঠল।

কলকেয় ফুঁ দিয়ে বিশু নরহরি মুখুজ্জের সামনে এসে দাঁড়াল।

এটি তোমার ভাইপো না নরহরি? তাই তো বলেছিলে?

খুব দূর সম্পর্কে। গ্রাম সুবাদে।

নরহরি কথাটা চাপা দিয়ে অন্য কথা পাড়ল।

তাহ'লে আপনি বলছেন একটা ফৌজদারীও রুজু করে দিতে?

শিবতারণবাবুর কিন্তু সেদিকে নজর নেই। একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছেন বিশুর দিকে।

এরকম একটি ছোকরার আমার খুব দরকার নরহরি। ভাইপোটিকে না হয় রেখেই যাও এখানে। শিখিয়ে পড়িয়ে নিজের মুহুরী করে নিই। জ্ঞান মারা যাবার পরে আমার যা মুস্কিল হয়েছে।

নবহরি মুখুজ্জে প্রায় শিউরে উঠল। দাঁত দিয়ে জিভ কেটে বলল, আমার ছেলেপুলে নেই, ওই ভাইপোটিই সম্বল। খুড়িরাও ওকে খুব ভালবাসে। ওকে ছেড়ে ওদের থাকা প্রায় অসম্ভব।

বিশু অবাক। এমন নির্জলা মিথ্যাকথা অম্লান বদনে কেউ এক টানা বলে যেতে পারে, এ ওর ধারণারও অতীত। ভালবাসে খুড়িরা! জামা খুললে খুড়িদের ভালবাসার দাগ এখনো সারা পিঠময় দেখা যাবে।

বিশু সরে এসে দাওয়ার ওপব বসল। খুব ভাল হ'ত যদি শিবতাবণবাবুর হাতে খুড়ো ছেড়ে দিত তাকে। বই পত্তর ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে লেখাপড়াও কিছুটা শিখতে পারত। গায়ে গতরে এমন খাটতে হ'ত না। ভাল ব্যবহারও পেত। শিবতারণবাবুব পরিবারও অমায়িক মানুষ। সর্বদা মুখে হাসি। বাবা বাছা ছাড়া কথাই বলেন না। বিশু খেতে বসলে সামনে বসে তদাবক করেন। অবশ্য খাওয়ানোর যত্নটুকুই সার, আহার্য বলতে হাঁড়িফাটা মজুমদাবের কল্যাণে বিশেষ কিছু নয়। তবু বড় লোক মক্কেলেব জন্য ডাল ছাড়া রোজই একটা বাড়তি তরকারি হয়। কোনদিন সজনের চচ্চড়ি, কোনদিন আলুর খোসা-ভাজা।

এব পাশাপাশি বিশুর আব একটা কথা মনে পড়ে গেল। শিবতারণবাবুর কাছে চলে এলে কুমুদের সঙ্গে আর দেখা হবে না।

দেখা হ'য়েই বা কি হবে। কুমুর দুঃখ ঘোচাতে বিশু তো কোন দিনই পারবে না। নিজের পায়ে যদি বিশু দাঁড়াতে পারত। তার মতামতের দাম থাকত, তা হ'লে হয় তো বোঝাতে পারত কুমুর বাপকে। সঙ্গে করে কলকাতায় নিয়ে যেতেও পারত। কুমু নতুন করে গাঁটছড়া বাঁধলে, কুমুর বাপকেও এ গ্রাম ছাড়তে হবে। মাতব্বরদের দাপটে টিঁকতেই পারবে না। ধোপানাপিত সব বন্ধ।

কোন পুকুরের জল পর্যন্ত নিতে পারবে না। একঘরে হয়ে থাকতে হবে। পঞ্চানন চক্রবর্তী গাঁয়ে থাকতে এর নড়চড় হবে না।

নরহরি মুখুজ্জের ডাকে বিশুর ভাবনার জট ছিঁড়ে গেল। আস্তে আস্তে উঠে ঘরের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল।

বিশু গ্রামে ফিরল দিন সাতেক পর। সদরে থাকতেই নরহরি মুখুজ্জের শরীর খারাপ হয়েছিল। বুকের ব্যথা একটু বেড়েছিল। ফিরে এসেই বিশু ছুটল অনঙ্গ কবিরাজের কাছে।

অনঙ্গ কবিরাজ ধন্বন্তরী। সারা গোবিন্দপুরে আর কেউ কলকে পায় না। তিনি নিজে হাতে ওষুধ তৈরী করেন। ভোরে উঠে বনে বাদাড়ে ঘোরেন গাছপালার সন্ধানে। লোক দিয়ে পাতা আর শেকড় বাটান কিন্তু নিজে থাকেন সামনে বসে। কড়ায় জ্বাল দেবার সময়ও পিঁড়ি পেতে উনানের সামনে বসেন। কবিরাজিতে ওষুধ তৈরীই আসল। একটু এদিক ওদিক হলে ফল দেবে না। উল্টে রোগ বেড়ে যাবে। রোগীর অবস্থা কাহিল।

অনেকক্ষণ ধরে কবিরাজ নরহরিকে দেখলেন। দরজার ওপারে তিন বৌ দাঁড়িয়ে। মাথার কাছে হরিশ। চৌকাঠের ওপর বিশু।

হরিশকে কিছু বলা না বলা সমান। আধপাগলা ছেলে। কি শুনতে কি শুনবে। তাই অনঙ্গ কবিরাজ বৌদের লক্ষ্য করে বললেন, বয়স হচ্ছে নরহরির, এই বয়সে এত দৌড় ঝাঁপ করা ঠিক নয়।

বড় বৌ ফিস ফিস করে কি বলল। কবিরাজের কানে গেল না। যাবার কথাও নয়। মেজ বৌ হাতছানি দিয়ে বিশুকে ডাকল।

বিশু যেতে বলল, কবিরাজ মশাইকে বল, এ ছাড়া আর উপায়ই বা কি। বড়ছেলে তো আর সমর্থ নয়। ওকে দিয়ে কোন কাজ করাবার উপায় নেই। ওকে সামলাতে আর একজনকে সঙ্গে পাঠাতে হবে। আর সব তো নাবালক।

বিশুকে কিছু বলতে হ'ল না। এবার অনঙ্গ কবিরাজের কানে সব কথাই গেল। হেসে বললেন, কেন, এমন উপযুক্ত ভাইপো তো রয়েছে?

সব চুপ। বৌরা কথা বলল না, কেবল নরহরি যন্ত্রণায় কাতরে উঠল। কিসের যন্ত্রণা কে জানে!

অনঙ্গ কবিরাজ ব্যাপারটা একেবারে না বুঝলেন এমন নয়। এ বাড়ীতে আসাযাওয়া করছেন অনেক দিন থেকে। বিশুর এ বাড়ীতে ঢোকার কাহিনী অজানা নয়, তার হেনাস্থার কথাও জানা।

উঠতে উঠতে অনঙ্গ কবিরাজ বিশুর দিকে ফিরে বললেন, চল, তোমার হাতে ওষুধ পাঠিয়ে দেব।

বিশু বাইরে এসে দাঁড়াল। অনঙ্গ কবিবাজ ঘোড়ার ওপব চেপে বসলেন। তাতে অবশ্য বিশুর কোন অসুবিধা নেই। এ যা ঘোড়া, এর চেয়ে অনেক আগে বিশু গিয়ে পৌঁছাবে। মাঝখানে অনঙ্গ কবিরাজ থেমে হয়তো দু-একটা রোগী দেখবেন, সেই সময়টা ঘোড়াব লাগাম ধরে বিশুকে দাঁড়াতে হবে।

চলতে চলতেই বিশু জিজ্ঞাসা করল, কেমন দেখলেন কবিবাজ মশাই?

জুতো দিয়ে ঘোড়ার পিঠে ঘা মারতে মারতে অনঙ্গ কবিবাজ অমায়িক হাসলেন, ও কিছু নয়। বুকের ব্যথা একটু বেড়েছে, আমার হৃদয়ারোগ্য বটিকা এক শিশি খেলেই সেরে যাবে। এব আগেও তো দেখেছি।

নরহরি মুখুজ্জে এমন কিছু প্রীতির চোখে বিশুকে দেখে না। উঠতে বসতে মার আর গালাগাল, তবু একটু দুর্বলতা আছে তাব ওপর। হাজার হোক ছেলেবেলায় আশ্রয় দিয়েছিল বলেই আজ বিশু এত বড়টা হয়েছে। নইলে কোথায় ঘুরে ঘুরে বেড়াত। কার দরজায় ঠাঁই পেত ঠিক নেই।

অনঙ্গ কবিরাজ আবার বললেন, তুই লেখাপড়া কিছু শিখলি না বিশু, এরপর কি করবি? টোলেও পড়লি না, নিজে বাড়ীতে বোধ হয় বই ওল্টাবার সময় পাস না?

বিশু ঘাড় হেঁট করে রইল কিছুক্ষণ, তারপর আস্তে আস্তে বলল, পড়তে আমার খুব ইচ্ছে করে কবিরাজ মশাই। মুখুজ্জে মশাইয়ের ছেলেরা পড়ে, দাওয়ায় বসে বসে শুনি। শুনতে শুনতে ভারি সাধ যায় লেখাপড়া শিখতে। ছেলেদের পড়া ছেঁড়া বইগুলো কুড়িয়ে নিয়ে চুপি চুপি ঘরের মধ্যে বসে পড়ার চেষ্টা করি। কিন্তু অনেক পাতাই ছেঁড়া, ভারি অসুবিধা হয়।

ঘোড়ার লাগাম টেনে অনঙ্গ কবিরাজ থেমে পড়লেন। একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে দেখলেন বিশুর দিকে তারপর সস্নেহ-কণ্ঠে বললেন, বলতে পারিস না তোর খুড়োকে? লেখাপড়া করব বইপত্তর কিনে দাও, ভর্তি করে দাও টোলে।

বিশু কাতর দুটি চোখ মেলে অনঙ্গ কবিরাজের দিকে চেয়ে রইল। সর্বনাশ, এই কথা সে খুড়োকে বলবে? এর চেয়ে কেউটের গর্তে পা দেওয়া তার কাছে অনেক সোজা। অনঙ্গ কবিরাজ বোধ হয় জানেন না, এই পড়া নিয়ে এ বাড়ীতে অনেক কাণ্ড ঘটে গেছে। অনেক মারের চিহ্ন আঁকা হয়েছে বিশুর পিঠে। পঞ্চানন চক্রবর্তীর দয়ায় খুড়োর কানে সব খবরই গিয়েছিল।

অনঙ্গ কবিরাজ আর কথা বাড়ালেন না। এর পরে আরও এক জায়গায় যেতে হবে। বিশুর কিছু হোক না হোক তাতে তাঁর বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি নেই। বিশুর চেয়ে বিশুর খুড়োর দাম তাঁর কাছে অনেক বেশী। অনঙ্গ কবিরাজের বাঁধা ঘর। বৌরা, ছেলেমেয়ে, নিজের যা কিছু হোক, অনঙ্গ কবিরাজের ডাক পড়ে। সর্দি থেকে সান্নিপাতিক।

সত্যিই ওষুধের আশ্চর্য গুণ। গোটা সাতেক বড়ি আর বার

চারেক মালিশ, নরহরি বালিশে ঠেশ দিয়ে বসল। বসে বসেই বিশুকে তলব। খেতখামারের খবর, কাজের নির্দেশ। গরুর পরিচর্যার উপদেশ। তার মাঝেই একবার ধমক।

কবিরাজ মশাইয়ের কাছে গিয়ে বুঝি খুব দুঃখের কথা জানানো হয়?

বিশু অবাক। দরকার পড়লে অনঙ্গ কবিরাজের কাছে তাকেই দৌড়োতে হয়। কবিরাজকে ডাকা, ওষুধ আনা, রোগী কেমন থাকে তার খবর। কিন্তু নিজের কথা আবার কি বলল বিশু!

না, আমি আবার কি বললাম। বিশু আমতা আমতা করল।

না তো, তোর হ'য়ে অত কথা বলতে আসে কেন কবিরাজমশাই?

বিশুর মাথায় বাজ ভেঙে পড়ল। সর্বনাশ, অনঙ্গ কবিরাজ কোন ফাঁকে বুঝি বিশুর বইপত্র কেনার কথা নরহরির কাছে পেড়েছে।

বিশু ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ তারপর আস্তে আস্তে বলল, আমার হ'য়ে কি কথা?

উপযুক্ত ভাইপো রয়েছে, তাকে দিয়ে সদরের কাজ করানো!

ওঃ, এই কথা, ঘাম দিয়ে বিশুর জ্বর ছাড়ল। পথ চলতে চলতে অনঙ্গ কবিরাজ যে কথার আভাস দিয়েছিলেন সে কথার টুকরো নরহরির কানে গেলে আর দেখতে হত না। মারতে মারতে বিশুকে একেবারে নিকেশ করে দিতেন। রক্ত ওঠাতেন মুখ দিয়ে।

ওষুধের বাটিটা সরাতে সরাতে বিশু বলল, আমি তো কোন কথা ওঁকে বলি নি।

কথাটা এখানেই চাপা পড়ে গেল। বড়বৌ কাছে এসে দাঁড়াল। হাতে পানের বাটা। আয়েস করে স্বামীর বিছানার ওপর বসল।

বিশু উঠানে এসে দাঁড়াল। আজকের মতন কাজ শেষ। এবার শোবার পালা। এই সময়টা বিশুর অবসর। একটা বাতি পেলে অনায়াসেই এ সময়টা সে পড়াশোনা করতে পারে। ছেঁড়া বইগুলো

সন্তর্পণে সজনে গাছের আঠা দিয়ে জোড়া লাগিয়েছে। সযত্নে রেখে দিয়েছে বিছানার তলায়। চাঁদনী রাতে জানলার ধারে বসে বিশু পড়ার চেষ্টা করে। সব কথা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। জিজ্ঞাসা করার লোক নেই। টোলের মাষ্টারদের খুড়তুতো ভাইদের পৌঁছে দেবার সময় দু একটা পড়া জিজ্ঞাসা করেছে। তাঁরা বলে দেন নি, উপরন্তু হেসেছেন, গরীবের ঘোড়া রোগ কেন রে বিশে। খড় কাটছিস, গরু দেখছিস, খেতখামারের কাজ করছিস, এই তো বেশ। দিগগজ পণ্ডিত হয়ে ওঠার বাসনা কেন? অনেক কাঠ খড় পোড়াতে হয়। ও সব দুর্বুদ্ধি ছেড়ে দাও বাপধন।

বিশু সত্যি সত্যিই আর কোন চেষ্টা করে নি। করেও লাভ নেই। পৃথিবীর সব লোক যেন ওর বিরুদ্ধে। একটু দাঁড়াবার চেষ্টা করলেই টেনে হিঁচড়ে মাটিতে ফেলে দেবে।

দুপুরের দিকে বিশুর কাজ একটু তাড়াতাড়িই শেষ হয়ে গেল। খেতের কোন কাজ নেই। তিন বৌয়ের দু বৌ বাপের বাড়ী, কাজেই ঘরের কাজও একটু কম। নরহরি মুখুজ্জের শরীর খুব ভাল নয়। লাঠিতে ভর দিয়ে চলাফেরা করে। বুকের ব্যথাটা নেই, কিন্তু কোমরে একটা ব্যথা হ'য়েছে ক'দিন ধরে। চলতে ফিরতেই খচ করে লাগে। চণ্ডীমণ্ডপে শুয়ে আছে। তার মানে সন্ধ্যার আগে আর উঠছে না।

উড়ুনিটা গায়ে জড়িয়ে বিশু বেরিয়ে পড়ল। অনেকদিন ধরেই যাবে যাবে করছিল, কিন্তু একটার পর একটা ঝামেলা চলেছে। গণ্ডীর বাইরে পা দেওয়াই মুস্কিল।

একটানা ছুটে একেবারে চাঁপাগাছতলায় এসে থামল। মাথা উঁচু করে দেখল। না আজ কোন সোনাচাঁপা ফোটে নি। ফুলও ফোটে নি, কুমুও ধারে কাছে কোথাও নেই।

গাছপালার ফাঁক দিয়ে মন্দিরের চূড়োটা দেখা যাচ্ছে রাধাগোবিন্দজীর মন্দির। সেইদিকে বিশু পা চালাল।

ঠিক চাতালের ওপরই দেখা হ'ল। বকুলগাছের ঝাঁকড়া শাখায় এদিকে বেশ ছায়া হয়েছে। সেখানে কুমুর বাবা বসে আছেন। চোখ নিমীলিত। বিড় বিড় করছে দুটো ঠোঁট, বোধ হয় নামগান করছেন।

বিশু সামনে গিয়ে বসল।

একটু বোধ হয় শব্দ হয়ে থাকবে। কুমুর বাপ চমকে চোখ খুললেন। চোখ খুলেই হাসলেন, আরে কি খবর তোমার? অনেকদিন যে দেখিনি?

কর্তার সঙ্গে সদরে গিয়েছিলাম।

কি মনে করে বিশু হাত বাড়িয়ে কুমুর বাপের পায়ের ধূলো নিল। থাক্, থাক্। কুমুর বাবা বিশুর মাথায় হাত রাখলেন কিছুক্ষণ, তারপর বললেন, হঠাৎ সদরে?

কর্তার কয়েকটা মামলা মকর্দমা ছিল কিনা।

মামলা মকর্দমা?

হ্যাঁ, বিষয় সম্পত্তি নিয়ে।

কুমুর বাবা হাসলেন, গোবিন্দজী আমাকে ওই বিষ থেকে একেবারে মুক্ত করেছেন।

আপনি থাকেন যেখানে?

ও, আমার জমি নয়। এক বৈষ্ণব মহাপুরুষের জমি। রাধা-গোবিন্দের যারা সেবায়েত থাকবে, তারা শুধু ভোগদখল করবে। জমির মালিক হতে পারবে না। তাই তো বলছি, গোবিন্দজী কোন বন্ধন রাখেন নি, শুধু ওই মেয়েটা পায়ের বেড়ী হয়ে রয়েছে। অবশ্য আর একটা কথাও ভাবি, ও না থাকলে এ বয়সে কেই বা আমার দেখাশোনা করত। বিয়ের মাস কয়েকের মধ্যে শাঁখা সিঁদুর ঘুচিয়ে আমার

কাছে ফিরে এল, সেই থেকে আমার কাছেই রয়েছে। আর যাবেই বা কোথায়।

কেন, শ্বশুরবাড়ী? আচমকা বিশুর মুখ থেকে কথাটা বেরিয়ে গেল।

শ্বশুরবাড়ী!

বিশুর মনে হ'ল নিমেষের জন্য কুমুর বাবার চোখ দুটো যেন চক চক করে উঠল।

শ্বশুরবাড়ীতে ওর ঠাঁই নেই।

ঠাঁই নেই!

না বাবা, ও হতভাগীর সর্বনাশ আমিই করেছি! তখন অতটা তলিয়ে দেখি নি। সহায় সম্বল ছিল না, লোকবল ধনবল কোনটাই নয়। তার ওপর ওই আগুনের ফুলকি মেয়ে। সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকতাম। নীলকর সাহেবেব দৌরাত্ম্যে টেকাঁই দায়। এমন সময়ে সম্বন্ধ এল। একেবারে আচমকা।

তখন থাকি মোহনপুরে। দু এক ঘর যজমান ছিল। বাড়ী বাড়ী লক্ষ্মীপূজো, শেতলা পূজো করে বাপবেটির দিন কেটে যেত। কুমুব মা যখন যায় ও তখন খুবই ছোট। কোন রকমে ওকে বড় করে তুলেছিলাম।

মেয়ে বড় হ'তে আত্মীয়-স্বজন যারা কোনদিন ভুলেও খোঁজ করে নি, তারাই উপযাচক হয়ে বাড়ীতে এসে হাজির। আট বছরে গৌরী দান, শাস্ত্রের বিধি। কোন রকমে পাত্র যোগাড় করে শুভ-কাজটা করতে পারলে আমার অক্ষয় স্বর্গলাভ। কিন্তু স্বর্গলাভ বরাতে ছিল না, অনেক খোঁজ করেও পাত্র জোটাতে পারলাম না। যাও বা দু একজন এল, তারা এমন দর হাঁকল যে আমার নাগাল পাওয়া অসম্ভব।

একদিন সকালের দিকে দাওয়ায় বসে আছি, কুমু গিয়েছে নদীতে

স্নান করতে। একেবারে বাড়ীর গায়ে নদী। পাড়ার দু একজন মেয়েও সঙ্গে গিয়েছে, হঠাৎ জুতোর মস মস আওয়াজে চমকে চোখ তুললাম।

চোখ তুলে আর অনেকক্ষণ চোখ নামাতে পারলাম না। দেবরাজ ইন্দ্র যেন ভূতলে নেমেছেন। বয়স বছর কুড়ির বেশী নয়। সুগৌর বর্ণ, অনিন্দ্যসুন্দর কান্তি, ঘাড় পর্যন্ত বাবরী চুল।

একটা নিবেদন আছে।

শশব্যস্তে উঠে দাঁড়ালাম। দাওয়ায় মাদুর পেতে দিয়ে বললাম. বসুন আপনি।

ছেলেটি বসল। বসেই বলল, আপনি আমাকে আজ্ঞে করবেন না, আমি আপনার পুত্রের সমান।

একটু পরেই আসল কথা পাড়ল।

আমার মেয়েকে বজরা থেকে দেখেছে। ঘাটে বজরা বেঁধে মাঝির মারফৎ নাম ধাম জেনেছে। স্বজাতি, পাল্টা ঘর, তাই মেয়েটিকে ভিক্ষে চাইতে এসেছে।

নিজের পরিচয়ও দিল। বাবুইতলার জমিদার। রাজা খেতাব আছে। পুরানো বংশ। মুসলমান আমলে বাংলার সুবেদারের কাছ থেকে ইনাম পেয়েছিল, তাকে সাহায্য করার জন্য। বুড়ো বাপ জীবিত। মা নেই, তাই বোধ হয় এতদিন বিয়ের তাগিদ কেউ দেয় নি। বাপ কাশীবাসী হবেন, তাই কাশীতে তাঁর থাকার সব বন্দোবস্ত করে ছেলে জমিদারিতে ফিরছে, হঠাৎ মাঝপথে কুমুকে দেখে মন টলেছে। বিয়ে যদি করতেই হয় তো এমন মেয়ে।

একথাও কুমুর বাপকে সে বলেছিল। বাবা নিজে আসবেন পুরোহিত মশাইকে সঙ্গে করে। মেয়ের কোষ্ঠি ঠিকুজী বিচার করবেন। তবে মিল হয় তো, কোন অসুবিধা নেই। ছেলের পছন্দই সব।

আমি কিন্তু হাতযোড় করেছিলাম। শুরুতেই সব কথা বলে ফেলা ভাল। পরে এ নিয়ে কোন কথা না ওঠে।

আর্থিক অস্বাচ্ছন্দ্যের কথা তুলতেই ছেলে হাত তুলে বাধা দিয়েছে, ওসব কথা তুলবেন না ভটচায মশাই, সে দিকে লক্ষ্য থাকলে এভাবে হাত পেতে আপনার কাছে মেয়ে চাইতে আসতাম না।

সারাটা জীবন সৎপথে থাকার চেষ্টা করেছি, জ্ঞানতঃ কখনও কারো অপকার করিনি, সেই জন্য ভাবলাম গোবিন্দজী সদয়। নইলে এমন ঘরে মেয়ে দেওয়া শুধু আমার সাধ্যের নয়, কল্পনারও অতীত।

দিন পনেরো পরে গরীবের কুঁড়ের সামনে পালকি এসে থামল। কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে গেলাম। রাজা রাঘবেন্দ্র রায়, সঙ্গে কুল-পুরোহিত। আগেই চিঠিতে খবর দিয়েছিলেন। ভোরে আসবেন। সকাল আটটা চুযান্নয় লগ্ন শুভ। সেই সময় মেয়ে দেখবেন। কোষ্ঠির নকল নিয়ে যাবেন। বিচার করে পরে মতামত জানাবেন।

তাই হ'ল। দশ বছর তখনও পূর্ণ হয়নি কুমুর। নীলাম্বরী শাড়ী জড়িয়ে মেয়ে এসে দাঁড়াল। রাঘবেন্দ্র রায়ের চোখে পলক নেই। একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন।

কোষ্ঠির নকল নিয়ে তাঁরা চলে গেলেন। দিন দশেক পরে চিঠি এল। চিঠি পড়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম।

মেয়ে রাজরাণী হবে। যে সংসারে যাবে, উপচে পড়বে সে সংসার, বাড় বাড়ন্ত হবে। কোষ্ঠির মিল রাজযোটক। তবে ছেলের জন্য নয়, এ মেয়ে রাঘবেন্দ্র রায় নিজের জন্য নিয়ে যাবেন। সতেরোই অঘ্রাণ শুভদিন। বজরা সাজিয়ে রাজা আসছেন। ভটচায মশাই যেন তৈরি থাকেন।

ভাবলাম মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে যাই কোথাও। অনেক দূরে কোন দেশে। কিন্তু তা আর হ'ল না। আবার আত্মীয়রা বাদ

সাধল। বলল, আমি কি পাগল। হাতের লক্ষ্মী কেউ পায়ে ঠেলে। রাজার বেহাই হওয়া সহজ কথা !

সেই রাজার বেহাই হলাম বাবা। তবে বরাতে সইল না।

কুমুর বাপের ছুচোখ জলে ভরে উঠল। অনেকক্ষণ আকাশের দিকে চেয়ে রইলেন, তারপর কোঁচার খুঁটে চোখ মুছে বললেন, কটা মাস পরেই মেয়ে ফিরে এল। রাজরাণীর পোষাক ছেড়ে ভিখারিণীর সাজে। রাঘবেন্দ্র রায় চোখ বুজতেই তার .ছেলে প্রতিশোধ নিল। তার মুখের গ্রাস কেড়ে নেবার ফল। বিষয় সম্পত্তি সব তার নামে। ছল করে গায়ের অলঙ্কার সরিয়ে এক কাপড়ে কুমুকে বের করে দিল। তারপর থেকেই কুমু আমার কাছে। মোহনপুব ছেড়ে গোবিন্দপুব। গোবিন্দজীর সেবা করার ভার জমিদারের ভয়ে কেউ যখন নিতে রাজী নয়, তখন আমি.এগিয়ে এসেছি।

বিশু নিবিষ্ট মনে কথাগুলো শুনছিল। সাড় নেই, চেতনা নেই, যেন রূপকথার কাহিনী শুনছে। কুমুব বাবা থামতেই বিশু নড়ে চড়ে ঠিক হয়ে বসল। আভাসে বুঝল তারও ছুচোখ ভিজে। গলাব কাছে কুণ্ডলী লাফিয়ে উঠছে কান্নার বেগ।

ঠিক এই সময়। বলবার .এমন চমৎকাব মুহূর্ত বুঝি আর আসবে না। বিশু মনে মনে ভাবল। বিদ্যাসাগরের কথাটা এখন একবার বললে হয়। পুবানো লোক, পুরানো দুঃখ সব ভুলে আবার নতুন জীবন যাত্রা। নতুন মানুষকে পাশে নিয়ে।

কিন্তু কি ভেবে বিশু আর কিছু বলল না। কুমুব বাপের মনের এ অবস্থায় এসব কথা না তোলাই ভাল। তাছাড়া সমাজপতিদেব কথা মনে পড়ল।

যারাই বিধবা বিয়ে করে তারাই সুখী হয় না। কোন না কোন অমঙ্গল ঠিক ঘনিয়ে আসে তাদের জীবনে। মাঝে মাঝে প্রাণ দিয়েও পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে। কাজেই জোর করে কিছু বলা যায় না।

হয়তো কাশীপতি ন্যায়রত্নের কথাই ঠিক। বিদ্যাসাগর দেশের সর্বনাশ করছে।

যাক গে বাবা, পুরানো কথা মনে পড়লেই বুকটা মোচড় দিয়ে ওঠে। চোখের সামনে মেয়েটা ওই পোষাকে ঘুরে বেড়াবে, দেখতেও পারি না বাবা, তাই সময় পেলেই এই মন্দিরে রাধাগোবিন্দজীর পায়ের তলায় এসে পড়ে থাকি।

কথার সঙ্গে সঙ্গে কুমুর বাবা দাঁড়িয়ে উঠলেন। মন্দিরের চৌকাঠের কাছে গিয়ে দুটো হাতযোড় করলেন।

ঠাকুর, মঙ্গল কর। শান্তি দাও ঠাকুর, শান্তি দাও।

ঘাড় ফিরিয়েই বিশু দেখতে পেল। একটা থালায় একগোছা মালা নিয়ে কুমু আসছে।

চাতাল বরাবর এসেই থমকে দাঁড়াল।

একি তুমি এতদিন ছিলে কোথায়? কুমু হাসল।

সদরে গিয়েছিলাম।

সদরে!

হ্যাঁ, যে বাড়ীতে কাজ করি, সেই কর্তার সঙ্গে।

কতক্ষণ থেকে বসে আছ? বাবার সঙ্গে দেখা হয় নি?

হ্যাঁ, এতক্ষণ বসে বসে গল্প করছিলাম।

বিশু মুখ তুলে দেখল, কুমুর বাপ আর চৌকাঠে দাঁড়িয়ে নেই, মন্দিরের ভিতরে গিয়েছেন।

বিশুর কথা শুনে কুমু ভ্রূ কোঁচকাল।

গল্প? বাবার সঙ্গে?

গল্প মানে, তোমার বিয়ের কথা শুনছিলাম।

আর একটু হ'লেই থালাটা হাত থেকে ছিটকে পড়ত। চাতালটা ধবে কুমু টাল সামলাল। সারা মুখে আবিরের ছিটে, দুটো চোখে জোনাকীর দীপ্তি।

আর একটি কথাও না বলে কুমু সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল। বিশুর দিকে আর ফিরেও দেখল না।

বিশু আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। একবাব ভাবল বাড়ীর দিকে ফিরে যাবে, কিন্তু পারল না। দুর্বার এক আকর্ষণে মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেল।

কুমু হাঁটু মুড়ে বসেছে। সামনে থালার ওপর মালার ছড়া। একপাশে বাটা চন্দন। কুমুব বাবা একটি একটি করে মালা নিয়ে বিগ্রহ দুটির গলায় পরিয়ে দিচ্ছেন।

একটু আগেকার মুখের ভাব আর নেই—শোকের ছায়ার লেশমাত্র নয়। অনির্বচনীয় দীপ্তি মুখের রেখায় রেখায়, চোখের দৃষ্টিতে গভীর প্রশান্তি।

বিশু সরে যাবার চেষ্টা করতেই বাধা পেল। কুমুর বাবা হাত নেড়ে বারণ করলেন।

বিশু দরজার কবাটে হেলান দিয়ে দাঁড়াল।

একটু পরেই কুমুর বাবা উঠে এসে তার কপালে চন্দনের ফোঁটা এঁকে দিলেন। বিড় বিড় করে বললেন, সুখী হও বাবা, শান্তি পাও।

বিশু সিঁড়ি বেয়ে নেমে মাটির ওপর দাঁড়াল। সূর্যের তেজ কমে এসেছে। দীর্ঘতর হয়েছে গাছের ছায়া। অনেক দেরী হয়ে গেছে। হাতের কাজ সব সেরে সে বেরিয়েছে বটে কিন্তু নতুন ফরমাশ আসতে কতক্ষণ।

বিশু ছুটতে শুরু করল। এ যেন এক জীবন থেকে ছুটে আর এক জীবনে প্রবেশ করা। আলো থেকে অন্ধকারে। মুখুজ্জে বাড়ীতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে মনটা বিশুর খারাপ হয়ে যায়। গরুব সেবা, বেড়া বাঁধা, উঠান ঝাঁট দেওয়া সমস্ত জীবন সীমিত হয়ে আসে এই কটা ছুটকো কাজের মধ্যে। বাঁচার আগ্রহ আর উদ্দীপনা কমে আসে।

বাড়ীর কাছ বরাবর এসে বিশু দাঁড়িয়ে পড়ল। উড়ুনি দিয়ে মুখটা মুছে নিয়ে আস্তে আস্তে চলতে আরম্ভ করল।

বেড়ার এধার থেকেই দেখা গেল। চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় নরহরি মুখুজ্জে আর মিত্তির মশাই দাবার ছক পেতে বসেছে। এখন দুজনেই বাহ্যজ্ঞান শূন্য। নিজেদের কাছায় আগুন লাগলেও হুঁস থাকবে না।

পাশ কাটিয়ে বিশু এদিকে চলে এল। এত দুঃখের মধ্যেও বিশুর একটা সুখ হয়েছে। নতুন এক রাখাল এসেছে। নাম পরাণ। সেই আজকাল গরু নিয়ে মাঠে যায়। বয়সে বিশুর চেয়েও বড়। এ বাড়ীতে থাকে না। গরু গোয়ালে দিয়ে নিজের গাঁয়ে চলে যায়। এক পিসি বুঝি আছে। বিশুর এদিকের কাজ বেড়ে গেছে বলেই বাড়তি একটা লোক রাখা হয়েছে।

দাওয়ার ওপর পাশাপাশি অনেকগুলো হুঁকো। কতকগুলো কড়ি বাঁধা, তার মানে বামুনের হুঁকো। বসে বসে বিশু দুটো কলকেয় টিকে ধরাল তারপর দুটো হুঁকো, একটা বামুনের আর একটা কায়েতের, দু হাতে নিয়ে নরহরির কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

সাড়া নেই। বিশু গলার শব্দ করল, কোন ফল হল না। দুজনেই গালে হাত দিয়ে বসে। পড়ন্ত রোদে দাবার ঘুঁটিগুলোর ছায়া দীর্ঘ হয়ে চণ্ডীমণ্ডপের দেয়ালে পড়েছে। মানুষগুলোর চেয়েও বড়।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বিশু কথা বলল, তামাক এনেছি।

নরহরি সাড়া দিল না, কথা বললেন মিত্তির মশাই।

বিশে কি বলছে শোন ?

নরহরি এতক্ষণে মুখ তুলে চাইল, কিরে কি বলছিস ?

তামাক এনেছি।

এনেছিস। নরহরি ভারি খুশী। এমন একটা নেশারই দরকার ছিল কিন্তু খেলার ঝোঁকে ঠিক মনে করতে পারে নি। বিশুকে ডেকে যে বলবে, সে খেয়ালও ছিল না।

মিত্তির মশাইয়েরটা ?

এই যে। কায়েতের হুঁকোটা মিত্তির মশাইয়ের পাশে রেখেই বিশু থমকে দাঁড়াল। একটা বই। আনকোরা নতুন নয়। সামনের অনেকগুলো পাতা ছেঁড়া।

হেঁট হ'য়ে বিশু বইটা তুলে নিল। এখনও হাতে কিছু সময় আছে। রোদ আরো পড়লে তখন উঠান ঝাঁট দেবার কাজ শুরু হবে। জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে।

বইটা হাতে নিয়ে বিশু চণ্ডীমণ্ডপের সিঁড়ির এককোণে বসল। এখানে বসাই সুবিধে। খুড়িরা ভাববে নরহরির কাছে ফরমাশ খাটছে বিশু। অন্দর থেকে এতদূরে এসে দেখার উপায় নেই। চেঁচিয়ে ডাকতেও পারবে না।

দু একটা পাতা উল্টেই বিশু অবাক। পাতার ওপর বিদ্যাসাগরের নাম লেখা। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তাহ'লে বিদ্যাসাগরের লেখা বই। নিশ্চয় বিধবাদের বিয়ে সম্বন্ধে কিংবা মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো সম্বন্ধে কিছু লিখেছেন। এদিক ওদিক চেয়ে বিশু বইটা কপালে আর বুকে ঠেকাল।

অস্পষ্ট ছাপা। বইটা অনেক হাত ঘুরে ঘুরে আরো ময়লা হ'য়েছে। কালো কালো দাগ এখানে ওখানে।

সামনের দু একটা পাতা নেই। মলাটের পরের পাতাটাও আধছেঁড়া। বইয়ের নাম জানবার উপায় নেই, শুধু বইটা যিনি লিখেছেন, তাঁর নামটুকু পাওয়া যায়।

বিশুর বিদ্যা দিয়ে এ বইয়ের পাঠোদ্ধার করা দুরূহ। অনেক জায়গায় মানে বুঝতে পারল না, আবার অনেক জায়গায় উচ্চারণের কাঁটাঝোপের ওপর হোঁচট খেল।

তিনটি মেয়ে। কাদের মেয়ে বিশু বুঝতে পারল না। বনে বনে ঘুরে বেড়ায়। ফুল তোলে, মালা গাঁথে, নদী থেকে জল আনে,

হরিণের বাচ্চাদের আদর করে। ফুলের মালা মাঝে মাঝে এ ওর গলায় পরিয়ে দেয়। হাসি ঠাট্টা করে।

এমন সময়ে সে বনে এক রাজা এলেন।. দুর্দান্ত রাজা। পরাক্রমে সারা পৃথিবী কাঁপে। শিকারের খোঁজে বনে এলেন, কিন্তু শকুন্তলা বলে যে মেয়ে তাকে দেখে মুগ্ধ হলেন।

এই পর্যন্ত পড়েই বিশু বইটা মুড়ে ফেলল। এ কি হ'ল। কুমুর কথা বিদ্যাসাগর জানলেন কি করে? এতো ঠিক একই ব্যাপার, একটু শুধু ঘুরিয়ে লিখেছেন।

বাবুইতলার রাজা রাঘবেন্দ্র রায়ের ছেলে কাশী থেকে ফিরছিলেন বজরা করে, মাঝপথে দেখলেন কুমুকে। দেখে আর চোখের পলক পড়ল না তাঁর। খোঁজ খবর নিয়ে সোজা চলে এলেন কুমুর বাপের কাছে।

কিন্তু রাঘবেন্দ্র রায়ের ছেলের চেয়ে সেকালের রাজা অনেক চালাক। বুড়ো মুনির কাছে না গিয়ে, দাঁড়ালেন শকুন্তলার সামনে। বুড়ো বাপকে এর মধ্যে না এনে নিজেই বিয়ের কথাবার্তা পাড়লেন। শকুন্তলার জীবনে যেমন হয়েছিল, কুমুর জীবনেও যদি ঠিক এমনি হত। রাঘবেন্দ্র রায় না এসে, তাঁর ছেলে কুমুর কাছে এসে দাঁড়াতেন। একেবারে বজরায় তুলে নিয়ে যেতেন নিজের দেশে। এতদিনে কুমু বাবুইতলার রাণী হয়ে যেত। আজকের মতন এমন পাড়খসা থান কাপড় নয়, খালি হাতও না। ঝলমলে শাড়ী। গলায়, নাকে, কানে, হাতে, কোমরে ভারি ভারি অলঙ্কার। আলো লেগে ছিটকে পড়বে দ্যুতি। যাত্রার আসরে কয়েকবার রাণী বিশু দেখেছে। একপিঠ কোঁকড়ানো চুল। ধবধবে গায়ের রং। অঙ্গে দামী পোষাক। ঠিক সেই রকম।

রাজা রাঘবেন্দ্র রায়ের ছেলের ওপর বিশুর রাগ হ'ল। এত বড়লোক হয়ে এমন কাঁচা কাজটা করলেন। একটা মেয়ের জীবন এমনভাবে নষ্ট করে দিলেন।

আবার বিশু বইটা পড়তে শুরু করল। পড়ার আগে আড়চোখে একবার দাবার আসরের দিকে চেয়ে নিল। না, কোন ভয় নেই, তুজনেই খেলায় মত্ত।

রাজা চলে গেলেন বন থেকে। যাবার সময় বলে গেলেন, রথ নিয়ে আবার আসবেন, শকুন্তলাকে নিয়ে যাবেন রাজধানীতে। তারপর শকুন্তলার কি কষ্ট। কেঁদে কেঁদে চোখ লাল। শুতে পারে না, খেতে পারে না, কেবল রাজার কথা ভাবে। সখীরা বাতাস করে, সারা অঙ্গে চন্দন মাখিয়ে দেয়, তবু কষ্ট কমে না। একলা হলেই আছাড়ি পিছাড়ি খেয়ে কাঁদে।

আবার বিশুর কুমুর কথা মনে পড়ে গেল। রাঘবেন্দ্র রায় মারা গেলে কুমুও এমনিভাবে নিশ্চয় কেঁদেছিল। স্বামী যাওয়া মানে তো মেয়েছেলের সর্বস্ব যাওয়া। নির্ভর করবার মতন আর কে রইল পৃথিবীতে !

শকুন্তলার যখন মনের এমনি অবস্থা তখন এক বদরাগী ঋষি এসে হাজির। নাম তুর্বাসা। শকুন্তলা অন্যমনস্ক, তুর্বাসাকে দেখতেও পেল না, তার কথাও শুনতে পেল না। আর যায় কোথায়। তুর্বাসা শাপ দিয়ে দিল। মোক্ষম শাপ। যার কথা ভাবতে ভাবতে ঋষিকে শকুন্তলা অবহেলা করল, সেই লোক শকুন্তলাকে একেবারে ভুলে যাবে।

কাছেই তুই সখী ছিল, তারা ছুটে গিয়ে তুর্বাসার পা জড়িয়ে ধরল, কিন্তু কিছু হ'ল না। তুর্বাসা অভিশাপ ফেরাল না। এদিকে শকুন্তলার কান্নার শেষ নেই। পশুপাখী গাছপালা তার তুঃখে কাঁদতে লাগল।

তন্ময় হয়ে বিশু পড়তে লাগল। মাঝে মাঝে খটমট কয়েকটা বানান। বেশ তু একটা কথার মানেও বুঝল না, কিন্তু বই ছাড়ল না।

পাতা উল্টেই বিশু কপালে হাত চাপড়াল। সর্বনাশ আর পাতা নেই। শকুন্তলার কি হ'ল জানবার কোন উপায় নেই। রাজা তাকে ভুলে গেল কিনা দুর্বাসার অভিশাপে, আবার দুজনের দেখা হ'ল কিনা এ খবর কোথা থেকে বিশু জোগাড় করবে! এমন জানলে এ বই সে পড়তেই আরম্ভ করত না।

বইটা মুড়ে রেখে বিশু চুপচাপ বসে রইল। খেয়াল হল আগল খোলার আওয়াজে। পরাণ গরুর পাল নিয়ে ফিরছে। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমেছে চারপাশে।

এবার বিশুর কাজ শুরু হবে। আর বসে থাকলে চলবে না।

বইটা হাতে নিয়ে বিশু উঠে দাঁড়াল। দাবা খেলা শেষ। এখন ছক গুটিয়ে রেখে খেলার সমালোচনা চলেছে। সন্তর্পণে বিশু ভৈরব মিত্রের পাশে বইটা রেখে দিল। হুঁকো দুটো হাতে করে নিয়ে বাইরে চলে গেল।

খাওয়া দাওয়া সেরে বিশু যখন শুতে গেল তখন রাত অনেক।

কাজ করতে করতে বিশু বার বার অন্যমনস্ক হয়ে গেল। মনটা উধাও। কেবলি ঘুরে ঘুরে কুমু আর শকুন্তলার কথাটা মনে পড়তে লাগল। কি হল শকুন্তলার? কি হবে কুমুর?

আশ্চর্য কাণ্ড, কুমুকে ঝলমলে পোষাকে রাণীর বেশে ভাবতে বিশুর ভাল লাগল না। এ বেশে কুমু আয়ত্বের বাইরে, বিশুর নাগালের মধ্যে নয়, সেই জন্যই কি! মনে হ'ল পাড়হীন শাড়ী আর নিরাভরণ দেহ, এতেই কুমুর শুচিস্নিগ্ধ যে রূপ ফুটে ওঠে তার তুলনা নেই।

বিশু ঠিক করল, পরের দিন সকালে সময় সুযোগ করে একবার বেরিয়ে পড়বে। কুমুদের বাড়ী। কুমু না থাকলেই ভাল। কুমু সামনে থাকলে এসব কথা বলতে বিশুর ভারি লজ্জা করে। কুমুর

বাবাকেও বলতে তার বেশ সঙ্কোচ হবে। কিন্তু দিনের পর দিন এমন দেরী করে লাভ কি! বয়স তো ক্রমে বেড়েই চলেছে। তার চেয়ে বিদ্যাসাগরের বাছাই করা কোন পাত্রের সঙ্গে আবার যদি নতুন জীবন শুরু করতে পারে কুমু তো বাকি দিনগুলো অন্ততঃ সুখে কাটবে।

এ গ্রাম ছেড়ে কুমুকে চলে যেতে হবে। তাতো হবেই। বিয়ের পর কোন মেয়ে বাপের বাড়ীতে থাকে! শুধু কুমুকে নয়, কুমুর বাপকেও রাধাগোবিন্দজীর মন্দির ছেড়ে কোথাও চলে যেতে হবে। নতুন কোন মন্দিরের সেবায়েত হয়ে।

ভোরে চিৎকারে বিশুর ঘুম ভেঙে গেল। কি ব্যাপার, এখনও ভাল করে আলো ফোটে নি আকাশে, শুধু অন্ধকারটা ফিকে হয়ে এসেছে। এত ভোরে ডাকাডাকি কেন, কারুর বিপদ নাকি!

বিশু ধড়মড় করে উঠে পড়ল। ঝাঁপ খুলে বাইরে এসে থমকে দাঁড়াল। ঠিক বেড়ার ওপারে একজন দাঁড়িয়ে নরহরি মুখুজ্জের নাম ধরে চেঁচাচ্ছে।

লোকটাকে বিশু দেখতে পেল না, কিন্তু গলার আওয়াজে চিনতে অসুবিধা হ'লনা।

পঞ্চানন চক্রবর্তী। এত ভোরে চক্রবর্তী মশাই যে? কারুর সর্বনাশের খবর সঙ্গে না নিয়ে লোকটা ঘোরাফেরা করে না। মানুষের দুঃসংবাদেই তার সবচেয়ে আনন্দ। খুঁটে খুঁটে পাড়ার নোংরা সংগ্রহ করে। পরের কুৎসা এমন ভাবে বলে যেন নামগান করছে।

কে? বিশু এগিয়ে বেড়ার কাছ বরাবর দাঁড়াল।

এই যে নবাবের নাতির এতক্ষণ পরে ঘুম ভাঙ্গল। দয়া করে দরজাটা খুলে দাও। আধঘণ্টা পথের ওপর দাঁড়িয়ে আছি।

বিশু আগল খুলে দিতে পঞ্চানন হন হন করে চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় এসে বসল।

মুখুজ্জেকে একবার খবর দে। আমার নাম করে বল।

বিশু ইতস্তত করল। এখনও সকাল হতে একটু দেরী। মুখুজ্জে মশাইয়ের শরীর আজও ঠিক হয় নি। এই সময় তাকে বিছানা থেকে তোলাটা কি ঠিক হবে। তার ওপর বাতের ব্যথাটা রয়েছে কোমরের। এত ভোরে ঠাণ্ডা লেগে গেলে আবার মাসখানেক কাত হয়ে থাকতে হবে।

কিন্তু উপায় নেই। দরজায় পঞ্চানন শুনলে মরা মানুষ ধড়মড় করে উঠে পড়ে, নরহরি তো ছার!

দাওয়ার ওপর উঠে বিশু শিকল নাড়ল। একবার, তুবার, তিনবার, কোন সাড়া শব্দ নেই। এ ঘরে ছোট খুড়িও রয়েছে। কাছে পিঠে বাজ পড়লেও ছোট খুড়ির ঘুম ভাঙে না। অল্প বয়সে ঘুম একটু গাঢ়ই হয়।

শিকল ছেড়ে বিশু দরজায় ধাক্কা দিতে আরম্ভ করল। তু একবার ধাক্কা দিয়েই কথাটা বিশুর মনে পড়ল।

পঞ্চাননকে এক ছিলিম তামাক সেজে দেওয়া উচিত। তবু হাতের কাছে তামাকটা পেলে মেজাজটা একটু ঠিক থাকবে। নরহরি একটু দেরীতে উঠলেও অপরাধ নেবে না।

বিশু তাই করল। তবু একটু সময় কাটল। পূব দিকে আলোর আচড়, পাখ-পাখালির ডাক শোনা গেল গাছের ডালে ডালে। পুকুরে হাঁস চরতে শুরু করেছে।

তামাক দেবার সময় পঞ্চানন গম্ভীর গলায় বলল, কিরে তোর খুড়ো বিছানা ছাড়ল?

ডেকেছি।

বিশু খুব আস্তে আস্তে বলল।

আজ তোর কোন খুড়ির শোবার পালা? পঞ্চানন হুঁকোয় দু একটা টান দিয়ে বক্রোক্তি করল।

কথার ইঙ্গিতটা বোঝার মতন বয়স বিশুর হয়েছে। এমনিই মুখ পঞ্চাননের। কোন আগ ঢাক নেই। মাত্রাজ্ঞান নেই। এমন কি স্থান কাল পাত্রেরও বিচার করে না। যখন যা মুখে আসে, নির্বিচারে তাই বলে।

মাথা নিচু করে বিশু চলে আসছিল, পঞ্চানন আবার ডাকল, কিরে বললি না?

মাথা নিচু করেই বিশু বলল, ঠিক জানি না, বোধ হয় ছোট খুড়ির।

অবশ্য ঠিক না জানার কথা বিশুর নয়। বড় খুড়ি উত্তর দিকের ঘরে শুয়েছে ছেলে পুলে নিয়ে। তাদের মশারীর দড়িটা পর্যন্ত বিশু খাটিয়ে দিয়ে এসেছে। মেজ খুড়ি নেই, বাপের বাড়ী থেকে এখনও ফেরে নি। তার ঘর বন্ধ।

পঞ্চানন খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে উঠল।

তবে তো তোর খুড়োর উঠতে দেরী হবে রে। আমায় কতক্ষণ হা-পিত্যেশ করে বসে থাকতে হবে ঠিক আছে!

বিশু এ কথার কোন উত্তর দিল না। আবার খুড়োর বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। ভিতরে খা আওয়াজ হচ্ছে। দুজনের একজন নিশ্চয় উঠেছে। বিশু দরজায় ঘা দিল টুক টুক করে। বার দুয়েক, তারপরই পাশের জানলাটা খুলে গেল। ছোট খুড়ির মুখ।

কিরে এত ভোরে খট খট করে মরছিস কেন?

মুখে গালাগাল দিলেও ছোট খুড়ি আর দুজনের মতন এমন নির্মম নয়। মাঝে মাঝে দু একটা মিষ্টি কথাও বিশুকে বলে। একদিন ঘাটের ধারে একটা তালশাঁস দিয়েছিল বিশুর হাতে। বলেছিল, নে খেয়ে নে, এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

বিশুও ছোট খুড়ির ফাইফরমাশ খাটে। অন্য খুড়িদের লুকিয়ে তারক মুদীর দোকান থেকে বেগুনী ফুলুরী নিয়ে আসে কাপড় চাপা দিয়ে। পুকুরের পাড়ে গাব গাছের ফোকরে ঠোঙাটা রেখে এসে ছোট খুড়িকে খবর দেয়।

খুব মৃদুগলায় বিশু বলল, পঞ্চু জ্যাঠা এসেছে।

সঙ্গে সঙ্গে ছোট খুড়ি হাত দিয়ে মাথার ঘোমটাটা টেনে দিল। পঞ্চানন যেন সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, এমনি ভাব।

যত আপদ। রাত থাকতে উঠে এসেছে নাকি? কি চায় কি

কি চায় জিজ্ঞাসা করার সাধ্য বিশুর নেই। এত বড় বুকের পাটা নরহরি মুখুজ্জেরও আছে কি না সন্দেহ। ছোট খুড়ি মুখে বিরক্তির ভাব দেখাল বটে কিন্তু নরহরিকে ঠিক ডেকে দিল।

কোনরকমে মুখ হাত ধুয়ে নরহবি প্রায় ছুটতে ছুটতে এল।

বিশু গোয়ালঘর থেকে গরুগুলো বের করে এ পাশের খোঁটায় বাঁধছিল, নরহরি যেতে যেতে জিজ্ঞাসা করল, হ্যাঁরে তামাক দিয়েছিস?

বিশু ঘাড় নাড়ল। বলল, আসতেই দিয়েছি।

নরহরিকে এগিয়ে আসতে দেখে পঞ্চানন উঠে দাঁড়াল, তোমারি জন্ম সার্থক নরহরি। দেখালে বটে।

খেয়াল নেই, কোমরে ব্যথা। পঞ্চানন এসে বসে আছে শুনে নরহরি ছুটতে আরম্ভ করেছিল, খচ করে উঠতেই মুখটা কুঁচকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

কি হ'ল হে?

আর পঞ্চুদা, বল কেন, শরীর একেবা'রে গেছে।

শরীরের আর দোষ কি। এত বেলা অবধি ঘুমোবে, অত্যাচার করবে শরীরের ওপর। শরীর থাকবে কি ক'রে। আর আমায়

দেখ তো, তোমার চেয়ে অন্ততঃ বছর চারেকের বড়ই হব। রাত থাকতে উঠেছি, স্নান পূজো শেষ করে তোমার দরজায় বসে আছি।

কি ব্যাপার বল তো পঞ্চুদা, সত্যি রাত থাকতে এসে বসে আছ?

ব্যাপার গুরুতর। পঞ্চানন সঙ্গে সঙ্গে মুখটা গম্ভীর করে তুলল।

নরহরি আর দাঁড়াতে পারল না। কোমরটা বেশ কন কন করছে। দুপুরের দিকে একটু মালিশ করাতে হবে। অনঙ্গ কবিরাজের ইঙ্গুদী তৈল বোধ হয় বাড়িতেই আছে। চণ্ডীমণ্ডপের পৈঠের উপর নরহরি বসে পড়ল।

পঞ্চানন বসতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ল। চোখ ঘুরিয়ে এদিক ওদিক দেখল।

কি খুঁজছ?

বিশেটা গেল কোথায়?

তামাক চাই বুঝি?

হ্যাঁ, এক ছিলিম সকালে বুদ্ধি করে দিয়ে গিয়েছিল, সেতো খতম। আর একটু দরকার।

বসে বসেই নরহরি চেঁচাল, বিশে, ও বিশে।

ঝাঁটা দিয়ে বিশু গোয়ালঘর পরিষ্কার করছিল, খুড়োর ডাকে ছুটে এল। বালতিটা রেখে এসেছে, কিন্তু ঝাঁটা তখনও হাতে।

দুর্গা, দুর্গা, পঞ্চানন সভয়ে চোখ বুঝল, কোন একটা আক্কেল নেই ছোঁড়াটার। এখনও কিছু মুখে দিই নি, সাত সকালবেলা একেবারে মুখের সামনে সম্মার্জনী নিয়ে দাঁড়াল।

নরহরি খেই ধরল, তোর কি মলে জ্ঞান হবে? ঝাঁটাটা রেখে আসতে পারিস নি হতভাগা? ছি, ছি, তোর জ্বালায় আমার লোকের কাছে মুখ দেখানো দায়।

থতমত খেয়ে বিশু ঝাঁটাশুদ্ধ হাতটা পিছন দিকে করল। কাজ করতে করতে ছুটে এসেছে, অতটা খেয়াল করে নি। আবার দেরী হ'লেও খুড়ো বাপ চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করত।

যা, ঝাঁটা ফেলে দিয়ে দু ছিলিম তামাক সেজে আন।

বিশু আর দাঁড়াল না। ছুটে চলে গেল।

তামাক আসতে দুজনে জুতসই হ'য়ে বসল। পাশাপাশি।

কি ব্যাপার বল পঞ্চুদা ?

এ গাঁয়ে আর বাস করা গেল না নরহরি। আমি ভাবছি গলুই কিংবা শালুকপুরেই চলে যাব।

মনে মনে নরহরি পুলকিত হ'ল। সারা গোবিন্দপুর গাঁ বাঁচবে তা হ'লে। কিন্তু মুখে তো এ আনন্দ প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

মুখে বলল, তুমি চলে গেলে আর এ গাঁয়ের রইল কি ! কিন্তু হ'ল কি ব্যাপারটা ?

পঞ্চানন বার তিনেক টান দিয়ে হুঁকোটা কোণে ঠেস দিয়ে রাখল, এ বয়সে ম্লেচ্ছর সঙ্গে বাস করা আর পোষায় না নরহরি। জাত বিচার মানে না, ঝাঁটা মারো, ঝাঁটা মারো।

নরহরি কিছু উত্তর দিল না। উদ্বেগ প্রকাশ করলেই পঞ্চানন দেরী করবে। রসিয়ে রসিয়ে কথাটা বলবে। তার ধাত নরহরির খুব জানা।

পঞ্চানন নিজের থেকেই বলতে শুরু করল।

একেবারে গাঁয়ের .কোণে বন জঙ্গল। আগে নীলের চাষ হ'ত। এখন চাষ বন্ধ। কি একটা ওষুধ এসেছে বিদেশ থেকে তাতেই নীলের কাজ চলে। নীলের কাজ নেই, কিন্তু নীলকর সায়েবরা আছে। কি করে—আর কি করে চলে ভগবান জানেন। বনে জঙ্গলে শিকার করে বেড়ায়, মাঝে মাঝে পাড়ার মধ্যে ঢুকে পড়ে, হাটে বাজারে ঘোরে।

একতলা বাড়ী। ইঁটের দেয়াল আর খোলার চাল। শুধু দুজন সায়েব থাকে ফেয়ারবার্ণ আর মার্শাল। বুনো শূয়োরের মতন চেহারা, গায়ের গন্ধে ভূত পালায়। মাঝে মাঝে সাহেব দুটো শহরে যায়, দিন সাতেক থাকে, আবার গাঁয়ে ফিরে আসে।

তাদের নিয়েই কাণ্ড। জঙ্গলের ধারেই পুবপাড়া। প্রথমেই ঘোষালদের বাড়ী। আর সব ভাই পশ্চিমে থাকে। এখানে থাকে সেজ কর্তা আর সেজ বৌ। এই সেজ বৌয়ের মামাই ব্রাহ্ম হয়েছে। সেজ বৌয়ের চাল চলনও সুবিধার নয়। মাথায় ঘোমটার বালাই নেই, দাওয়ায় বসে গুণ গুণ করে গান করে, মাঝে মাঝে একলাই গাঁয়ের পথ ধরে বেড়াতে বেরোয়। সেজ কর্তাকে পঞ্চানন সাবধানও করে দিয়েছিল, সেজকর্তা আমল দেয় নি। এতদিন পঞ্চানন বুঝতে পারে নি, এবার ঠিক বুঝতে পেরেছে, খুঁটির জোরেই মেড়া লড়ে।

দিন দুই আগে, পঞ্চানন বাউড়ীপাড়া থেকে ফিরছিল, শ্রীদামের সঙ্গে ঘরের চাল ছাইবার কথা ব'লে, হঠাৎ দেখল ঘোষালদের দাওয়ায় বাউড়ীদের ভিড়।

কি ব্যাপার, পঞ্চানন এগিয়ে গিয়েছিল। ব্যাপাব সাংঘাতিক।

দাওয়ার ওপর সেজ বৌ বসে, তার কোলে মাথা দিয়ে ফেয়ার বার্ণ সায়েব। কাছেই সেজকর্তা বসে আছে। বাউড়ীরা সোরগোল করছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

পঞ্চাননকে দেখেই সবাই পথ ছেড়ে দিল।

কি হ'ল? পঞ্চানন জিজ্ঞাসা করল সেজকর্তাকে।

সেজকর্তা কিছু বলবার আগেই বাউড়ীদের একজন এগিয়ে এল।

সায়েব জঙ্গলে খরগোশ শিকার করে বেড়াচ্ছিলেন, হঠাৎ জারুল গাছে লেগে একটা গুলি ছিটকে এসে তাঁরই কাঁধে লেগেছে। সায়েব সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান। সমস্ত জামাটা রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল।

বাউড়ীরা মেলা দেখে জঙ্গলের পথ দিয়ে আসছিল, দেখতে পেয়ে সায়েবকে তুলে এনেছে।

পঞ্চানন অবাক। তা না হয় এনেছে। রাজার জাত, এভাবে মাটিতে পড়ে থাকবে! তা ব'লে ম্লেচ্ছকে একেবারে কোলের ওপর শুইয়ে সেবা শুশ্রূষা করতে হবে এই বা কেমন কথা। গাঁয়ের সমাজপতিরা কি মারা গেছে? পঞ্চানন বেঁচে থাকতে এসব খৃষ্টানী কাণ্ড হ'তে দেবে না।

পঞ্চানন আরো এগিয়ে গেল। দাওয়া-বরাবর। সেজকর্তার দিকে চেয়ে বলল, এসব কি হ'চ্ছে ঘোষাল মশাই?

ঘোষাল কি একটা ওষুধ সায়েবের কাঁধে লাগাচ্ছিল, পঞ্চাননের কথায় মুখ তুলল। কি বলুন তো পঞ্চাননবাবু?

উত্তর দেবার ধরনে পঞ্চাননের পা থেকে মাথা পর্যন্ত যেন জ্বলে উঠল।

এই সায়েব নিয়ে ঢলাঢলি। পঞ্চানন অনেক চেষ্টা করেও মুখের ভাষা সংযত করতে পারল না।

আশ্চর্য, সেজকর্তা একটু চটল না। ফিক করে হেসে বলল, ঢলাঢলি আর কিসের? চোট খেয়ে সায়েব অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছিল, এরা ধরাধরি করে আমার দাওয়ায় এনে তুলেছে। অনঙ্গ কবিরাজকে ডাকতে পাঠিয়েছিলাম কিন্তু তিনি আসবেন না। আপনারা বোধ হয় বারণ করে দিয়েছেন। ধোপা নাপিত কেউ আসে না, তাতে অবশ্য আমাদের খুব বেশী ক্ষতি হচ্ছে না। নিজেদের কাজ নিজেরাই করে নিচ্ছি। ডাক্তারীটা সামান্য জানি। বছর তিনেক পড়েছিলাম, তারপর আর পড়তে ভাল লাগে নি। যাক, সেটুকু বিদ্যে আজ কাজে লেগে গেল।

পঞ্চানন চুপ করে সব শুনল। সেজকর্তার কথা শেষ হ'তেই বলল, তোমার কথাটা না হয় বুঝলাম বাবাজী, কিন্তু বৌমা, সেও কি ডাক্তারী পাশ নাকি। একেবারে সায়েবকে বুকে জাপটে—

কথা শেষ হবার আগেই সেজবৌ খিল খিল করে হেসে উঠল, বুকে জাপটে ধরিনি চক্রবর্তী কাকা, কোলে মাথাটা রেখেছি।

কিন্তু একটা ম্লেচ্ছকে—

আবার বাধা। সেজবৌ কথা বলল। নিষ্কম্প গলার স্বর। রাগের ছিটে ফোঁটাও নেই।

আহত যে তার আবার জাত বিচার কি চক্রবর্তী কাকা! অসুস্থকে সেবা করার বিধি যে কোন ধর্মেই গ্রাহ্য। আপনার মতন আমার অত পড়াশুনা নেই, কিন্তু হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে যেটুকু জানি, তাতে জাতের জন্য অসহায় মানুষকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দেওয়ার কথা কোথাও লেখা নেই।

পঞ্চানন আর দাঁড়ায় নি। হন হন করে সোজা একেবারে জমিদারের কাছারীতে গিয়ে হাজির হয়েছিল।

প্রতাপ নন্দী মন দিয়ে সব শুনেছিলেন। হঠাৎ কিছু করা মুস্কিল। সায়েবরা সহায় রয়েছে। ব্যাটারা একেবারে গোঁয়ার। জমিদার ব্রাহ্মণ কিছু মানে না। বলা যায় না, বন্দুক তাক করে খতমই করে দিতে পারে। হাতে মারার যখন সুবিধা নেই, তখন ভাতে মারতে হবে। ধোপা নাপিত তো বন্ধ হ'য়েইছে, এবারে হাটে বাজারে সাবধান করে দিতে হবে। কেউ যাতে সেজকর্তাকে একটি পাই পয়সার জিনিসও না বিক্রি করে।

পরের দিনও পঞ্চানন খবর নিয়েছে। নিজে যায় নি, চর পাঠিয়েছিল। সায়েব দাওয়াতেই শুয়ে আছে। সেজকর্তা সেখানেই শোবার বন্দোবস্ত করে দিয়েছে। মার্শাল শহর থেকে ফিরেছে। পালকি করে ফেয়ারবার্ণকে সদরে নিয়ে যাবার বন্দোবস্ত করবে।

অনঙ্গ কবিরাজও এসেছিলেন। না এসে উপায় ছিল না। পঞ্চানন কবিরাজের সঙ্গে দেখাও করেছিল। অনঙ্গ কবিরাজ সব বলেছেন।

না গিয়ে উপায় ছিল না পঞ্চানন। সায়েব ব্যাটা একেবারে বন্দুক উঁচিয়ে এসে হাজির। আমি আলমারীর পিছনে ওষুধ তৈরী করছিলাম, ছেলেটা চেয়ারে বসে পড়ছিল। সায়েব তুবার হাঁক ডাক করতেই ছেলেটা খিড়কীর দরজা দিয়ে একেবারে পানাপুকুরে গলা অবধি জলে।

আমি বেরিয়ে আসতেই সায়েবের কি লম্ফঝম্প। কিড়িমিড়ি করে কি বলে আর বন্দুক দেখায়। সঙ্গে বাউড়ীদের কেষ্টাটা ছিল, সেই বেটাই বোধ হয় পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে। মানুষ চিনিয়ে দিয়েছে।

আমিও তো সেই রকম ভায়া। এমন মলম দিয়েছি, ও ঘা আর জীবনে সারছে না। অনঙ্গ কবিরাজ অনেকক্ষণ ধরে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে হেসেছেন।

পঞ্চানন নরহরির আরো কাছে সরে এল। গলা নিচু করে বলল, কাল রাত্তিরে খবর পেলাম, এক সায়েব পালকি এনে আর এক সায়েবকে তুলে নিয়ে গেছে। অনঙ্গ কবিরাজের মালিশে বোধ হয় সুবিধে হয় নি। নিয়ে গেছে সদর হাসপাতালে।

আমিও এরই অপেক্ষায় ছিলাম। সারা রাত ঘুমোই নি। তুমি তো আমাকে জানো মুখুজ্জে, কোন কাজের দায়িত্ব নিলে, সেটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি সুস্থির হতে পারি না।

নরহরি মুখুজ্জে ঘাড় নাড়ল।

চল, চল, আর দেরী নয়। সকাল সকাল না গেলে জমিদার মশাইয়ের নাগাল পাব না। আজকে ওঁর মহালে বেরিয়ে যাবার কথা।

নরহরি প্রায় আঁতকে উঠল। সর্বনাশ, শরীরের এই অবস্থায় অত মাইল হাঁটতে হবে? তাহলে আর ফিরতে হবে না তাকে। জমিদারের দেউড়ীতেই দেহ রাখতে হবে।

কিন্তু পঞ্চুদা, শরীরের এই অবস্থায় ?

আরে আমি তো রইলাম সঙ্গে। মোটা দেখে একটা বাঁশের লাঠি নাও। বাতের ওষুধই হচ্ছে হাঁটা। যত বসে থাকবে, তত পেয়ে বসবে।

অগত্যা। কাঁচুমাচু মুখ করে নরহরি উঠল। নিস্তার নেই।

বাঁশের লাঠিটা হাতে নিয়ে কি ভেবে নরহরি বিশুকে ডাকল, বিশে।

বিশু খিড়কীর পুকুরে জাবনা দেওয়ার পাত্রটা ধুচ্ছিল, খুড়োর ডাকে এসে দাঁড়াল।

চল আমার সঙ্গে, একটু বেরোব। হাতেব কাজ কি আছে পরাণকে দিয়ে যা।

আজকাল কোথাও যেতে হলেই নবহরি বিশুকে সঙ্গে নেয়। অসুখ বিসুখে একটু যেন কাবু হয়ে পড়েছে। ভয় ঢুকেছে মনে। বিশেষ করে বুকের ব্যথাটার জন্য একটা আতঙ্ক। তবু বিশেটা সঙ্গে থাক। তাগড়া যোয়ান। তেমন কিছু হ'লে ঘাড়ে কবে নিয়ে আসতে পারবে।

পথেই কাশীপতি ন্যায়রত্নের সঙ্গে দেখা। স্নান সেরে ফিরছিলেন সূর্যস্তবে পথঘাট মুখরিত কবে। তুজনকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

কিহে, জগাই মাধাই কোথায় চলেছ তুজনে ?

আপনার কথাই ভাবছিলাম ন্যায়রত্ন মশাই।

কি রকম ? মাথার ভিজে গামছা ন্যায়রত্ন কাঁধে রাখলেন।

ঘোষালদের সেজ বৌয়ের ব্যাপার।

সোজা আঙুলে ঘি ওঠে না পঞ্চানন, আঁঙুল বাঁকা করতে হয়। ঘরের চালা কেটে তাজা কেউটে ছেড়ে দাও, বাপ বাপ করে পালাবে, কিংবা মশালের আগুন ছোঁয়াও চালে, বৈশ্বানরের স্পর্শে সব কলুষ কেটে যাবে। তা নয় তোমার যত সব মামুলী ব্যাপার। ধোপা

বন্ধ করে আর ওদের তুমি কি করবে ? লোক তো মাত্র ছুটি,
বা জামাকাপড়। দরকার হ'লে সেজবাবু দাড়ি রাখবে। বৌয়ের
য গাঁ ছাড়তে চায় তার আর তুমি কি করবে ?

। সত্যি। এতদিন তো কিছু করার উপায় ছিল না। এবার
পেয়েছি।

তদিন কিছু করার উপায় ছিল না কেন ?

ফরিঙ্গিরা ঘিরেছিল যে। চক্রব্যূহ ভেদ করাই মুস্কিল ছিল।

ারপর সবিস্তারে পঞ্চানন ঘটনাটা ন্যায়রত্ন মশাইকে আবার
। সেজবৌয়ের কড়া কথায় আরো রসান দিয়ে।

াশীপতি ন্যায়রত্ন তখনি রাজী। এসব ব্যাপারে বিলম্ব করাই
নয়। এখনি জমিদারের কাছে যাওয়া উচিত। ন্যায় বিচার
লে দেশ রসাতলে যাবে। সমাজের বুকে পা দিয়ে অনাচার
তুলে দাঁড়াবে।

াতাপ নন্দী বাগানেই ছিলেন। সকালে বাদাম পেস্তা দেওয়া
র সরবত শেষ করে গোঁফে তা দিচ্ছিলেন, এমন সময় তিনজন
হাজির।

াশীপতি ন্যায়রত্নকে দেখে প্রতাপ নন্দী সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে
ন।

াসুন ন্যায়রত্ন মশাই, এরা আপনাকে পাকড়াও করে আনল
থেকে ?

থা শেষ করেই প্রতাপ নন্দী হেঁট হ'য়ে ন্যায়রত্নের পায়ের ধুলো
া।

কল্যাণমস্তু। হাতে পৈতে জড়িয়ে ন্যায়রত্ন মশাই আশার্বাণী
ণ করলেন, শরীর গতিক ভাল তো ?

াপনার আশীর্বাদে সব মঙ্গল। চন্দনগড়ের প্রজারা একটু
মাল করছিল, নায়েব মশাইকে পাঠিয়েছিলাম, কাল পত্র

পেয়েছি, সেখানকার অবস্থা খুব শান্ত। দলের সর্দারগুলোকে ঠাণ্ডা ঘরে আটকাতেই সবাই বাপের সুপুত্র হয়ে পথে এসেছে।

পঞ্চানন মুস্কিলে পড়ল। এখন জমিদারী সেরেস্তার কথা শুরু হলেই বিপদ। আস্‌ল কথা আর পাড়াই যাবে না।

তাড়াতাড়ি ফাঁক বুঝে বলে ফেলল, সায়েব ব্যাটা ছুটো সরে গেছে, ঘোষালদের এবার একটা ব্যবস্থা করুন।

প্রতাপ নন্দী হাসলেন। পঞ্চাননের দিকে ফিরে বললেন, তাদের ব্যবস্থা তারা নিজেরাই করে নিয়েছে চক্রবর্তী মশাই।

তিনজনেই চমকে উঠল। তার মানে?

ভোরবেলা গরুর গাড়ি করে সেজবাবু আর সেজগিন্নি এসেছিল। গাঁ ছেড়ে চলে যাচ্ছে তাই দেখা করে গেল। সেজকর্তা চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল, বিশেষ কিছু বলে নি, কিন্তু সেজ গিন্নি বেশ মিষ্টি মিষ্টি কথা শুনিয়ে গেল হে।

শুনিয়ে গেল? আপনাকে?

আমার আওতা থেকেই যখন বেরিয়ে যাচ্ছে, তখন আর আমাকে কিসের ভয়!

কি বলে গেল?

প্রতাপ নন্দী মুচকি হাসলেন। হাসলেন বটে কিন্তু ছুটো চোখ যেন জ্বলে উঠল। শিকার ফসকে যাওয়া বাঘের চোখের মতন।

আমাদের অনেক কষ্ট দিয়েছে, সেজন্য ক্ষমা চাইল। সমাজ-পতিদেব নমস্কারও জানিয়েছে। সকলের সঙ্গে দেখা করতে পারল না, তার জন্য ছুঃখ প্রকাশ করল।

বাগানের বেড়ায় হেলান দিয়ে বিশু বসেছিল। কান ছিল প্রতাপ নন্দীর কথাবার্তার দিকে। আফশোষ হ'ল বিশুর। ছুপুরবেলা সময় করে অনায়াসে ঘুরে আসতে পারত পূবপাড়ায়। নিজের চোখে দেখে আসতে পারত ঘোষালদের সেজ বৌকে। সেজ কর্তাকে সে

বার কয়েক দেখেছে। খুব গম্ভীর, হাটে দাঁড়িয়ে জিনিস্ দর করছিলেন, দূর থেকে তুচোখে অগাধ কৌতূহল নিয়ে বিশু দেখেছে।

সে রাতে জমিদার কাছারীতে ঘোষালদের কথা বিশু শুনেছিল। সেজ বৌয়ের কে মা-মা বুঝি ব্রাহ্ম হয়ে গেছেন, পূজো মানেন না, আচার বিচার মানেন না। সেই জন্য পঞ্চায়েত বসেছিল ঘোষালদের সেজকর্তাকে প্রায়শ্চিত্ত করাবার জন্য। চেয়ে চেয়ে অনেকক্ষণ দেখল বিশু। কোন তফাৎ নেই। আত্মীয় ব্রাহ্ম হ'য়েছে তার কোন পরিচয় বিশু সেজকর্তার শরীরে খুঁজে পেল না। কিন্তু বিশু ভুল করেছে। দেখা উচিত ছিল সেজ বৌকে। জমিদারের মুখের ওপর এমন ভাবে যে কথা বলে যেতে পারে, তাকে শুধু দেখলে বিশুর মন ভরত না, হেঁট হ'য়ে প্রণাম করত বারবার।

এর পাশাপাশি আর একটা কথাও মনে পড়ে গেল। একজন যখন এমন ভাবে বলতে পেরেছে, তখন আর একজনই বা কেন পারবে না।

গাঁয়ের সমাজপতিরা যদি কুমুর ওপর নির্যাতন করে, বিধবা বিবাহের জন্য একঘরে করতে চায় তবে কুমুও প্রতাপ নন্দীর মুখের ওপর ঠিক এমনি উত্তর দিয়েই ভিন গাঁয়ে চলে যাবে।

কিন্তু বিয়ের পব কুমু এ গাঁয়েই বা থাকতে যাবে কেন? নতুন মানুষের সঙ্গে নতুন জায়গায় ঘর বাঁধবে।

নরহরি উঠে দাঁড়াতেই বিশুকে উঠতে হ'ল। পঞ্চানন আর কাশীপতি অন্য দিকে গেলেন, শুধু নরহরি বাড়ীর দিকে ফিরল।

সারাটা পথ নরহরি গজ গজ করল। পঞ্চাননের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার। রোদ বাড়ছে, চলতে আরো কষ্ট হচ্ছে। চলাফেরায় ব্যথাটাও আরো যেন বেড়েছে।

অত খেয়াল ছিল না বিশুর। একটু এগিয়ে গিয়েছিল, নরহরির ধমকে থমকে দাঁড়াল।

হন হন করে কোথায় চলেছিস রে হতচ্ছাড়া। আমার ঘাড়ে বসে গিলে গতরে খুব জোর হয়েছে। লম্বা লম্বা ঠ্যাং ফেলে হাঁটছিস। আয় এখানে।

ভয়ে ভয়ে বিশু নরহরির কাছে এসে দাঁড়াল। একেবারে পাশে।

নরহরি একটা হাত বিশুর কাঁধে রাখল। ভর দিলে তবু চলতে খানিকটা সুবিধা।

বাড়ী পৌঁছেই নরহরি সোজা বিছানায় ঢুকল। কোমরের ব্যথা খুব বেশী। নড়াচড়া করাই দায়।

বিশুর বিশ্রাম নেই। একটু জিরোতে পাবার আগেই বড় খুড়ি ডেকে পাঠাল। অনঙ্গ কবিরাজকে সঙ্গে করে আনতে হবে।

ভিজে গামছা দিয়ে কপাল আর মুখ মুছে নিয়ে বিশু রওনা হ'ল। ভালই হ'ল, অনঙ্গ কবিরাজের কাছে যাওয়ার পথে একবার চাঁপাতলা হয়ে যাবে। কুমু কিংবা তার বাপের সঙ্গে যদি চোখাচোখি হ'য়ে যায়।

যাবার মুখে কি ভাগ্য একটু দয়া হ'ল বড় খুড়ির। বোধ হয় যাতে বিশু তাড়াতাড়ি অনঙ্গ কবিরাজকে ডেকে আনে, সেইজন্য কোঁচড়ে মুড়ি ঢেলে দিল। খেতে খেতে বিশু যেতে পারবে।

চাঁপাগাছতলায় এসে বিশু যখন দাঁড়াল, তখন কোঁচড়ের মুড়ি শেষ। কেউ কোথাও নেই। একবার ভাবল একটু এদিক ওদিক করে সোজা কুমুদের বাড়ীতেই গিয়ে উঠবে, কিন্তু দেরী করতে সাহস হ'ল না। কি জানি যদি দেরী দেখে খুড়িরা পরাণকে খোঁজ করতে পাঠায়।

তবু বিশু একটু অপেক্ষা করল। স্নান সেরে কুমুর বাবা যদি এই পথ দিয়েই ফেরেন কিংবা রাধাগোবিন্দজীর মন্দির থেকে কুমু আসে। কুমুর সঙ্গে বেশী কোন কথা নয়, শুধু একটু দেখবে। একবার ঘোষালদের সেজবৌয়ের কথাটা তাকে শোনাবে আর কুমুর বাপকে বলবে

বিদ্যাসাগরের কথা। বিধান যখন রয়েছে, তখন এমন ভাবে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকার কোন মানে হয়!

না, কারুর দেখা নেই। বিশু আবার চলতে শুরু করল।

অনঙ্গ কবিরাজ নেই। ভোরবেলা ভিনগাঁয়ে রোগী দেখতে গেছেন। কখন ফিরবেন কিছু জানা নেই। তবে মনে হয় এইবার ফেরার সময় হয়েছে।

খবর দিল অনঙ্গ কবিরাজের ছেলে। দিনরাত পড়ে। যখনই বিশু কবিরাজের কাছে এসেছে, দেখেছে ছেলেটা বই নিয়ে বসে। হয় বাইরের দাওয়ায়, নয়তো ভিতরে তক্তপোশে। অথচ অনঙ্গ কবিরাজ নরহরির কাছে দুঃখ করেছেন, ছেলেটার মাথায় গোবর। কিছু মনে থাকে না। পণ্ডিত মশাইয়ের টোলে পাঠিয়ে কোন উন্নতি হ'চ্ছে না।

বিশু দাওয়ার এক কোণে বসল। অনঙ্গ কবিরাজের ছেলে তখন দেয়ালে হেলান দিয়ে নামতা মুখস্থ করছে।

অনঙ্গ কবিরাজের দুঃখের অন্ত নেই। ছেলেটার অক্ষর পরিচয়টা একটু হ'লেই, নাড়িজ্ঞানটা তিনি শিখিয়ে দেবেন। বাপের বিরাট পসার। তাঁর সঙ্গে থাকলেও ছেলেটার একটা সুরাহা হয়ে যাবে। মুখে মুখে সাধারণ কতকগুলো ওষুধের নাম আর সেবন বিধি অনঙ্গ কবিরাজ ছেলেকে শিখিয়েছিলেন, কিন্তু সুবিধা হয় নি।

অনঙ্গ কবিরাজ বাড়ী ছিলেন না, গুটি কয়েক রোগী এসে হাজির। তাদের দুজনকে ছেলে এমন বড়ি দিয়েছিল, সে টাল সামলাতে তিন দিন অনঙ্গ কবিরাজের প্রাণান্ত।

পড়তে পড়তেই অনঙ্গ কবিরাজের ছেলে বিশুর দিকে ফিরে চাইল, কিরে তুই লেখাপড়া করিস?

বিশু ঘাড় নাড়ল, একটু একটু।

একটু একটু করলে হবে না, ভাল করে পড়। পেটে বিদ্যে না থাকলে মানুষ আর জন্তু জানোয়ারে তফাতটা কোথায় ?

তাতো নিশ্চয়।

এই দেখ না, আমি দিনরাত পড়ি। আর পড়ি বলেই কত নতুন কথা জানতে পারি। হঠাৎ থেমে বইটা মুড়ে পাশে রেখে বিশুকে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা বল্‌তো, শর্বরী মানে কি ?

শর্বরী ! বিশু ভাববার চেষ্টা করল, এরকম কথা কোথাও শুনেছে বলে মনে পড়ল না। কিন্তু অনঙ্গ কবিরাজের ছেলে চেয়ে রয়েছে তার দিকে। উত্তর একটা দিতেই হবে।

আমতা আমতা করে বিশু বলল, কারো নাম-টাম বোধ হয়।

অনঙ্গ কবিরাজের ছেলে হেসে উঠল, দূর মূর্খ। শর্বরী ভূষনং চন্দ্র। শর্বরী মানে আকাশ।

হঠাৎ কথাটা বিশুর মনে পড়ল। বিদ্যাসাগরের নাম শুনেছে অনঙ্গ কবিরাজের ছেলে ?

বিদ্যাসাগর ? হ্যা, শুনেছে বই কি। খুব পণ্ডিত লোক, গরীবের মা বাপ। তবে পণ্ডিত লোক হ'লে যা দোষ হয়। আচার বিচার মানেন না, কিন্তু মার ওপর খুব ভক্তি।

মার ওপর ?

হ্যা, একবার বর্ষার দামোদর পার হ'য়ে মাকে দেখতে গিয়েছিলেন। দারুণ ঝড় আর বৃষ্টি। ঘাটে ফেরি নেই। বিদ্যাসাগর ঝাঁপিয়ে পড়লেন জলে। সাঁতরে ওপারে গেলেন।

বিশু অবাক। এত সাহস বিদ্যাসাগরের ? ঝড় জল কিছু মানেন না। বর্ষার দামোদরকেও নয়। সাহস আছে বই কি। সাহস না থাকলে এতদিনের প্রচলিত বিধি পাল্টে দিতে পারেন।

হঠাৎ বিশু থেমে গেল। হুম হুম করে একটা আওয়াজ আসছে পথের বাঁক থেকে। কাদের পালকি আসছে।

একটু কাছে এগোতেই চেনা গেল। মেজ খুড়ি ফিরছে বাপের বাড়ী থেকে। বেহারাদের সামনে আড়াআড়িভাবে বুকে চাদর বাঁধা একটা লোক জোরপায়ে চলেছে। গোকুল নায়েব। মেজ খুড়ির বাপ জমিদার নয় কিন্তু অঢেল জমি তাঁর তাঁবে। কিছু কিছু প্রজাও আছে। কাজেই গোকুল নায়েবই সম্পত্তি দেখাশোনা, তদ্বির তদারক করে।

বিশু ছুটে পথের ওপর গিয়ে দাঁড়াল।

কিরে বিশে? এখানে? গোকুব নায়েব দাঁড়িয়ে পড়ল।

কর্তার অসুখ। কবরেজ মশাইয়ের কাছে এসেছি।

বিশুর গলা শুনে মেজ খুড়ি পালকির দরজা ফাঁক করে হাত নেড়ে বিশুকে ডাকল।

কি হয়েছে রে কর্তার? খুব বেশী অসুখ?

মানে, ইয়ে, বাতের ব্যথাটা হঠাৎ বেড়েছে। আজ সকালে পঞ্চু জ্যাঠার সঙ্গে অনেকটা পথ হাঁটতে হয়েছিল, ফিরে এসে বিছানা নিয়েছেন।

মেজ খুড়ি আশ্বস্ত হ'ল। বাতের ব্যথা হ'লে মারাত্মক এমন কিছু নয়। একাদশী, পূর্ণিমায় এমনিতেই বাড়ে। কিছুদিন ভোগাবে, এই যা।

তুই ফিরবি এখন?

না, কবরেজ মশাইকে নিয়ে যাব। তিনি বাইরে বেরিয়েছেন।

পালকির দরজা বন্ধ হয়ে গেল। বেহারারা চলতে শুরু করল। বিশু আবার ফিরে এল কবিরাজ মশাইয়ের উঠানে।

অনঙ্গ কবিরাজ এলেন অনেকক্ষণ পরে। ঘোড়ার মুখে ফেনা। কবিরাজের সারা দেহ ঘামে জবজবে।

বিশুকে দেখেই বললেন, কিরে কি খবর?

খবর বিশু বলল।

তোর খুড়োর যেমন কাণ্ড। ওই ব্যথা নিয়ে অতটা পথ হাঁটে মানুষে ?

কি করবে ? পঞ্চু জ্যাঠা নিয়ে গেল টেনে।

হুঁ, অনঙ্গ কবিরাজ জামা খুলতে খুলতে বললেন, বোস তাহ'লে একটু। খাওয়া-দাওয়া সেরে নিই। আর যদি আমায় না যেতে হয় তো বল, একটা ওষুধ দিয়ে দিচ্ছি।

না, না, বিশু ঘাড় নাড়ল, আপনি চলুন।

বেশ।

অনঙ্গ কবিরাজের ছেলে তখনও দাওয়ায় বসে। বই হাতে।

বাপকে জিজ্ঞাসা করল, হারু বোসকে কেমন দেখলে বাবা ?

ততক্ষণে গামছা পরে অনঙ্গ কবিরাজ দাওয়ায় বসে তেল চাপড়াতে শুরু করেছিলেন, ছেলের কথার উত্তরে বললেন, আমাকে আর দেখতে হ'ল না। পাঁচ ছেলেই তাকে দেখতে শুরু করেছে।

পাঁচ ছেলে দেখতে শুরু করেছে ?

হ্যা, খবর পেয়ে, শহর থেকে পাঁচ ছেলে এসে হাজির হয়েছে। তাদের ধারণা বাপ চোখ বুজলেই কাঁচা টাকা আর বিষয় সম্পত্তি তো আর কম পাবে না। তাই কে কত বেশী সেবা করবে তার জন্য হুটোপাটি। ফলে বাপটা যাও বা দু একদিন বাঁচত, তা আর হল না। আমি যাবার আগেই খাবি খেতে শুরু করেছিল, ওষুধ ছোঁয়াতেই চোখ ওল্টাল।

ব্যাধিটা কি ? অনঙ্গ কবিরাজের ছেলের গলা খুব গম্ভীর। নামতা মুখস্থ করা, টোলে ফেল হওয়া ছেলে আর নয়, বাপের সুযোগ্য সহকারী। ভবিষ্যত উত্তরাধিকারী বাপের শাস্ত্রের, মুখ চোখের তেমনি ভাব।

কাল ব্যাধি বাবা আর কি। বয়স নব্বইয়ের কোঠায়। সারা-জীবন তেজারতী কারবার করে টাকা যেমন জমিয়েছে, পাপও তেমনি

কম জমায় নি। ছেলেরা তো জানে না, জানতে পারলে কপাল চাপড়াতে শুরু করবে। মাস তিনেক আগে হারু বোস উইল করেছে। আমিও একজন সাক্ষী। টাকাকড়ি অস্থাবর বিষয়-সম্পত্তি সমস্ত দিয়ে গেছে তার রক্ষিতাকে। শ্রীমতী পদ্মনয়নী দেবী। বামুনের মেয়ে। বছর কুড়ির ওপর সঙ্গে রয়েছে।

সর্বনাশ!

সর্বনাশের এইবার শুরু। স্ত্রীলোক শুধু স্বত্বভোগ করতে পারবে, কাজেই পদ্মনয়নী চোখ বুজলে আবার লাঠালাঠি আরম্ভ হবে। কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। স্ত্রীলোকটি তো দেখলাম মড়ার পায়ের ওপর পড়ে হাপুসনয়নে কাঁদছে। উইলের কথা সে সবই জানে। কাঁদছে আর বলছে, তুমি কি সর্বনাশের বীজ পুঁতে গেলে গো। আমার হেনস্থার যে অবধি থাকবে না। সত্যিই, ছলে, বলে, কৌশলে স্ত্রীলোকটিকে ছেলেরা পথে বসাবে। লোকের বাড়ী মুড়ি ভেজে আর ধান ভেনে তার বাকি জীবনটা কাটাতে হবে।

শুধু স্নান খাওয়া নয়, অনঙ্গ কবিবাজ বোধ হয় একটু ঘুমিয়েও নিলেন। তিনি বাইরে এসে দেখলেন বিশু জাম গাছেব গুঁড়িতে হেলান দিয়ে অকাতরে ঘুমাচ্ছে।

ডাক দিতেই বিশু ধড়মড় করে উঠে বসল।

ঘোড়াব ওপর অনঙ্গ কবিরাজ। পিছনে পিছনে বিশু।

একটু এগোতেই অনঙ্গ কবিরাজের ছেলে চেঁচামেচি শুরু করল। বিশুর নাম ধরে।

কি ব্যাপার? বিশু ঘুরে দাঁড়াল।

এই নে। অনঙ্গ কবিরাজের ছেলে একটা শালপাতার ঠোঙা বিশুর হাতে দিল।

বিশু অবাক। একি? কিসের ঠোঙা?

মা দিয়েছে। বোধ হয় বড়া-টড়া আছে। দেখ।

অনঙ্গ কবিরাজের ছেলে আর দাঁড়াল না। তার পড়ার ক্ষতি হবে।

বিশুর দুটো চোখ ছলছলিয়ে এল। বাড়ীর লোক ওকে দুচক্ষে দেখতে পারে না। খেল কি না খেল তার খোঁজও করে না। সেই জন্য বাইরের অনাত্মীয় লোক দরদ দেখালে, সহানুভূতি জানালে বিশুর বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে।

অনঙ্গ কবিরাজের বৌ বোধ হয় লক্ষ্য করেছে অতক্ষণ ধরে বিশু বসেছিল। মায়ের জাত। বিশুর মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছিল সে অভুক্ত। তাই ঠোঙায় করে বড়া পাঠিয়ে দিয়েছে।

কাপড়ের খুঁট দিয়ে বিশু চোখের জল মুছে নিল। সত্যিই খিদে পেয়েছিল। সকালে এক মুঠো মুড়ি ছাড়া আর কিছু জোটে নি।

ঠিক চাঁপাগাছতলার কাছ বরাবর। বিশু একটু পিছিয়ে পড়েছিল। একেবারে মুখোমুখি দেখা কুমুর বাপের সঙ্গে।

কিহে ভরদুপুর বেলা কোথা থেকে ?

হাতের ঠোঙাটা বিশু পিছন দিকে সরাল। একটা আঙুল দিয়ে সামনের দিকে দেখিয়ে বলল, কর্তাব অসুখ, কবরেজ মশাইকে নিয়ে চলেছি।

অসুখ ? কি হয়েছে ?

বাতের ব্যথা। মাঝে মাঝে বাড়ে।

ও, কুমুর বাবা চলতে চলতে বললেন, কর্তা সারলে এস একদিন। কুমু তোমাব কথা জিজ্ঞাসা করছিল।

সমস্ত দেহটা বিশুর থরথরিয়ে কেঁপে উঠল। কুমু জিজ্ঞাসা করছিল ওর কথা ! সারাদিন বিশু যেমন কুমুর কথা ভাবে, কুমুও কি মনে করে তার কথা। কিন্তু বিশু ভাবে কুমুর ভবিষ্যতের কথা, সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের কথা, কিসে নতুন জীবনে কুমু সুখী হবে, বেদনার

জীবন থেকে মুক্তি পাবে, সেই কথা। আর কুমু কি ভাবে বিশুর সম্বন্ধে! এই গ্লানিময় জীবন থেকে কি করে অব্যাহতি পাবে বিশু, চরম দাসত্ব থেকে পরিত্রাণ!

বিশু পুরুষমানুষ। কিন্তু তার সমস্ত পৌরুষ অপচিত হবে গোয়াল ঘর পরিষ্কার আর উঠান ঝাঁট দেওয়াতেই? এর উর্ধ্বে বুঝি সে কোন দিনই উঠতে পারবে না!

বিশুর আক্ষেপের অন্ত নেই। চুপি চুপি যদি সে শহরে চলে যেতে পারে। শুধু কুমুর জন্যই নয়, নিজের জন্যও যদি দাঁড়ায় বিদ্যাসাগরের সামনে গিয়ে। বলে, আপনি তো গরীবের মা বাপ। আমার দিকে কৃপাদৃষ্টি দিন। মা নেই, বাপ নেই, পৃথিবীতে আঁকড়ে ধরবার মতন কেউ নেই আমার। লেখাপড়া শেখার আমার খুব ইচ্ছা। অনেক বাধা, অনেক অসুবিধা, তবু আমি পাঠশালার সামনে বসে বসে পড়া শুনে শুনে পড়তে শিখেছি। রাত্রে চাঁদের আলোয় বই রেখে পড়া অভ্যাস করেছি। কিন্তু কে আমায় বই কিনে দেবে। নতুন বইয়ের পড়া বলে দেবে। সময় দেবে পড়াশোনা করবার। সংসারের ঘানিতে আমাকে জুতে দিয়েছে। একদণ্ড সময় আমার নেই। আপনি আমার ভার নিন। আমায় মানুষ করে তুলুন।

কিরে দাঁড়ালি কেন? অনঙ্গ কবিরাজ তাড়া দিলেন।

বিশু ছুটে ঘোড়ার পাশে এসে দাঁড়াল।

নীলাম্বর ভটচাযের সঙ্গে আলাপ হ'ল কি করে?

নীলাম্বর ভটচায? বিশু অবাক।

ওই যার সঙ্গে কথা বলছিলি।

কুমুর বাপের নাম নীলাম্বর ভটচায! তাতো বিশু জানে না। জানবার অবকাশও হয় নি।

পাঠশালায় ছেলেদের নিয়ে আসি, নিয়ে যাই, সেই সময় ওঁর সঙ্গে

আলাপ হয়েছে। এখানে রাধাগোবিন্দজীর মন্দির আছে উনি তার পূজারী।

জানি, জানি। ওকে আমি খুব চিনি। শুধু মন্দিরের পূজারী নয়, খুব পণ্ডিত লোক। অগাধ পড়াশোনা। এ গাঁয়ের লোক নয়, বাইরে থেকে এসেছে।

বিশু উৎকর্ণ হ'য়ে রইল। কুমুর কথা যদি কিছু বলেন অনঙ্গ কবিরাজ। কুমুর দুঃখের কথা, তার দুঃখ ঘোচাবার কোন ইঙ্গিত।

অনঙ্গ কবিরাজ সেদিক দিয়েও গেলেন না। বললেন, নীলাম্বর ভটচাযের কথকতা শুনেছিলাম জমিদার প্রতাপ নন্দীর বাড়ীতে। মানভঞ্জন পালা। কি পাণ্ডিত্য, কি সুললিত কণ্ঠ, কি চমৎকার বলার ভঙ্গী।

আবেগে অনঙ্গ কবিরাজ চোখ দুটো বুজিয়ে ফেললেন।

তবে খুব জেদী পুরুষ। প্রতাপ নন্দী অনুরোধ করেছিলেন ওঁর মন্দিরের সেবায়েত হবার জন্য। থাকবার রাজকীয় ব্যবস্থা করে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু নীলাম্বর ভটচায রাজী হয় নি। হাতযোড় করে বলেছে, তা সম্ভব নয়। রাধাগোবিন্দজীর মন্দিরের কাজ নিয়ে এ গাঁয়ে এসেছে, অন্য কোথাও কাজ করা তার পক্ষে উচিত হবে না।

অবশ্য পরে অন্য লোকের কাছে শুনেছি, নীলাম্বর ভটচায নাকি বলেছে, এটা তো শ্যামসুন্দরের মন্দির নয়, রামজয় নন্দীর দম্ভ। বিগ্রহকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছে প্রতাপ নন্দীর আভিজাত্য আর মিথ্যা মর্যাদাবোধ। সুখে থাকার লোভ দেখিয়ে যারা পূজারী নিয়োগ করতে চায়, তারা মন্দিরের সেবা করার লোক চায় না, নিজেদের দলবৃদ্ধি করার মানুষ খোঁজে।

এত কথা বিশু বুঝতে পারল না, তবে এটুকু বুঝল টাকার মোহ, সুখের মোহ ছেড়ে রাধাগোবিন্দজীর মন্দিরের পূজার ভার কুমুর বাবা বেছে নিয়েছেন। সম্পদ ছেড়ে দারিদ্র বরণ।

এতবার কুমুর বাপের সঙ্গে বিশুর দেখা হয়েছে, অথচ এসব কথা তিনি বিশুকে একবারও বলেন নি। অবশ্য এসব কথা বিশুকে কেনই বা তিনি বলবেন। কিন্তু বিশুকে তিনি সেরকম মনে করেন না। তেমন ভাবলে তাকে সামনে নিয়ে খেতে বসতেন না সেদিন। সুখ দুঃখের অত কথা বলতেন না।

অনঙ্গ কবিরাজ আর কিছু বললেন না। বিশু চলতে চলতে মুখ ফিরিয়ে দেখল অনঙ্গ কবিরাজের দু চোখ নিমীলিত। বোধ হয় দিবা নিদ্রার জের চলেছে। ঢিমে তালে ঘোড়া চলতে শুরু করল।

নরহরি মুখুজ্জের অবস্থা অনেকটা ভাল। অনঙ্গ কবিরাজের ওষুধে আর মালিশে দিন পাঁচকের মধ্যেই খাড়া হয়ে উঠল। ওষুধ মালিশ ছাড়াও বড় বৌ টোটকার শরণ নিয়েছিল। আকন্দ পাতা গরম করে কোমরে দেওয়া। অদ্ভুত কাজ করল। শুধু নরহরি উঠেই দাঁড়াল না। হাঁক ডাক আগের চেয়ে অনেক জোর।

বিশুর কাজ বাড়ল। ম্যালেরিয়ায় পরাণ বিছানা নিল। একদিন সকালে মাঠে গরু নিয়ে গিয়ে অবস্থা কাহিল। কোঁ কোঁ করে জ্বর। সমস্ত শরীর ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল। মাঠের ওপর নিঃঝুম হয়ে পড়ল।

পথচলতি পাড়ার একজন নরহরির বাড়ীতে খবর দিয়ে গেল।

বাড়ীতে আর লোক নেই, বিশুকে ছুটতে হ'ল।

অন্য রাখালদের সাহায্যে পরাণকে মাঠ থেকে উঠিয়ে বাড়ী আনা গেল, কিন্তু গরুগুলো তাড়িয়ে গোয়ালে আনতে বিশুর প্রাণান্ত।

দুটো নতুন গরু। সারাটা মাঠ বিশুকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াল। বহু কষ্টে গরুগুলো জুটিয়ে যখন বাড়ী ফিরল বিশু, তখন দরজায় গরুর গাড়ী এসে দাঁড়িয়েছে। খবর পেয়ে পরাণের পিসিও এসে হাজির।

পরাণ ঠিক তেমনি ভাবে পড়ে আছে। গায়ে হাত রাখা যায় না, এমনি উত্তাপ। মাথায় বোধ হয় জল ঢালা হয়েছিল, মাথার চুলগুলো তখনও ভিজে।

পিসি বাড়ীতে পা দিয়েই তারস্বরে চিৎকার করতে আরম্ভ করেছে। একেবারে মড়া কান্না।

ওরে আমার কি সর্বনাশ হ'ল রে। আব আমায় কে দেখাশোনা করবে রে। আমি যে পাঁচ বছরেরটি থেকে ওকে বুকে করে মানুষ করেছি রে।

কান্না আর বুক চাপড়ানি।

আওয়াজে পড়শীরা সার দিয়ে এসে দাঁড়াল। কি ব্যাপার। মুখুজ্জে বাড়ীতে কিসের বিপদ হ'ল।

নরহরি ধমক দিয়ে উঠল।

বলি হয়েছে কি? এমন মড়াকান্না কাঁদতে আবম্ভ কবেছ বাড়ীতে? আমাদের কল্যাণ অকল্যাণ নেই। ম্যালেবিয়া জ্বব। বাড়ী নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করাও, সেরে যাবে।

চিকিৎসা করানোর কথায় পিসি আবার ডুকরে কেঁদে উঠল।

আমি কোথায় কি পাবো বাবা যে চিকিৎসা কবাব। মাঠে ঘাটে শাক তুলে হাটে বাজারে বিক্রী করি। ওই পরাণের দেড়টা টাকা সম্বল। আমি কি কবে ওর জন্য পাঁচন কিনব।

নরহরি মুখুজ্জে চট করে কড়ি ছাড়ে না। দুর্জনে বলে জলও নাকি গলে না হাত দিয়ে। কিন্তু শুধু আপদ বিদেয় করার আশায় চকচকে একটা সিকি তুলে দিল পিসির হাতে।

গরুর গাড়ী চলে যেতেই নরহরি মুখুজ্জের আস্ফালন শুরু হল।

যত রোগীর আড্ডা হয়েছে বাড়ীতে। কাজের সঙ্গে সম্পর্ক নেই, কেবল রাজকীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা কর। ঝাড়ু মারো এমন লোকেদের মুখে। যত সব নবাবজাদার আমদানী হয়েছে।

হঠাৎ নরহরির নজর পড়ল বিশুর দিকে।

বিশু রাস্তার ওপর দাঁড়িয়েছিল, গরুর গাড়ীর দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিল। অমন জোয়ান মদ্দ ছেলেটা, কোথা দিয়ে কি হ'ল। হুমড়ি খেয়ে পড়ল মাঠের মাঝখানে। এতক্ষণের মধ্যেও একবার চোখ খুলল না।

নরহরি মুখুজ্জে বলছে ম্যালেরিয়া, কিন্তু পিসি তা মানতে রাজী নয়। ম্যালোয়ারী পরাণের সাত জন্মে ছিল না। এ ম্যালোয়ারী নয়, অন্য কিছু। বাতাস টাতাস লেগেছে। বট অশত্থ গাছেই তাঁদের বাস। সোমত্ত বয়সের ছেলে মেয়েদের ওপরই তাঁদের কোপ বেশী। পরাণ বোধ হয় আর চোখ মেলে চাইবে না। ওষুধ পত্তরে কিছু হবে না, ঝাড়ফুঁকের দরকার।

আবাগের বেটা কাজ ফেলে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস যে?

বিশু তাড়াতাড়ি রাস্তা থেকে সরে এসে গোয়াল-ঘরে ঢুকল।

নরহরি মুখুজ্জের গালাগাল থামল না। একটা পুরো সিকির শোক বড় কম নয়। সব রাগটা গিয়ে পড়ল বিশুর ওপর।

কাজ করতে করতেই বিশু নরহরির তর্জন শুনতে পেল।

খড়ম পেটা করে সব নচ্ছারদের বিদেয় করতে হয়। ভাত গেলবার গোঁসাই আর কাজের বেলা অষ্টরম্ভা। ফতুর করে দিলে একেবারে। যত সব হাড় হাবাতে লক্ষ্মীছাড়াদের মরণ হয়েছে এই চুলোয়।

গালাগাল কতক্ষণ চলত তার ঠিক নেই কিন্তু বড় খুড়ি এসে সামনে দাঁড়াল।

কি হচ্ছে কি, এই সেদিন অত বড় অসুখ থেকে উঠলে। এত চেঁচামেচি করলে বুকের ব্যথাটা বাড়বে যে। এদের সঙ্গে চেঁচামেচি করে কোন লাভ আছে। যতই কর, তোমার দিকে এরা ফিরেও চাইবে না। যত নেমকহারামের দল।

কি বুঝল নরহরি মুখুজ্জে কে জানে। গালাগাল থামিয়ে আস্তে আস্তে দাওয়ায় গিয়ে বসল। বড় খুড়ি হাত পাখা নিয়ে হাওয়া করতে শুরু কবল।

বিশু গোয়াল ঘবের খুঁটিতে হেলান দিয়ে চুপচাপ বসে বইল।

কেমন একটা ভয় এসে গেছে বিশুব মনে। কিছু বলা যায় না, ঠিক এমনি ভাবে বিশুও যদি একদিন মুখ থুবড়ে পড়ে কোথাও। মানুষের শরীব গতিকেব কথা কিছু বলা যায়। পবাণেব তবু পিসি ছিল, ডুকবে কেঁদে পাড়া মাত কবেছে, কিন্তু বিশুব জন্য কেউ এক ফোঁটা চোখেব জলও খবচ কববে না।

নবহবি মুখুজ্জে তো নযই। কথায কথায ভাত আব কাকেব উপমা দেয়। নতুন কোন কাকেব সন্ধান কববে। তিন খুডিও তাই। বড় আর মেজ তো কোন দিন মিষ্টি সুবে কথাও বলে নি। ধমক আব গালাগাল। ওবই মধ্যে ছোট খুডি তবু একটু দয়ামাযা দেখানোব ছল কবে। তাও ওই শুধু ছল। নিজেব স্বার্থেব খাতিবে।

খাবাব নিয়ে আসতে হয লুকিযে-চুবিযে। কিংবা তাঁতিব বাডী থেকে মনোমত কোন পাডেব শাডী। কাজ কামাই কবে বিশু কবে দেয, তাই ছোট খুড়ি অন্য দু জায়েব মতন অত কঠিন হতে পাবে নি, অতটা নির্মম।

হাতেব কাজ সেবে বিশু মুখুজ্জেকে তামাক সেজে দিল।

মুখুজ্জে নিচু হযে হিসাবপত্রেব খাতা দেখছিল। মোটা মোটা জাব্দা খাতা। বিশু শুনেছিল কি একটা কাববাব কবে নবহবি, চাষ-বাস ছাড়াও অন্য কিছু। বাড়ীতে লোকের আনাগোনা আর কথাবার্তাব টুকবো শুনে বিশু কতকটা আন্দাজ করেছিল। কিসেব ব্যবসা তা সে কিছুই জানে না।

দিন সাতেক পরাণ ফিবল না। নবহবি মুখুজ্জের তাগিদে বিশু

একদিন গিয়েছিল। পরাণের জ্বর নেই। শরীর খুব কাহিল। ঝাড় ফুঁক চলছে। দরজা বন্ধ করে বৈকুণ্ঠ ওঝা মন্ত্র পড়ছে। কবে সম্পূর্ণ সারবে, ভগবান জানেন। সারলেও মাঠে মাঠে কাজ করতে তার পিসি আর পাঠাবে না। যদি তাতে না খেয়ে মরতে হয়, তাও স্বীকার।

বিশুর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। পরাণের জায়গায় অন্য লোক রাখবে, নরহরি মুখুজ্জে এমন বান্দাই নয়। তার মানে সব কাজ চাপবে বিশুর ঘাড়ে। মাঠের, বাইরের, ঘরের সমস্ত কাজ।

সেদিন শরীরটা খারাপ ছিল বিশুর। জ্বর জ্বারি নয়, দেহটা কেমন ম্যাজ ম্যাজ করছিল।

হাতের কাজ সকালের দিকে সেরে রেখেছিল, বাকি কাজ ফিরে এসে দুপুরের দিকে করবে।

নরহরি মুখুজ্জে সদরে। পাঁচটা মামলার মধ্যে দুটোয় হার হয়েছে। অনেক টাকার ধাক্কা। সারাক্ষণ দাওয়ায় বসে নরহরি উকিলের শ্রাদ্ধ করল। ঠিক করল, আর নয়, এবার উকিল বদলাতে হবে। সদরে ছোকরা উকিল অম্বুজ হাজরার ইদানীং খুব নাম। বয়স কম হলে হবে কি, কথাবার্তায় ভারি তুখোড়। চমৎকার সওয়াল জবাব করে।

বোধ হয় উকিল ঠিক করতেই নরহরি সকাল সকাল বেরিয়েছে। বলে গেছে ফিরতে সন্ধ্যা উৎরে যাবে।

উড়ুনিটা গায়ে জড়িয়ে বিশু বেরিয়ে পড়ল।

চাঁপাগাছতলায় কেউ নেই। বিশু আরো এগিয়ে মন্দিরের চাতালে গিয়ে উঠল।

কিছুটা এগিয়েই থমকে দাঁড়াল। মিষ্ট গলার স্বর ভেসে আসছে মন্দিরের ভিতর থেকে।

কুমুর বাবা গাইছেন। মাঝে মাঝে কুমুর গলাও শোনা যাচ্ছে। ঠাকুরের নাম-গান। রাধাকৃষ্ণের মিলন-বিরহ কথা।

আস্তে আস্তে বিশু এগিয়ে গেল। উঁকি দিয়ে দেখল দরজার কাছ থেকে। বাপ আব মেয়ে পা মুড়ে বসেছে বিগ্রহের সামনে।

ছায়া পড়তেই কুমুর বাবা ফিরে চাইলেন।

কে, কে ওখানে?

আমি।

কেও, বিশু? বাইরে কেন বাবা, এস, এস, ভিতরে এস।

আজ্ঞে আমার ময়লা কাপড়, আজ স্নানও করি নি।

সত্যি কথা, অন্য দিন ভোর থাকতে বিশু স্নান সেরে নেয়। সেদিন শরীর খারাপ বলে পুকুরের ধারে কাছে যায় নি। বাসি কাপড়ে রয়েছে।

কুমুর বাবা উঠে দাঁড়ালেন। এগিয়ে এসে বিশুব একটা হাত জড়িয়ে ধরলেন, ময়লা বুঝি কেবল বাইবের কাপড়-চোপড়েই হয মানুষে? যার ভিতর ময়লা, মন্দিরে সে ঢুকতে ভয় পাবে। এস, এস।

এর পরে আর আপত্তি চলল না। বিশু মন্দিবেব ভিতবে এসে বসল। কুমুর বাপের পাশাপাশি।

আবার নাম-গান শুরু হল। কুমুব বাবা গাইতে লাগলেন। মাঝে মাঝে কুমুও ধুয়া ধরল। বিশু তালে তালে হাততালি দিতে লাগল।

প্রায় আধ ঘণ্টার ওপর চলল গান। তারপর সকলে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল।

কুমু উঠে দাঁড়াল। বিগ্রহের সামনে থেকে কাঁসার থালা তুলে নিয়ে প্রথমে বাপকে শশার কুচি, শাঁকালুর টুকরো আর বাতাসা দিল। বিশুর কাছে এসে দাঁড়াতেই বিশু মুখ তুলল।

এলোচুলের রাশ দু কাঁধ বেয়ে লুটিয়ে পড়েছে। পরণে ধবধবে

থান। গায়ের রঙের সঙ্গে যেন মিলিয়ে গেছে। টানা দুটি চোখ মমতায় করুণ। ঠোঁটের কোণে হাসির আভাস।

নাও, হাত পাতো।

বিশু একদৃষ্টে চেয়েছিল, কুমুর কথায় খেয়াল হ'ল। তাড়াতাড়ি সসঙ্কোচে দুটো হাত অঞ্জলিবদ্ধ করল।

চোখ দুটো ছলছল করছে যে?

হাতের ওপর ফলের টুকরো ফেলতে ফেলতে কুমু জিজ্ঞাসা করল।

একটু সর্দি হয়েছে। খুব ভোরে উঠতে হয় কি না। বিশু থেমে থেমে আস্তে আস্তে বলল।

কুমু কথা বলল না, কথা বললেন কুমুর বাপ।

ভোরের শিশির লাগানোটা ঠিক নয় বাবা। চট করে অসুখ-বিসুখ হয়ে যাবে।

এত কষ্টেও বিশুর হাসি এল। ভোরে ওঠা না ওঠা যেন বিশুর ইচ্ছার মধ্যে। প্রয়োজন হ'লে যেন সে বেলা অবধি শুয়ে থাকতে পারে বিছানায়। সন্ধ্যা হলেই গুটি গুটি চাদরের তলায় ঢুকতে পারে।

হাতের ফলের কুচিগুলো খেতে খেতে বিশুর কথাটা মনে পড়ে গেল। আপনি তো খুব ভাল কথকতা করতে পারেন?

আমি! কুমুর বাবা স্মিত হাসলেন, এ খবর কোথায় যোগাড় করলে?

কবরেজ মশাই বললেন।

কবরেজ মশাই?

হ্যাঁ, অনঙ্গ কবরেজ।

কুমুর বাবা হাসি থামালেন না। বললেন, রাধাগোবিন্দের কথা যে বলবে শুনতে ভাল লাগবে। বলার গলা নয়, শোনার কানই এখানে আসল। তুমি কথকতা শুনতে খুব ভালবাস বুঝি?

হ্যাঁ, কিন্তু শুনতেই পাই না!

শুনতে পাও না? কেন?

বাড়ীর সবাই চলে যায়, আমাকে ঘর আগলাতে হয় কিনা।

আচ্ছা বেশ, কুমুর বাবা নিজের থেকেই বললেন, একদিন তুমি সন্ধ্যার দিকে এস, তোমায় ঠাকুরের কথা শোনাব।

বিশু ঘাড় নাড়ল। সেই ভাল। একদিন সুযোগ সুবিধা বুঝে সে চলে আসবে মন্দিরে। শুধু কুমুর বাপের কাছে কথকতাই নয়, তার নিজের কথাও বলবে কুমুর বাপকে।

কুমুকে শহরে নিয়ে যাবার কথা। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কাছে। যদি সব শুনে তিনি একটা গতি করে দিতে পারেন। গাঁয়ের মাতব্বররা হয়তো বাদ সাধবেন, কিন্তু আর তাঁদের ভয় নেই। তাঁদের বিষদাঁত ঘোষালদের সেজ বৌ ভেঙে দিয়ে গেছে। ফণা গুটিয়ে চুপচাপ থাকতে হবে তাঁদের।

তার ওপর কুমুর বাপও তো কারুর পরোয়া করেন না। দরকার হ'লে তিনিও বুক ঠুকে দাঁড়াবেন। ভয় কি, বিধান যখন আছে, তখন কিসের অসুবিধা।

বিশু উঠে পড়ল। আজ আর দেরী করবে না। শরীরটা ভাল ঠেকছে না। বাড়ী গিয়ে দাওয়ায় একটু গড়িয়ে নেবে। আগে শরীর খারাপ হলে গ্রাহ্যই করত না, কিন্তু পরাণের ব্যাপারটা চোখে দেখার পর থেকেই কেমন ভয় ভয় করে। সামান্য অসুখেই কাবু হয়ে পড়ে।

আজ আমি উঠি।

তা হলে বাবাব কথকতা শুনতে আসছ তো একদিন? কুমু হাতের চন্দনের থালা থেকে চন্দন নিয়ে বিশুব কপালে ফোঁটা দিয়ে দিল।

সারা শরীর শিউরে উঠল বিশুর। কোন উত্তর না দিয়ে ছুটে মন্দিরের চাতালে এসে দাঁড়াল।

মন্দিরের চাতাল থেকে নামবার মুখেই একেবারে সামনে পড়ে গেল। পঞ্চানন চক্রবর্তী, হাতে বাঁশের লাঠি। হন হন করে এগোচ্ছিল, বিশুকে দেখে থমকে দাঁড়াল।

চোখ কুঁচকে দেখল, তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, কিরে বিশে, মহাবোষ্টম হ'য়ে পড়েছিস যে? তা মাথা ন্যাড়া কর, গলায় কণ্ঠি নিয়ে খোলকরতাল বাজা। তোর খুড়ো একেবারে উদ্ধার হ'য়ে যাবে।

কথা বলতে বলতে পঞ্চাননের চোখ পড়ল কুমুর ওপর। এক হাতে মালা, এক হাতে বাটা চন্দন। অপরিচিত গলা শুনে মন্দিরের ভিতর থেকে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল। একেবারে পঞ্চাননের সঙ্গে চোখাচোখি।

পঞ্চানন গলার আওয়াজ পাল্টে ফেলল।

দু'চোখে বিস্ময়ের আমেজ এনে বলল, ওঃ, তাই তো বলি বিশু-বাবু সারা গোবিন্দপুরে এত মন্দির থাকতে, এই অজ-বনের মধ্যে এই মন্দিরে এসে হাজির কেন। টানের জিনিস রয়েছে যে। বেশ, বেশ, যুগল মূর্তি দেখে আমার চক্ষু সার্থক হ'ল। রাধে শ্যাম, রাধে শ্যাম।

বিশু কিছু বোঝবার আগেই পঞ্চানন লম্বা লম্বা পা ফেলে সরে পড়ল।

কথাগুলো বিশু যখন বুঝতে পারল তখন আর মুখ তুলে চাইতে পারল না কুমুর দিকে। ছি, ছি কাণ্ডজ্ঞান নেই একেবারে, মুখের কোন আগল নেই।

বিশু যাবার মুখেই থেমে গেল।

শোন, কুমুর গলা, ঐ লোকটা কে?

পঞ্চানন যে কে এক কথায় বলা কঠিন। বিশুর অনেক সময় মনে হয়েছে যেন একটা বড় আকারের নীল মাছি। গোবরের ওপর, জমানো জঞ্জালের ওপর, নর্দমার ধারে কাছে দিনরাত উড়তে দেখা

যায়। সব কিছুর মধ্যেই পঞ্চানন নোংরা ছাড়া আর কিছু দেখতেই পায় না।

এ পাড়ারই লোক।

ভারি ইতর তো। ওরকমভাবে কথা বলে কেন। ছি।

কুমু! মন্দিরের ভিতর থেকে কুমুর বাপের গম্ভীর গলার আওয়াজ শোনা গেল।

যাই বাবা।

কিন্তু কুমু যাবার আগেই কুমুর বাবা বাইরে বেরিয়ে এলেন। বিশুর দিকে চেয়ে বললেন, পঞ্চানন চক্রবর্তীকে আমি চিনি বিশু। মানুষের ক্ষতি করাই ওঁর স্বভাব। আমাকে উৎখাত করার জন্য কম চেষ্টা করেন নি। তুমি একটু সাবধানে থেক বাবা। যদি তেমন বোঝ, আমাদের এখানে আর এসো না।

তা বলে এরকম মিথ্যা কলঙ্ক রটাবে? কুমু ফেটে পড়ল রাগে।

কুমুর বাবা হাসলেন। অম্লান হাসি।

মেয়ের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, মানুষ তো ছার মা, গোবিন্দজীর নামেই কত কলঙ্ক রটেছিল বৃন্দাবনে। আমরা বৈষ্ণব, আমাদের মান নেই, অভিমান নেই, রাগবিরাগ কিছু নেই। কলঙ্ক আমাদের অঙ্গের ভূষণ, মাথার মণি।

বিশু আর দাঁড়াল না।

মুখে বেপরোয়া ভাব দেখালেও মনে মনে বেশ একটু ভয় পেল। পঞ্চানন সোজা গিয়ে উঠবে নরহরি মুখুজ্জের কাছে। ইনিয়ে বিনিয়ে রং চড়িয়ে নানান কথা বলবে।

কিছুটা এগিয়েই বিশু দাঁড়িয়ে পড়ল। পিছন ফিরতেই গাছের ফাঁক দিয়ে মন্দিরের চূড়ো নজরে পড়ল। সোজা উঠেছে আকাশ ভেদ করে, আশপাশের সব গাছ ছাড়িয়ে।

কথাটা বিশুর হঠাৎ মনে হ'ল। কেন ভয় কিসের। অন্যায়

যখন করেনি, কোন মন্দ কাজে নিজেকে জড়ায় নি, তখন কিসের ভয়, কিসের আতঙ্ক!

সারা গাঁয়ের লোক অযথা এই লোকটাকে ভয় করবে, সব ব্যাপারে পাশ কাটিয়ে যাবে, মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস কারো নেই। কুমু ঠিকই বলেছে, কেন মিথ্যা কলঙ্ক রটাবে, কেন মনগড়া কথা বলে বেড়াবে সবাইকে।

আরো তুজনের কথা বিশুর মনে পড়ে গেল। শোনা কথা অবশ্য। পূবপাড়ার ঘোষালদের সেজকর্তা। স্পষ্ট বলে দিয়েছিল পঞ্চাননের মুখের ওপর, দরকার হ'লে পাড়া ছাড়বে, কিন্তু পরিবার ছাড়বে না। এইতো পুরুষের কথা। দরকার হ'লে বিশুও এমনি বুক ফুলিয়ে দাঁড়াবে। বলবে, কেন মন্দিরে আসায় দোষটা কিসের! বিশুর ভাল লাগে তাই আসে। আর একজন ঘোষালদের সেজবৌ। পাড়া ছাড়ল, তবু মাথা নোয়াল না কারো কাছে।

নরহরি মুখুজ্জের বাড়ীর চেয়ে ঝকঝকে তকতকে মন্দিরের চাতাল সত্যিই অনেক ভাল লাগে। ফুলের গন্ধে, চন্দনের সুবাসে, সুললিত গলার ছন্দে, বিশুকে যেন অন্য এক জগতে নিয়ে যায়, যেখানে নরহরি মুখুজ্জে আব তার পরিবারের উগ্র শাসন নেই, গোবিন্দপুর গাঁয়ের পঙ্কিল আবহাওয়াও নয়।

বাড়ীর কাছে আসার সঙ্গে সঙ্গেই বিশুর বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। অনেক কষ্টে সংগ্রহ করা সাহস কোথায় মিলিয়ে গেল।

বেড়ার কাছে এসে একটু দাঁড়াল। সব নিঃঝুম। কোথাও কেউ নেই। ঘরের চালে একপাল চড়াই কিচ-মিচ করছে। উঠানে তুটো কাঠবেড়ালী ঘুরছিল, বিশুর পায়ের শব্দে তর তর করে গাছে গিয়ে উঠল।

সাবধানে আগল খুলে বিশু উঠানে পা দিল। রান্নাঘরের কাছে গিয়েই থমকে দাঁড়াল। ভাতের থালাটা একদিকে কাত হ'য়ে

পড়েছে। ভাতের দানা চারদিকে ছড়ান। ডালের বাটিটা উল্টে সারা দাওয়া জুড়ে ডালের স্রোত। সজনে ডাঁটাগুলো ইতস্তত পড়ে আছে। একরাশ কাক কাড়াকাড়ি ক'রে সেগুলোর সদ্ব্যবহার করছিল, বিশু কাছে আসতে উড়ে পেয়ারাগাছে গিয়ে বসল।

চুপ করে বিশু দাঁড়িয়ে রইল। কিছু পেটে পড়েনি। রাবণের চুল্লী জ্বলছে পেটে। মাথায় দপ করে যেন আগুন জ্বলে উঠল। উঠান থেকে কতকগুলো ইঁটের টুকরো নিয়ে এলোপাথাড়ী ছুঁড়ল পেয়ারাগাছের দিকে, তারপর থালা-বাটি নিয়ে খিড়কীর পুকুরে নামল।

আবার আহার জুটবে সেই রাত্রে। বিকেলে জন-মনিষ যদি মাঠফেরত আসে, তাদের মুড়ি গুড়, জলখাবার দেবার সময় বিশুর ভাগ্যেও কিছু জুটতে পারে। নয়তো রাত আটটা। এর মধ্যে কেউ একবার ডেকে জিজ্ঞাসাও করবে না। খেল কি না খেল, সে বিষয়ে একটি কথাও নয়।

গোয়ালঘরের সামনে বসে বিশু খড় কাটতে শুরু করল।

পেটের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা। ঝাপসা ঠেকছে সব কিছু। বাড়ার মধ্যে ছেলেমেয়ে নিয়ে তিন খুড়ি ঘুমাচ্ছে। চালে বাজ পড়লেও কারো তন্দ্রা ভাঙবে না। কেউ নড়েও শোবে না। নিজের মা থাকলে কখনই বিশুর এমন হাল হ'ত না। অবস্থা হাজার খারাপ হ'লেও বিশুকে না খাইয়ে কিছুতেই তিনি নিজে খেতেন না।

খড় কাটা শেষ করে বিশু মনে ভাবল একটু গড়িয়ে নেবে। ঘুমিয়ে পড়লে তবু পেটের জ্বালাটা কম থাকে। কিন্তু শুতে যাবার মুখেই বিপত্তি।

মেজবৌ ঘুম থেকে উঠে দাওয়ায় এসে দাঁড়িয়েছে। অবেলায় ঘুম ভেঙে যাওয়ার জন্য মুখটা ফুলো ফুলো। গলার স্বরও বাজখাঁই।

ও নবাবপুত্তুর, গুটি গুটি যাচ্ছ কোথায়। ঢেঁকিতে দয়া করে পা দাও একবার। দিন তিনেক তো ও পাট বন্ধ করে দিয়েছ।

বিশু ফিরে এসে ঢেঁকিশালে ঢুকল। মেজখুড়ির মুখের ওপর কথা বলার সাধ্য নেই কারুর। নরহরি মুখুজ্জের সব চেয়ে পেয়ারের পরিবার। বড়লোকের মেয়ে। এখনও বাপের বাড়ী থেকে ফলমূল তরিতরকারি আসে। কলসী কলসী গুড়, খই বাতাসা, হরেক রকমের মিষ্টি।

নরহরি মুখুজ্জে একটু তাড়াতাড়িই ফিরল। একেবারে মারমুখো হ'য়ে। এক নৌকায় দু'জনে পার হয়েছে। পঞ্চানন আর নরহরি। পাশাপাশি বসে পঞ্চানন সব কথা বলেছে। ভাইপোর লীলাখেলার কথা। গোবিন্দপুরের প্রথম বিধবাবিবাহ নরহরি মুখুজ্জের বাড়ী থেকেই শুরু হবে। কম আনন্দের কথা। বিদ্যাসাগরকে পত্র লিখে দিলে তিনি নিজে আসবেন আশীর্বাদ করতে। মুছে যাওয়া সিঁথিতে নতুন ক'রে সিঁদুর পরিয়ে দিয়ে যাবেন। নতুন লোকের পরমায়ুর নিশানা হিসাবে নতুন নোয়া।

নরহরি গুম। একটি কথাও বলেনি। রাগে ঠক-ঠক করে কেঁপেছে শুধু!

দুটোতে আলাপটা হ'ল কি ক'রে?

আরে মুখুজ্জে, গাইবাছুরে ভাব থাকলে বনে গিয়ে দুধ খায়। বিশে হারামজাদা এক নম্বরের নচ্ছার। কাজ ফাঁকি দিয়ে ওই তো করে বেড়াচ্ছে। আমি একেবা'রে হাতে-নাতে ধরে ফেলেছি ভায়া। দু'জন ছিটকে দু'পাশে চলে গেল। ওই যে নীলাম্বর ভটচায মন্দিরের সেবক হয়েছে, তারই তো কাণ্ড। তবু বিধবা মেয়েটার একটা গতি হোক। আমার তো মনে হয়, তোমার বাড়ী থেকে লুকিয়ে-চুরিয়ে

বিশেটা মাল পাচার করে ওবাড়ী চালান দেয়। তুমি তো আত্মভোলা মানুষ, কোনদিকে নজর নেই।

সারাটা পথ নরহরি একটী কথাও বলেনি, কেবল বাজার ছাড়িয়ে গাঁয়ে ঢোকবার মুখে পঞ্চাননের হাত দুটো জড়িয়ে ধরেছিল, পঞ্চুদা, দোহাই তোমার, তুমি আর কথাটা পাঁচ কান কর না। আমি ছোঁড়াটার কি অবস্থা করি, তুমি দেখ একবার। জমিদারের কানে কথাটা উঠলে সমস্ত জল ঘোলা হ'য়ে উঠবে। আমার প্রাণান্ত। ছুটোছুটি, দশবার পঞ্চায়েতের সামনে দণ্ডবৎ, খোয়াড়ের অন্ত থাকবে না।

ক্ষেপেছ তুমি মুখুজ্জে, এসব কথা কি দশজনকে বলে বেড়াবার মতন। আমি তো ব্যাপারটা দেখে অবধি যেন কেমনতর হ'য়ে গেছি। ছি, ছি, ছি, কলির সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসছে। পৃথিবী রসাতলে যাবার আর দেরী নেই।

নরহরি হাতের জিনিসগুলো দাওয়ার ওপর রেখেই চেঁচিয়ে উঠল, বিশে হারামজাদাটা কোথায়।

তিন বৌ এগিয়ে এসেছিল, মেজাজ দেখে দু'জন পিছিয়ে গেল। কেবল মেজ বৌ বলল, কি ব্যাপার গো? এই তেতে পুড়ে এলে, এসেই বিশেকে কি দরকার।

আমার শ্রাদ্ধের চালকলা বাঁধবে তাই দরকার। উঃ, হারামজাদার পেটে পেটে এত। ডুবে ডুবে জল খাচ্ছে।

কি হয়েছে কি? মেজবৌ চাপাগলায় প্রশ্ন করল।

হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু। নরহরির গর্জন থামল না, কিন্তু ওরই মধ্যে গলার স্বর খাদে নামিয়ে আস্তে আস্তে কি সব বলল।

ওমা, বল কি গো! কি সর্বনাশ! থেকে থেকে মেজবৌয়ের বিস্মিত গলার আওয়াজ শোনা গেল।

মিনিট কয়েক সব চুপচাপ। বিশুর একটু ঢুলুনি এসেছিল। সামান্য তন্দ্রার ঘোর। আচমকা পিঠের ওপর লাথি পড়তে ছিটকে মাটিব ওপর লুটিয়ে পড়ল। তারপর অবিরাম প্রহার। উঠানে কঞ্চির স্তূপ পড়েছিল। বেড়ার মাঝখানে দেবে বলে বিশুই কেটে এনে রেখেছিল, তারই একটা তুলে নিয়ে সপাসপ বুকে পিঠে নরহরি চালাতে আরম্ভ করল।

হারামজাদা তুমি এইসব করে বেড়াচ্ছ ?

দুটো হাত দিয়ে শুধু বিশু নিজের মুখ চোখ বাঁচিয়ে যেতে লাগল। কঞ্চির কাঁটা চোখে লাগলে দফা শেষ। জন্মের মতন অন্ধ হয়ে যেতে হবে। রাগের সময় মানুষের কি আর জ্ঞান থাকে।

তুমি বিধবার সঙ্গে পিরীত করে বেড়াচ্ছ ? অকালকুষ্মাণ্ড কোথাকার ?

লাথি, চড়, কঞ্চির ঘায়ে বিশুর ততটা লাগে নি। কথাটা যেন ধক করে একেবারে বুকে গিয়ে বিঁধল। মর্মান্তিক যন্ত্রণা। এ আবার কি কথা ? এই কথা পঞ্চানন চক্রবর্তী বলে বেড়াচ্ছে সব জায়গায় !

লুকিয়ে চুরিয়ে বনেজঙ্গলে গিয়ে ভাবসাব হচ্ছে ? তোমার ইয়ের কাঁথায় আগুন। যেমন নাগর, তেমনি হয়েছে ওই বেবুশ্যে মেয়েটা।

খবরদার, মুখ সামলে।

উঠানে বজ্রপাত হ'লেও বোধ হয় নবহরি এতটা আশ্চর্য হত না। না নরহরি, না দাওয়ায় দাঁড়ানো তার তিন বৌ।

কোণঠাসা গুলবাঘের মতন বিশুর দুটো চোখ জ্বলছে। সমস্ত শবীর ফুলে ফুলে উঠছে প্রমত্ত আবেগে। গলার শিরাগুলো দড়ির মতন মোটা হয়ে উঠেছে।

নরহরি মুখুজ্জেকে তার' নিজের ভিটেয় কেউ এমন রুখে দাঁড়াতে পারে তা সে ধারণাও করতে পারে নি।

কি আমার কথার ওপর কথা। অন্যায় করে আবার চোখরাঙানী।

নরহরি রাগে জ্ঞান হারাল। প্রচণ্ড বেগে লাথি মারল বিশুর পিঠের ওপর। বিশু বোধ হয় একটু অন্যমনস্কই ছিল। বোধ হয় সোনারঙা কুমুর কথাই ভাবছিল। সে রকম মেয়ের নামে কেউ অপবাদ দিতে পারে, কুৎসা রটাতে পারে, তা যেন ভাবাই যায় না। এমন পাষণ্ডও পৃথিবীতে আছে।

আচমকা ধাক্কায় বিশু একেবারে ঢেঁকির নিচে গিয়ে পড়ল। একটা হাতের ওপর সশব্দে ঢেঁকির পাড় নেমে এল।

হাতটা কোলের ওপর নিয়ে অসহ্য যন্ত্রণায় বিশু চিৎকার করে উঠল। আহত বাঘের আর্তনাদ।

থাকব না, থাকব না এখানে। আমার যেদিকে ছু'চোখ যায়, সেদিকে বেরিয়ে যাব।

কথার সঙ্গে সঙ্গে দরদর ধারায় ছু'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। এ বাড়ীতে বিশুর চোখে জল আজ পর্যন্ত কেউ দেখে নি।

থাকবি না? রাখবে কে তোকে রে হারামজাদা? বেরিয়ে যা। বেরো বাড়ী থেকে।

গলাধাক্কা দিয়ে নবহরি বিশুকে ঠেলে দিল। আর একবাব পড়তে পড়তে বিশু বেঁচে গেল।

উঠান পার হয়ে ফটকের দিকে যেতে যেতে বিশু দাওয়ার দিকে একবার চোখ তুলে দেখল।

তিন খুড়ি সার সার দাঁড়িয়ে। কচি ছেলেমেয়েগুলোও সামনে। সকলের মুখেই কেমন একটা মজা দেখার ভাব। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে শেয়াল মারার মতন সবাই যেন দৃশ্যটা উপভোগ করছে। কারুর চোখে সমবেদনার ছায়ামাত্র নেই, সহানুভূতির লেশমাত্র নয়।

বাঁশের আগল খুলে বিশু পথে এসে দাঁড়াল।

অনেক বছর আগে এমনি নিঃসহায় অবস্থায় বিশু এদের সামনে এসে পড়েছিল। সদ্য মাতৃহারা। তখন একটা সুবিধা ছিল পৃথিবীর

সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয় তার হয় নি। আজও তেমনি অসহায় অবস্থা। কেবল নিষ্ঠুর ছুনিয়ার সঙ্গে যথেষ্ট পরিচয় ঘটেছে ইতিমধ্যে।

দ্রুতপদে বিশু জঙ্গলের পথ ধরল। কোথায় যাবে কিছু ঠিক নেই। সে কথা বিশু ভাবছেও না। যেদিকে ছ'চোখ যায় সেদিকেই চলতে শুরু করল।

খেয়াল হ'ল চাঁপাগাছতলায় এসে। চারদিকে অল্প অন্ধকার নেমেছে। গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে ছ' একটি আলোর রেখা। সমস্ত শরীর যন্ত্রণায় কাতর। বাঁ হাতটা ক্রমে নিস্তেজ হ'য়ে পড়ছে।

অন্ধকারে আর একটা মূর্তি এগিয়ে আসতেই বিশু সরে এল। ছায়ার আওতায়।

একি, এ যে মেঘ না চাইতেই জল। আরতিব সরঞ্জাম হাতে নিয়ে কুমু চলেছে মন্দিবের দিকে।

কুমু।

কে, কে, ওখানে?

আমি, বিশু একটু এগিয়ে এল। খোলা জায়গায় গিয়ে দাঁড়াতে বিশুর সাহস হ'ল না। সর্বাঙ্গে আঘাতেব চিহ্ন। সারা গায়ে রক্তের দাগ। এখনি কুমুব হাজার প্রশ্নের উত্তর ' দিতে হবে। তাব চেয়ে অন্ধকাবে গা ঢাকা দিয়ে থাকাই ভাল।

তুমি এ সময়ে এখানে? কুমুর গলায় সন্দেহেব ছোঁয়াচ।

আমি চলে যাচ্ছি এখান থেকে। এ গাঁয়ে আর আমি থাকব না। আমি শহরে চলে যাব।

শহরে? কেন?

শহরে যে কেন তা বিশু নিজেই জানে না। শহরে যে যাবে, কুমুকে দেখার আগে পর্যন্ত, ঘুণাক্ষরেও ভাবে নি। হঠাৎ কথাটা মনে হ'ল। যদি গাঁ ছাড়তেই হয় তো, শহরে যাওয়াই ভাল। একেবারে

বিদ্যাসাগরের কাছে গিয়ে দাঁড়াবে। একলা নয়, কুমুকে নিয়ে। এই মেয়েটার একটা বন্দোবস্ত যাতে হয়, তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা।

আর না ভেবেই বিশু বলে ফেলল, তুমি আমার সঙ্গে শহরে যাবে কুমু?

তোমার সঙ্গে শহরে? কুমু থেমে থেমে আস্তে আস্তে প্রত্যেকটি কথা উচ্চারণ করল।

হ্যাঁ, বিদ্যাসাগরের নাম শুনেছ? যিনি বিধবাদের বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন? ভাবছি তোমাকে নিয়ে তাঁর কাছে একবার—

ছি! বিশুর কথা শেষ হবার আগেই কুমু অন্তরের সমস্ত ঘৃণা এই একটি কথায় উজাড় করে দিল।

বিশু কথা বলবার চেষ্টা করতেই কুমু তর্জন করে উঠল, এই মতলব নিয়ে ঘোরাফেরা করছিলে তুমি? তোমার পেটে এই সব কুমতলব আছে জানলে, তোমার সঙ্গে কথা বলতাম কোনদিন আমি? এ মন্দিরে ঢুকতে দিতাম?

কুমুর দুটো চোখ জ্বলে জ্বলে উঠল। ফুলে উঠল নাকেব পাটা। সারা মুখে বক্তের ছিটে।

এক মিনিটও কুমু দাঁড়াল না। আবতিব জিনিসপত্র সামলে হন হন করে চলে গেল।

বিশু চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। কোথা দিয়ে যেন কি হ'য়ে গেল। আজ সকালে কার মুখ দেখে উঠেছে কে জানে। জীবনের একমাত্র আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হওয়া পায়েব তলা থেকে মাটি সরে যাওয়ারই সামিল। তার জীবনের কালমেঘের একমাত্র রূপোলী আঁচড় ছিল কুমু, কুমুব বাপ আর রাধাগোবিন্দজীর মন্দির। এখানে এসে একটু সান্ত্বনা পেত। কিন্তু এমনভাবে তাকে ভুল বুঝল কুমু! এভাবে অপমান করল!

নরহরি মুখুজ্জের হাতের মার খেয়ে এত কষ্ট হয় নি বিশুর, যেটুকু যন্ত্রণা, সেটুকু সীমাবদ্ধ ছিল দেহের ত্বকে, কিন্তু কুমুর কথাগুলো

আগুন ছিটিয়ে দিল বুকের মাঝখানে। সমস্ত পাঁজরগুলো পুড়িয়ে ছাই করে দিল।

মাথা নিচু করে প্রাণপণে বিশু ছুটতে শুরু করল। কোন দিকে না চেয়ে। অনেকবার হোঁচট খেল। কাঁটাগাছে লেগে ক্ষতবিক্ষত হ'ল পায়ের পাতা, বাঁশঝাড়ের খোঁচা' লেগে রক্ত ঝরতে শুরু করল ছু'হাঁটু বেয়ে। বিশু থামল না। গোবিন্দপুর থেকে, সে পালাচ্ছে, আত্মরক্ষা করছে গোবিন্দপুরের বাসিন্দাদের কাছ থেকে। জমিদার, পঞ্চানন চক্রবর্তী, কাশীপতি ন্যায়রত্ন, নরহরি মুখুজ্জে আর তার তিন পরিবার, কুমু, কুমুর বাপ সকলকে পিছনে রেখে সে ছুটতে শুরু করল। এরা মিথ্যা অপবাদ দেয় মানুষের নামে। ভুল বোঝে মানুষকে।

নদীর ধারে পৌঁছে বিশু হাঁফ ছাড়ল। রক্ত আর ঘামে চেহারাই বদলে গেছে। কামারের হাপরের মতন ওঠানামা করছে চওড়া বুক। পা ছুটো ক্লান্তিতে নেতিয়ে পড়ছে।

ঘাটে বাঁধা এক নৌকার ওপর বিশু টান হ'য়ে শুয়ে পড়ল। নিচে জলের মৃদু কল্লোল, ওপরে তারা-ছাওয়া আকাশ। অবাধ নিষ্কৃতি। পরম সান্ত্বনা যে মানুষের মুখ নেই ধারে কাছে কোথাও, মতলববাজ, মিথ্যাচারী মানুষের মুখ।

নৌকার স্বল্প দোলানিতে তন্দ্রা নেমে এল বিশুর ছু'চোখে। কিন্তু ঘুম আসার মুখেই তীব্র ব্যথায় পেটটা মোচড় দিয়ে উঠল। সকাল থেকে একটি দানা পেটে পড়ে নি।

নৌকা থেকে নেমে ছু'হাতে আঁজলা আঁজলা করে জল খেল। ঠাণ্ডা কনকনে জল। পরম তৃপ্তিতে বিশু চোখ বুজল। তারপর আবার সাবধানে উঠে নৌকার পাটাতনের ওপর নিজেকে ছেড়ে দিল।

খুব ভোরের দিকে গোলমালে বিশুর ঘুম ভেঙে গেল।

কানাই মাঝি নৌকা খুলতে এসেই চেঁচামেচি শুরু করেছে। পাটাতনের ওপর শুয়ে কে ?

চোখ মেলে চাইলেও বিশু চেষ্টা করে উঠে বসতে পারল না। সমস্ত দেহ ব্যথায় অসাড়। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে।

কানাই মাঝি অপরিচিত নয়। ওর নৌকায় নরহরি মুখুজ্জের সঙ্গে অনেকবার বিশু পার হ'য়েছে।

কে, বিশু না ? কানাই মাঝি ঝুঁকে পড়ে দেখল, তোমার এমন অবস্থা করল কে ? ঈস, সমস্ত শরীরে যে কালসিটে পড়ে গেছে।

বিশু ছ'একবার বিড় বিড় করল কিন্তু স্পষ্ট কিছু উচ্চারণ করতে পারল না।

গায়ে হাত দিয়ে কানাই মাঝি পিছিয়ে গেল, গা যে আগুন গো। এত জ্বর নিয়ে এখানে এলে কি কবে ?

বিশু নির্বাক।

কানাই মাঝির দেরী কববার উপায় নেই। ভোরবেলা নৌকা না ছাড়লে ছুপুর নাগাত গিয়ে পৌঁছাতে পারবে না। যাত্রী পারাপার নয়, জঙ্গল থেকে কাঠ ভেঙে আনবে। কাঠুরেরা ডাল ভেঙে, বেঁধে ঘাটের ধারে অপেক্ষা করবে। নৌকা বোঝাই হ'লে ফিবে আসবে। বিকেলের দিকে রওনা হ'লেও ফিরতে মাঝরাত।

কানাই নৌকা ছেড়ে দিল। পালেব একটা ছেঁড়া কাপড় নিয়ে ঢাকা দিয়ে দিল বিশুর গায়ে।

বিশু চোখ মেলল ঘণ্টা তিনেক পর।

নদীর হাওয়ায় আর রোদে শরীবটা একটু ভালই বোধ হচ্ছে। গায়ের ব্যথা একটু কম, তবে এপাশ ওপাশ করতে খুব কষ্ট হ'চ্ছে। কেউ সাহায্য করলে উঠে বসতে বোধ হয় পারবে।

কানাই মাঝি এক সময়ে কাছে এসে বসল। গায়ে হাত দিয়ে দেখল।

এ যে একেবারে চোরের মার। কে এমন অবস্থা করলে ?

একটু একটু করে বিশু সব বলল। নরহরি মুখুজ্জের নির্যাতনের কাহিনী।

কিন্তু এ অবস্থায় এখন যাচ্ছ কোথায় ?

কথাটা বলতে গিয়েই বিশুর মনে পড়ে গেল। কোথায় যে যাচ্ছে সে কি নিজেই জানে ! আর তা ছাড়া, নরহরি মুখুজ্জের বাড়ীতে আর ঢুকতে পাবে না, সে কথা বলাও বিপদ। কানাই মাঝি হয়তো দরবার করবে মুখুজ্জের কাছে। আবেদন নিবেদন করবে।

তার চেয়ে আসল কথা চেপে যাওয়াই ভাল।

তুমি কোনদিকে যাচ্ছ গো ?

আমি রোজ যেখানে যাই, শিবানীপুরের জঙ্গলে।

শিবানীপুরের জঙ্গলে ? তা'হলে পোড়া গাঁও যাবে ?

যাব মানে পাশ দিয়ে যাব। কেন, সেখানে কি ?

সেখানেই তো নামতে হবে। মুখুজ্জে মশাইয়ের কাজ রয়েছে।

বেশ তো, নামিয়ে দেব'খন।

পোড়াগাঁর নাম শুনেছিল বিশু। সৈরভি, যে ওকে বুকের দুধ দিয়ে মানুষ করেছিল, তার বাড়ী পোড়াগাঁয়। বুড়ী কবে মরে ভূত হয়ে গেছে। তার কাছেই বিশু নামটা শুনেছে। এও শুনেছে শিবানীপুরের জঙ্গলের পাশেই পোড়াগাঁ।

পোড়াগাঁ পৌঁছল প্রায় বারটা নাগাদ। ততক্ষণে বিশু উঠে বসেছে। গায়ের ব্যথা অনেকটা কম। কেবল থেকে থেকে হাতটায় যন্ত্রণা হচ্ছে।

এই নাও তোমার পোড়াগাঁ। এখানে কি কাজ ? সবই তো বাগ্দীর বাস।

বাগ্দীই তো কর্তার চাই। পুকুর কাটাবে তারই জন্য মনিষ দরকার।

নৌকা পাড়বরাবর আসতেই বিশু লাফিয়ে নেমে পড়ল। খুব জরুরী কাজে যাচ্ছে, এইভাবে হন হন করে এগিয়ে গেল সরু পথ ধরে। অনেকক্ষণ পরে ফিরে দাঁড়িয়ে দেখল, নৌকা নদীর মাঝখানে। কানাই মাঝির দাঁড়ধরা মূর্তিটা ক্রমেই অস্পষ্ট হয়ে আসছে।

দু'পাশে নীলের জমি। এখন খালি পড়ে আছে। মাতব্বরদের দু'একটা কথা বিশু শুনেছে। নীলচাষ নিয়ে মজার মজার গানও তৈরী হয়েছিল। সায়েব চটান গান। সং সেজে দু'একজন গোবিন্দপুরের পথেঘাটে গেয়েও বেড়িয়েছে। মারধোর, ঘরপোড়ান, জায়গায় জায়গায় গুলি পর্যন্ত চলেছিল। তবু চাষীরা মাথা নোয়ায়নি।

মাথার ওপর চড়া রোদ। তৃষ্ণায় প্রাণ কণ্ঠস্থ। একটু দূরে গোটা দুয়েক চালা। ওখানে গেলে অন্ততঃ একটু জল পাওয়া যাবে।

গাছের তলা দিয়ে বিশু চালাঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

উঠান ফাঁকা। কেউ কোথাও নেই। ঘরের দরজা বন্ধ। কিছুক্ষণ উঠানে দাঁড়িয়ে থেকে বিশু সাহস করে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। প্রথমে আস্তে, তারপর জোরে কড়া নাড়ল।

বার তিন চার। তারপরই ভিতর থেকে গুরুগম্ভীর গলার আওয়াজ শোনা গেল, কে বটে?

দরজা খুলে যেতেই বিশু পিছিয়ে উঠানে নেমে পড়ল। মিশ-কালো চেহারা। গলায় পাখীর হাড়ের মালা। হাতে রুপোর তাবিজ। পরনে লাল কাপড়। দুটো চোখ জবাফুলের মতন লাল। যাত্রার ভীমের মতন পাকান গোঁফ।

বিশুকে নিরীক্ষণ করল কিছুক্ষণ তারপর বলল, কিরে দরজা ভাঙছিলি কেন?

সঙ্গে সঙ্গে বিশু ঘাড় নাড়ল। আস্তে আস্তে বলল, জল, একটু জল খাব।

জল খাবি তো খালবিলে যা না, ঠিক দুপুর বেলা গেরস্তর বাড়ীতে সেঁদিয়েছিস কেন?

দড়াম করে দরজা বন্ধ হ'য়ে গেল। বিশুর মুখের ওপর।

বিশু পিছু হেঁটে হেঁটে পথের ওপর এসে দাঁড়াল। তুমি যাও বঙ্গে, তোমার কপাল যায় সঙ্গে। বিশুরও হয়েছে তাই। অদৃষ্ট সঙ্গে সঙ্গে ফিরছে। দুরদৃষ্ট।

এগোবার মুখে, আবার বাধা। দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে সেই ভয়ালদর্শন লোকটি।

এই, শোন্ এদিকে।

পায়ে পায়ে বিশু আবার উঠানে এসে দাঁড়াল।

লোকটিও নেমে এসে বিশুর পাশাপাশি দাঁড়াল। চেয়ে চেয়ে দেখল ক্ষতচিহ্নগুলোর ওপর।

বাজখাঁই গলায় বলল, এসব চোট খেলি কোথায়? কার বাড়ী গিয়েছিলি মাল সরাতে। ব্যাটা, পুরুষ নামের অযোগ্য। মার খেয়ে এলি কি বলে।

দুটো চোখে বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ। সাদা দাঁতগুলো রোদের তাতে ঝকমকিয়ে উঠল।

বিশু সব বলল। প্রায় ফোঁপাতে ফোঁপাতে। খুড়ো আর খুড়িদের কথা। বাড়ী আর ফিরে যাবে না সে কথাও বলল।

বলিহারি মরদ, লোকটা উচ্ছ্বসিত হ'য়ে হেসে উঠল। দূরের তালগাছে গোটা দুই চিল বসেছিল, হাসির শব্দে পাখা ঝটপট করে উড়ে পালাল।

আয়, জল খাবি আয়। গলার আওয়াজ একটু যেন খাদে নামল। ঘরের দাওয়ায় বিশু বসল। শুধু জল নয়, মাটির সরায় মুড়ি মুড়কি। বিশু গোগ্রাসে গিলল।

চেহারাটা তো মন্দ বাগাসনি। খাওয়া-দাওয়াও নিতান্ত খারাপ

নয়। পরের বাড়ী খড় কেটে, ধান ভেনে সময় না কাটিয়ে লাঠি ধরতে শেখ না। জমিদারের পাইক হয়ে যাবি।

বিশু কোন উত্তর দিল না। উত্তর দেবার সময়ও তার নেই। এক চুমুকে ঘটির জল শেষ করল।

লোকটার নাম নিমাই সর্দার। আশ পাশের লোকেরা বলে নিমে বাগ্দী। ওদিকে গোবিন্দপুর থেকে এপাশে বাণেশ্বরীর ধারে ধারে ছোট বড় যত গাঁ আছে সব থরথর করে কাঁপে নিমে বাগ্দীর নামে। কোপাইচণ্ডীর জঙ্গল নিমের পূরো রাজত্ব। টাকাকড়ি নিয়ে এ বন পার হতে গেলে তার সামনে পড়তেই হবে।

হালচাল দেখেই বিশুর সন্দেহ হয়েছিল। সারাটা দিন পড়েপড়ে ঘুমায়, রাত হ'লেই উঠে পড়ে। সাঙ্গাতরা এসে উঠানে দাঁড়ায়। শিস দেয়, হাতের শব্দ করে, সঙ্গে সঙ্গে নিমে বেরিয়ে পড়ে। কোমরে বাঁধা চকচকে ভোজালী।

টের পেয়েই বিশু পালাবার চেষ্টা করছিল। এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে নদীর ধারে এসে দাঁড়িয়েছিল।

ঘাটে নৌকা বাঁধা। পাটাতনের ওপর এক মাঝি পড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছে। সন্তর্পণে বিশু তার পাশে গিয়ে বসল।

আস্তে আস্তে গায়ে ঠেলা দিয়ে বলল, ও ভাই, শুনছ, ও ভাই?

মাঝি চোখ খুলে আপাদমস্তক দেখল, তারপর বলল, কি?

নদীটা পার করে দেবে?

মাঝি চমকে হাতযোড় করল, ওটি মাপ করতে হবে কর্তা। পোড়াগাঁয় লোক নামাতে পারি কিন্তু এখান থেকে লোক উঠিয়ে নিয়ে যাবার হুকুম আমাদের নেই।

কার হুকুম?

বড় কর্তার, যিনি ঐখানকার মালিক।

স্থলপথেও সুবিধা হয় নি। হাঁটতে হাঁটতে বনজঙ্গল পেরিয়ে বিশু চলতে শুরু করেছিল। গাঁয়ের চিহ্নমাত্রও নেই। কেবল বন আর বন। এ বন পেরিয়ে কোনদিন যে লোকালয়ের মুখ দেখবে, এমন আশা কম।

অনেক পরে জঙ্গল পাতলা হয়ে এল। মাঠের শেষে চালাঘর। কাছে গিয়েই টের পেল মুদির দোকান। চাল, ডাল, তেল, নুন, ঘি সাজিয়ে মুদি বসেছে। বোধ হয় যাত্রীদের জন্য বন্দোবস্ত।

জলের জন্য সেখানে গিয়ে দাঁড়াতেই মুদি আপ্যায়ন করল।

এসো দাদাঠাকুর, কি দেবো বল ?

কিছু নয়, একটু জল। বিশু হাঁপাতে হাঁপাতে বলল।

মুদি চোখ বন্ধ করে জিভ কাটল, শুধু জল। বামুনকে শুধু জল দিয়ে নরকে যাব নাকি ? ওঠ, ওঠ, উঠে বস।

এমনিতেই বিশু খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। মুদির ডাকে তার পাশে গিয়ে বসল। শুধু জল নয়, এক থালা মুড়ি মুড়কি, গোটা কতক বাতাসা, একটা মুড়ির মোয়াও ছিল।

বিশুব দিকে চেয়ে মুদিই বলল, একটু পবেই সন্ধ্যে নামবে, কাজেই আব না এগোনোই ভাল। বাতটা এখানে কাটাও, ভোরে উঠে রওনা হবে।

তাই হ'ল। কিন্তু ভোরে উঠতে গিয়েই বিশু আটকে পড়ল। বাইরে থেকে শিকল তোলা। অনেক চেঁচামেচি, ধাক্কার পরেও দরজা খুলল না।

দরজা খুলল দুপুর বেলা। দরজার সামনে তুলসী আর নেত্য। নিমে সর্দারের ডান হাত বাঁ হাত।

কিরে সুখে থাকতে তোকে ভূতে কিলোয় ? সর্দারের চোখে লেগেছে, কোথায় ভাল ভাবে থাকবি, তা নয় ছটফট করে বেড়াচ্ছিস ?

মরণবাড় বেড়েছে বুঝি ? নেত্য হাতের খাঁড়াটায় হাত বোলাল।

নিমে সর্দারও সেই কথাই বলল।

ফের যদি পালাবার চেষ্টা করবি তো দেব খতম করে। জলে স্থলে সব জায়গায় আমার চর ঘুরছে, পালিয়ে পার পাবি না। এখানে থাক, আশ্রয় যখন দিয়েছি, তখন ভালই করব তোর। তোকে আমার ভারি পছন্দ হয়েছে। দলে বামুনের ছেলে থাকলে, দলেব পয় বাড়ে।

বিশু ভয়ে মাথা তোলে নি। নিমে সর্দারের দিকে চাইলেই ওর বুকটা গুরগুরটা করে ওঠে।

সেদিন রাত্রে কিন্তু ব্যাপারটা অন্য মোড় নিল।

ছোট্ট একটা ঘরে বিশুর আস্তানা। খড়ের বিছানা। খাওয়া-দাওয়া সেরে সবে শুয়েছে। ঘুমায় নি, কেবল আকাশ-পাতাল চিন্তা করছে, হঠাৎ যেন দরজায় খুট খুট শব্দ।

উঠে লাভ নেই। দরজা বাইরে থেকে বন্ধ। নিমে সর্দাবের দল দরজা বন্ধ করে রাত্রের শিকাবে বেবিয়েছে।

একটু পরেই শব্দ বন্ধ হয়ে গেল। ইঁদুবেব উপদ্রবই হবে বোধ হয়। বিশু ঘুমাবার চেষ্টা করল।

মাঝরাতে গায়ে হাত লাগতেই বিশু ধড়মড় করে উঠে পড়ল। মাথার কাছে চকমকি ছিল, ঠুকে ঠুকে আলো জ্বালল। আলো জ্বেলেই অবাক।

কালো রংয়ের একটা মেয়ে। স্বাস্থ্যের ভারে টলমল করছে। শরীর ঘিরে টকটকে লাল শাড়ি। দু হাতে রূপোর গহনা, নাকে নোলক। হাসিখুশী আহ্লাদী প্যাটার্ণ।

কে তুমি? বিশু উঠে বসল।

মেয়েটি খিল খিল করে হেসে উঠল। হাসির তোড়ে দেহটা কেঁপে কেঁপে উঠল। তারপর হাসি থামিয়ে বিশুর আরো গা ঘেঁসে বলল, আমি তোমার বৌ গো, তাও জান না?

বিশু একেবারে বিছানার ওপর উঠে দাঁড়াল। সর্বনাশ; মাঝরাতে এ আবার কি রসিকতা।

কি গো, লাফিয়ে উঠলে যে ?

মেয়েটিও দাঁড়িয়ে উঠল।

তুমি কে সত্যি করে বল ?

বলছি, কিন্তু যাকে বলব সে যদি ধেই ধেই করে নাচে তো বলি কেমন করে।

বিশু বিছানার ওপর বসল। মেয়েটার ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে।

নাম কি তোমার ?

মেয়েটা হাসি থামাল। বলল, আমার নাম টেঁপী। ভাল নাম শিখরিণী। তুমি বাপু টেঁপী বলেই ডেকো, তাই বলেই সবাই ডাকে।

নিমাই সর্দার তোমার কে হয় ?

আবার মেয়েটি হাসতে শুরু করল। বিছানার ওপর লুটিয়ে পড়ল হাসতে হাসতে। তারপর আঁচলটা ভাল করে গায়ে জড়াতে জড়াতে বলল, বাবা হয়, আবার কে হবে ? তবে একটা মজা আছে। মা সব বলেছে আমাকে। এক বাড়ীতে ডাকাতি করতে গিয়ে সর্দার চুরি করে এনেছে মাকে আর আমাকে। আমি তখন বোধ হয় বছর তিনেকের। মা বামুনের বৌ, আমিও বামুনের মেয়ে।

সেই জন্যই তো বামুন পাত্র খুঁজে খুঁজে সর্দার হয়রান। ভাগ্য গুণে তুমি এসেছ। আমি আসতেই সর্দার তোমাকে দেখিয়ে বলল, ওই দেখো টেঁপুরাণী, তোমার বর ঠিক করে রেখেছি।

কিছুক্ষণ বিশু কোন কথা বলল না। খুব হিসাব করে কথা বলতে হবে। একটু বেফাঁস কথা বললেই মুস্কিল। সর্দারের কানে উঠলে সর্বনাশ। নরহরি মুখুজ্জে বড় জোর আধমরা করত কিন্তু নিমাই সর্দার একেবারে খতম করে ফেলবে।

তুমি এ কদিন ছিলে কোথায় ?

পিসির বাড়ী। চর-অবন্তীপুরে।

তোমার মা ?

সঙ্গে। টেঁপার দুটো চোখ ছলছলিয়ে এল।

বিশু কথা বলল না। নিমাই সর্দার এতদিন বুঝি ঘর জামাইয়ের খোঁজে ছিল! তাই বিশুকে পেয়ে এত আনন্দ।

কিন্তু কোন উপায় নেই। তেমন তেমন হ'লে হয়তো এই মেয়েকেই বিয়ে করে বিশুকে এখানে সংসার পাততে হবে। কোন ওজর আপত্তি চলবে না।

তুমি এখানে এলে কি করে ?

গলার আওয়াজে বিশু চমকে মুখ ফেরাল। চেহারায় কুমুর সঙ্গে একটুও মিল নেই, কিন্তু অবিকল এক কণ্ঠস্বর। বিশেষ করে বিশুর সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন গলার প্রশ্নটুকু।

বিশু হাসল, বেড়াতে বেড়াতে এসে পড়েছি।

তোমার বেড়ানোর পায়ে নমস্কার। বেড়াতে আসবার আর চুলো খুঁজে পেলে না ?

এ মেয়েটির কাছে নিজের সব কথা বলতে বিশুর ইচ্ছা করল না। সব শুনে হয় তো মুখ টিপে হাসবে। ঠাট্টা করবে বিশুকে। বলবে যোয়ান মদ্দ ছেলে মার খেয়ে পালিয়ে এলে এইভাবে।

তার চেয়ে অন্য কথা বলাই ভাল।

বিশু অন্য কথাই পাড়ল।

নিমাই সর্দার ডাকাতি করে বুঝি ?

টেঁপা অবাক। বিস্ফারিত দুটি চোখ মেলে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। তারপর বিশুর দিকে একটু এগিয়ে বলল, তুমি নিমে ডাকাতের নাম শোন নি ? আশ পাশের দশ খানা গাঁ যে থর থর করে কাঁপে নিমে সর্দারের নামে।

বিশু শোনে নি। আশ পাশে ডাকাতের অভাব নেই। যেখানে বন জঙ্গল, সেখানেই ডাকাতের আস্তানা। বিশুদের গাঁয়ের মধ্যে কোন দিন ডাকাত ঢোকে নি। অন্তত বিশুর তো মনে পড়ে না। গাঁয়ের কাছে যে জঙ্গল ছিল, সেখানে ঢোকবারও উপায় ছিল না। ফেয়ারবার্ণ আর মার্শাল সায়েব ছিল বন্দুক নিয়ে। সুবিধা হ'ত না।

তবে এদিক ওদিক ডাকাতির কথা বিশু অনেক শুনেছে। রায়েদের বাড়ীর গিন্নি ছেলে বৌ নিয়ে তীর্থস্থানে যাচ্ছিল। বছরখানেক পরে ফেরবার কথা। ফিরল মাসখানেকের মধ্যে। সর্বস্ব হারিয়ে। শুধু টাকা পয়সা কাপড় চোপড়ই নয়, নিজের ছোট ছেলেটাকেও।

খুড়িদের বলতে শুনেছে। কোথাকার জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পার হচ্ছিল, হঠাৎ রে রে-রে করে ডাকাত পড়ল। যে যেদিকে পারল ছুটল প্রাণ নিয়ে। কর্মচারীদের খোঁজ পাওয়া গেল না। মার গায়ে হাত দিতেই, ছোট ছেলে রুখে দাঁড়িয়েছিল, খাঁড়ার ঘায়ে দু টুকরো হয়ে গেল।

গাঁয়ে ডাকাতের ভয় ছিল না, কিন্তু নরহরি খুব হুঁসিয়ার লোক। টাকাকড়ি সব ঘড়ায় পূরে কলাগাছতলায় পুঁতে রেখেছিল। অবশ্য বিশুকে কিছু বলে নি। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে বিশু জেগে উঠেছিল। দুই খুড়ি আর নরহরি ঘড়া দুটো বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। ছোট খুড়ির হাতে কেরোসিনের ডিবে। বসে বসে বিশু দেখেছিল। এর বেলা নরহরির শরীরে যেন শত হস্তীর বল। কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে এক মানুষ গর্ত। তারপর ধরাধরি করে ঘড়া দুটো নামানো হ'ল। মাটি বোজানো হ'ল। শুধু তাই নয়। রাতারাতি তার ওপর কলাগাছের চারাও বসানো হয়ে গেল।

তুমি থাকতে কোথায়?

গোবিন্দপুরে।

কি করে এখানে এলে বললে না তো?

পথ ভুলে এসেছি।

পথ ভুলে ?

হ্যা, নৌকায় সদর থেকে ফিরছিলাম, মাঝি পোড়াগাঁয় নামিয়ে দিয়ে সরে পড়ল। তারপর পথ হারিয়ে ঘুবতে ঘুরতে এখানে এসে পড়েছি।

মাঝিগুলো সব তো এই দলের। যাত্রী পেলে ভুলিয়ে ভালিয়ে এখানে নামিয়ে দেয়। আমি জানি। পরে যে সবাই লুটের বখরা নিতে আসে।

ডাকাতি করা ভাল নয়। তুমি সর্দারকে বারণ কর না কেন ?

টেঁপী আবার হেসে উঠল, আমি বারণ করব ? ভোজালী দিয়ে আমাকে সর্দার তাহলে শেষ করে দেবে না। ব্যাটাছেলেদের ব্যাপারে মেয়েছেলে নাক গলাতে গেলে সর্দার ক্ষেপে লাল হয়ে যাবে। তা ছাড়া, এটাও ভাবি, আর কববেই বা কি। তবু বলতে নেই, এক রকম সুখেই আছি। শাড়ি পরছি, গয়না পবছি, যখন যা আবদার করছি, সর্দার তাই দিচ্ছে। এ না হ'লে সর্দাবকে তো লোকের বাড়ী গায়ে গতরে খাটতে হ'ত, কিংবা জমিদারের বরকন্দাজের চাকরি।

গায়ে গতরে খাটার চেয়ে ডাকাতি করা ভাল, বিশু বিড় বিড় করে বলল। লোকের বাড়ী খাটার যে কি হেনস্তা তা বিশুর চেয়ে ভাল করে বুঝি আর কেউ জানে না।

কি চুপ করে রইলে যে ?

ভাবছি।

কি ভাবছ ?

নিজের ভবিষ্যতের কথা।

ভেবে কোন লাভ আছে ? আমার মা তো কতবার বলেছে আমাকে। পুরুত ঠাকুরের সঙ্গে বিয়ে হ'ল, বামুনের মেয়ে বামুনের

বৌ হ'য়ে শ্বশুরবাড়ী এলাম। তারপর কোথা দিয়ে কি হ'য়ে গেল। উঠলাম এসে ডাকাতের আস্তানায়। ডাকাতের সর্দারের বৌ হ'য়ে বাকি জীবনটা কাটালাম। ভবিষ্যতের কথা কেউ বলতে পারে! ও তো মানুষের হাতে নয়, ভগবানেব হাতে। প্রথম প্রথম মা এখানে এসে খুব কান্নাকাটি করত। এমন কান্না যে সর্দারেরও মন ভিজে গিয়েছিল। মাকে বলেছিল, চল বাপু তোমাদের যেখান থেকে এনেছি, সেখানে রেখে আসি।

তাবপর? বিশুর গলায় উপচীয়মান আগ্রহ।

তাবপর আর কি। মা যেতে রাজী হয় নি। গিয়েও লাভ হ'ত না! পাড়ার চাঁইবা ঢুকতেই দিত না গাঁয়ে। দূর দূর করে তাড়িয়ে দিত।

বিশুর গোবিন্দপুরের সমাজপতিদের কথা মনে পড়ে গেল। সেই সঙ্গে ঘোষালদের সেজ বৌয়ের কথা। কিন্তু টেঁপীকে সে সব কথা বলে কোন লাভ নেই।

অনেক দূরে কোথায় পেঁচা ডেকে উঠল। বিশ্রী কর্কশ স্বর রাত্রের বাতাসকে চিরে দিল। বেশ রাত হয়েছে।

তুমি শোওগে যাও, আমার ঘুম পাচ্ছে।

খুব মরদ তো তুমি। আমি মেয়েছেলে জেগে আছি, আর তুমি ঘুমে ঢলে পড়ছ?

তা বলে সাবা বাত বসে বসে এমনিভাবে গল্প করব?

আব কটা দিন? কিছুদিন পরেই তো তুমি দলেব সঙ্গে বেরিয়ে যাবে।

দলের সঙ্গে? বিশু শোবার আয়োজন করছিল, টেঁপীর শেষ দিকের কথায় তার ঘুম ছেড়ে গেল।

নিশ্চয়, জামাই হও, আর যেই হও, তোমাকে বসে বসে খাওয়াবে সর্দার এমন লোক নয়।

দলের সঙ্গে গিয়ে আমি কি করব ?

শিকার খুঁজবে, লুঠতরাজ করবে। কখন কখন যাত্রীদের পথ ভুলিয়ে এদিকে নিয়ে আসবে। কাজ কি আর একটা।

বিশু আর কথা বলল না। ময়লা চাদরটা গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল।

কি ঘুমালে নাকি ?

বিশু উত্তর দিল না।

বলিহারি ঘুম। কুম্ভকর্ণকেও হার মানালে।

বিশু নিরুত্তর।

টেঁপী সজোরে একটা ঠেলা দিল। ঘুমন্ত মানুষ সে ঠেলায় ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ত, কিন্তু বিশু চোখদুটো টিপে চুপচাপ শুয়ে রইল।

কিছুক্ষণ বসে থেকে টেঁপী উঠে পড়ল।

ঝাঁপ বন্ধ হবার শব্দ হতেই বিশু চোখ খুলে চাইল। উঠে গিয়ে সন্তর্পণে দড়ির ফাঁস দিয়ে ঝাঁপটা বন্ধ করে দিল তারপর দেয়ালে হেলান দিয়ে বসল।

সব যেন গোলমাল হ'য়ে গেল তার। এক জীবন থেকে আর এক জীবনে এত দ্রুত পদক্ষেপ, পিছনের সব কিছু মুছে ফেলে নতুন মানুষ আর নতুন পরিবেশে খাপ খাইয়ে নিতে হবে নিজেকে! আগেকার জীবন ভুলে যেতে হবে, নির্মমহাতে মুছে ফেলতে হবে গোবিন্দপুরের ছবি।

কুমুকে ভুলে যেতে বিশেষ কষ্ট হবে না। ভুলে যাবার পথ কুমুই মসৃণ করে দিয়েছে। ভুল বুঝেছে বিশুকে। তার সমস্ত আন্তরিকতা দু পায়ে মাড়িয়ে দিয়েছে। সান্ত্বনা পেতে বিশু কুমুর কাছে ছুটে গিয়েছিল, কুমু কঠিন হাতে তাকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিয়েছে।

নতুন জীবনে টেঁপী এসে দাঁড়িয়েছে, বিশুর ভাবী বধূ। কিছুই

বলা যায় না, সর্দার জোর করে হয়তো টেঁপীর সঙ্গে তার বিয়েই দিয়ে দেবে। ডাকাতের মেয়েকে বিয়ে করে ধাপে ধাপে নেমে আসবে অন্ধকার এক জীবনে।

মাথাটা টন টন করে উঠল বিশুর। ভাবনার সমুদ্র। কোথাও কূল কিনারা নেই। যতবার শক্ত মাটির আশায় কূলে আসার চেষ্টা করল, ততবারই ঢেউয়ের চাবুকে ছিটকে পড়ল গভীর জলের মধ্যে।

বিশু শুয়ে পড়ল। যা হবার হবে। টেঁপী ঠিকই বলেছে। ভবিষ্যত মানুষের হাতে নয়। ভাবলে ভবিষ্যতের গতি ফেরানো যায় না।

খুব ভোরে দুমদাম শব্দে বিশুব ঘুম ভেঙে গেল।

বাইরে নিমে সর্দারের কর্কশ গলার আওয়াজ।

নবাবের বেটার ঘুম যে ভাঙবাব নাম নেই।

ধড়মড় করে বিশু উঠে ঝাঁপ খুলে বাইরে এসে দাঁড়াল।

কিরে ঘুমটুম হ'য়েছিল রাত্রে ?

সর্দারের নরম গলার আওয়াজে বিশু চমকে মুখ তুলল। কি ব্যাপাব ! হঠাৎ সুব যে খাদে নামল সর্দারের। এত বেলা অবধি ঘুমালে নরহরি মুখুজ্জের কাছে পরিত্রাণ ছিল না। গালাগাল দিয়ে চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করে দিত। শুধু নরহরি, খুড়িরাও ছেড়ে কথা বলত না। কথার হুল ফুটিয়ে বিশুকে অস্থির করে তুলত।

মুখ টুখ ধুয়ে আয়। লেঠেল গুপী বসে আছে ভোর থেকে।

লেঠেল গুপী ! চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বিশু এদিক ওদিক দেখল। লেঠেল আবার কেন ?

লেঠেল কেন তা বিশু একটু পরেই বুঝতে পারল।

উঠানের মাঝখানে তেলচুকচুকে একটি চেহারা। মাথায় বাবরী চুল। পরনে খাটো কাপড়। পাশে বাঁশের একটা লাঠি। লাঠির মালিকের মতই তেল চুক্‌চুকে অবয়ব।

এই যে গুপী, এটিকে তোমার সাকরেদ করে নাও।

দাওয়ার ওপর বসে নিমে সর্দার বিশুর দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল। দুজন যোয়ান দুদিকে দাঁড়িয়ে সর্দারের গা টিপছিল।

গুপী উঠে দাঁড়াল। দুটো চোখ কুঁচকে দেখল বিশুকে তারপর নিমে সর্দারের দিকে চেয়ে বলল, ঠিক আছে, সর্দার আজ দিন ভাল আছে, আজ থেকেই শুরু করে দিই।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আর দেরী করে দরকার নেই। শুরু করবার আগে একবার মন্দিরটা ঘুরিয়ে নিয়ে এস।

বিশুকে নিয়ে গুপী রওনা হ'ল।

পায়ে চলা পথ ছাড়িয়ে দুজনে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকল। মাদার আর বটের সার। একটি ফোঁটা রোদ আসবার উপায় নেই। শুকনো পাতার রাশ মাড়িয়ে দুজনে এগিয়ে চলল।

ইঁটের স্তূপ। ফাটলে ফাটলে বুনো গাছের ঝোপ। অনেক আগে হয়ত মন্দির ছিল, কিন্তু আজ শুধু ধ্বংসাবশেষ।

সাবধানে গাছের শিকড় এড়িয়ে গুপী আর বিশু ভিতরে গিয়ে দাঁড়াল।

লোলরসনা বীভৎস কালী মূর্তি। দু কোণে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলছে। আধো আলো, আধো অন্ধকারে মূর্তি আরো ভয়াবহ।

মূর্তির দিক থেকে চোখ সরিয়েই বিশু অবাক।

এলোচুল পিঠের ওপর মেলা, পরনে গরদের শাড়ি, পায়ে আলতা, হাতযোড় করে টেঁপী বসে রয়েছে। পায়ের শব্দে পিছন ফিরতেই বিশু দেখল কপালে সিঁদুর আর হোমের ফোঁটা।

আর এক মন্দির, তার চাতালে পূজারতা আর একটি তন্বী। হয়তো একই বয়সের। সে মন্দির রাধাগোবিন্দজীর। সে মেয়েটি রূপে রঙে সোনাচাঁপার সগোত্র। এ মন্দিরের মেয়েটি যেন পূর্ণপ্রস্ফুটিত জবা।

টেঁপী প্রণাম শেষ করে উঠে দাঁড়াল। নিঃসঙ্কোচে বিশুর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলল, এস, প্রণাম কর।

সামনে কুশাসন পাতা ছিল, বিশু তার ওপর হাঁটু মুড়ে বসল।

একবার চোখ বুজেই কিন্তু তখনই চোখ খুলে ফেলল। কালীমূর্তি নয়, চোখের সামনে ভেসে উঠল রাধাগোবিন্দের যুগল বিগ্রহ। দু চোখে পরম প্রশান্তি, অধরে বরাভয়ের আভাস।

বল, জয় কালী, জয় কালী। লেঠেল গুপীর বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বর জীর্ণ মন্দিরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রতিধ্বনিত হ'ল।

শরীরের রক্ত উত্তাল হয়ে উঠল। বৈষ্ণব সত্ত্বা ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হ'চ্ছে শাক্ত সত্ত্বায়, এটা যেন অনুভব করতে পারল বিশু। সে দু হাতযোড় করে চোখ বুজল।

হাতের ওপর স্পর্শ লাগতেই বিশু আবার চমকে উঠল। সাজি থেকে পঞ্চমুখী একটা জবা নিয়ে টেঁপী বিশুর হাতের ওপর রাখল। ফুল নয়, টাটকা রক্ত। সেদিনের কুমুর দেওয়া চন্দনের ফোঁটাও যেন বদলে গেল রক্তের তিলকে।

গুপীর নির্দেশে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বিশু উঠে দাঁড়াল। আগে আগে লেঠেল গুপী। পিছনে পাশাপাশি বিশু আর টেঁপী।

আজ তোমার শোধন হ'ল।

শোধন ?

হ্যাঁ, একে এরা শোধন বলে। আজ থেকে তুমি এদের দলের লোক হলে। তোমার উপাস্য ঠাকুর হ'ল মা কালী। দলের আর সকলে তোমার সাঙ্গাত হ'ল।

বিশুর যেন সাড় নেই। প্রতিবাদ করার শক্তি নয়, প্রতিরোধ করার সাধ্যও নয়।

বন পেরিয়ে পথের ওপর আসতেই ছাড়াছাড়ি হ'ল। লেঠেল গুপী বাঁদিকের পথ ধরল বিশুকে নিয়ে। টেঁপী সোজা চলে গেল।

ফাঁকা মাঠ। হু'পাশে গাছের ঝোপ। বাইরে থেকে নজরে পড়ে না।

জন দশ বারো লোক গাছের তলায় তলায় বসে রয়েছে। ঝাঁকড়া চুলে আব কোমরে লাল কাপড়ের ফেট্টি বাঁধা।

গুপীকে দেখেই সবাই দাঁড়িয়ে উঠল। তারপর শুরু হ'ল লাঠি খেলা। প্রথমে গুপী কসরত্ত দেখাল। হু হাতে হু গাছা লাঠি নিয়ে দাঁড়াল মাঠের মাঝখানে। চারপাশ থেকে ঢিল বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল। অথচ আশ্চর্য, একটা ঢিল গুপীব গায়ে লাগল না। লাঠিতে লেগে গুঁড়িয়ে ছাতু হ'য়ে গেল।

দলেরই একজন ছোকরা বিশুকে আরো খবর দিল।

কোমরে বাঁধা তামাক পাতা নিয়ে চিবোতে চিবোত বলল, এ আর কি দেখছিস রে। একবার নীলকর সায়েবদের সঙ্গে দলের লড়াই বেঁধেছিল। হুটো সাহেব গাদা বন্দুক নিয়ে ওস্তাদকে তাক করে গুলি ছুঁড়েছিল। একটা গুলি ওস্তাদের গায়ে লাগে নি। সব লাঠিতে ঠোক্কর খেয়ে আটকে গিয়েছিল। ও হুটো লাঠি নয়, ওস্তাদ বলে হুই ব্যাটা। বড় ব্যাটা আর ছোট ব্যাটা। বিপদে আপদে ওস্তাদের ওরাই সহায় আর সম্বল।

বিশু যখন ফিরল তখন চনচনে রোদ উঠেছে। পেটে কিছু নেই। মোচড় দিচ্ছে সারা শরীর। দাওয়ার ওপব বসতেই টেঁপী কাছে এসে দাঁড়াল।

নাও, পুকুবে একটা ডুব দিয়ে এস। তোমার জন্য সবাই বসে আছে।

নতুন কথা শুনল বিশু। সে অভুক্ত আছে বলে আর কেউ তার জন্য অপেক্ষা করছে ভাবতেও আশ্চর্য লাগল। নরহরি মুখুজ্জের বাড়ীতে এ কল্পনাতীত।

স্নান সেরে এসে বিশু আরো অবাক হ'ল।

এদিকের দাওয়ায় সার সার আসন পাতা। মাঝখানে ভাল একটা আসন। শাড়ির ছেঁড়া পাড় দিয়ে তৈরী।

নিমে সর্দার বিশুকে বলল, নে, ওই মাঝখানের আসনটায় বস।

বিশু মুখ তুলে চাইল। চোখাচোখি হ'ল টেঁপীর সঙ্গে। টেঁপী হাত নেড়ে ডাকল। কাছে যেতেই তার হাতের ওপর নতুন সরু লাল পাড় ধুতি একটা ফেলে দিল। বলল, নাও, এটা জড়িয়ে নাও।

নতুন ধুতি পরে বিশু মাঝখানে বসল। একধারে নিমে সর্দার, আর এক পাশে লেঠেল গুপী।

সামনে থালায় স্তূপাকার ভাত। চারপাশে তরকারির বাটি। একটা বাটিতে যেন পায়েস বলেই মনে হচ্ছে।

বিশু নিচু হয়ে ভাতে হাত ঠেকাতেই শাঁখ বেজে ওঠল। নিমে সর্দার হুঙ্কার ছাড়ল, জয় কালী, কালী, করালবদনী, মা, মা, মা।

বিশুর মনে হ'ল সে চিৎকারে বাঁশের খুঁটিগুলো যেন থর থর করে কেঁপে উঠল।

সব ব্যাপারটা বিশু বুঝতে পারল দুপুরের দিকে। খেয়ে দেয়ে নিজের ঘরে বসেছিল, ঝাঁপ ঠেলে টেঁপী ঘরে ঢুকল।

পরনে রঙীন আধময়লা শাড়ি, চুলের গোছা এলো খোঁপার ধরনে জড়ানো। পানের রসে টুকটুকে দুটি ঠোঁট।

দলে কোন নতুন লোক ভর্তি হ'লেই এ ধরনের উৎসব হয়। দলের চাঁইরা উপোস করে থাকে, তারপর এক সঙ্গে খেতে বসে।

বিশু দু হাঁটুর ওপর মুখটা রেখে চুপ করে শুনল।

তারপর, ওস্তাদের লাঠিখেলা দেখলে ?

হুঁ, চমৎকার লাগল।

তুমিও শিখবে ওই রকম লাঠিখেলা। যমের চরও ধারে কাছে ঘেঁসতে পারবে না।

দলের সবাই অমন লাঠিখেলা জানে ?

সবাই কি অত ভাল জানে, তবে সবাইকেই শিখতে হয়। কেউ ভাল শেখে আবার কেউ কাজ চালানো গোছ। আজকাল যে রকম বন্দুকের আমদানী হয়েছে, লাঠিখেলাটা শিখে রাখাই ভাল, নয়তো বেন্দাবনের অবস্থা হবে।

বেন্দাবন ?

হ্যা কানা বেন্দাবন। শড়কীর ফলা লেগে বাঁ চোখটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। একটা চোখ হ'লে হবে কি, সাহস খুব। তবে বড্ড গোঁয়ার। কোম্পানীর পাইক টাকা নিয়ে যাচ্ছিল, কাঁধে বন্দুক। শুধু ভোজালী নিয়ে কানা বেন্দাবন সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। টাকার থলিটা কেড়ে নিয়েছিল, কিন্তু পালাতে পারল না। বন্দুকের গুলিতে পাঁজরা ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল। মুখ দিয়ে সে কি রক্ত।

তুমি দেখেছ ?

টেঁপী ঘাড় নাড়ল, না, বুক ঝাঁঝরা হওয়া দেখি নি। শুধু মুণ্ডটা দলের লোকেরা কেটে নিয়ে এসেছিল, তাই দেখেছিলাম। চাপ চাপ রক্ত জমে ঠোঁটের ছুটো পাশ কাল হয়ে উঠেছিল।

বিশু ঠোঁট ছুটো চেপে বমি সামলাল। মনে হ'ল ছুপুরের খাওয়া সব কিছু উঠে আসবে মুখ দিয়ে।

আমাকেও লাঠিখেলা শিখতে হয়েছিল।

তুমি শিখেছিলে ?

হ্যা, কিছুদিন, তারপর বড় হওয়ার সঙ্গে ছেড়ে দিতে হ'ল। শুধু লাঠিখেলা নয়, পাঞ্জাও। আমার কব্জির জোর কম নয়।

হাসতে হাসতে টেঁপী ডানহাতটা বাড়িয়ে দিল।

একটু ইতস্তত করল বিশু, ছু-এক মিনিট ভাবল, তারপর নিজের হাতটা বাড়িয়ে টেঁপীর হাতটা আঁকড়ে ধরল।

হাতটা নিজের হাতের মধ্যে নিয়েই বিশুর ভুল ভাঙল।

মনে ভেবেছিল মেয়েছেলের নরম হাত, একটু চেপে ধরলেই চেঁচিয়ে উঠবে। বিশু চাপ দিয়েই বুঝল তার চেয়ে টেঁপীব কব্জির জোর মোটেই কম নয়।

কি হ'ল, টেপো। হাতে হাত দিয়ে কতক্ষণ বসে থাকব ?

একটু একটু করে বিশু জোর দিল। ছেলেবেলা থেকে গতর খাটিয়ে মানুষ হয়েছে। অমানুষিক পরিশ্রম করেছে। শুধু স্বাস্থ্যই তার ভাল তাই নয়, রীতিমত শক্তিও সে রাখে। বয়সের তুলনায় অনেক বেশী শক্তি।

ঠোঁট দুটো দাঁত দিয়ে চেপে ধরে বিশু হাতের জোর দিল।

টেঁপী আরো ঘেঁসে বসল। বাঁ হাতটা কোলের ওপর রেখে।

কিগো বীরপুরুষ, কি হ'ল ? হাত ছেড়ে দাও, একটা শাড়ি এনে দিই, পরো।

আচমকা বিশু হেঁচকা টান দিল। প্রাণপণে। শরীরের সমস্ত জোর দিয়ে হাতটা টিপে ধরল।

টেঁপী টাল সামলাতে পারল না। ছিটকে একেবারে বিশুর গায়ের ওপর এসে গেল। বেসামাল হ'য়ে গেল পরনের শাড়ি।

হাত দিয়ে শাড়িটা ঠিক করতে করতে টেঁপী চেঁচিয়ে উঠল, উঁ, লাগছে, ছাড়, ছাড়।

বিশু সঙ্গে সঙ্গে হাত ছেড়ে দিল। উত্তাল হ'য়ে উঠেছে রক্তের সমুদ্র। এত মাদকতা নারীর স্পর্শে ! শিরায় শিরায় বিদ্যুতের দাহ। বিশুর মনে হ'ল চোখের সামনে থেকে ভারি একটা যবনিকা যেন উঠে যাচ্ছে। অস্পষ্ট আর একটা জগতের আভাস।

টেঁপীরও সামলে নিতে সময় নিল। সারা দেহের রক্ত মুখে এসে জমেছে। সঙ্কোচে মেদুর দু চোখের দৃষ্টি।

সামলে নিয়ে টেঁপী দুম করে একটা কিল মারল বিশুর হাঁটুতে।

অসভ্য কোথাকার ! টেঁপী ছুটে বাইরে চলে গেল।

বিশু ক্লান্ত শরীরটা এলিয়ে দিল বিছানার ওপর। আজ থেকে যেন নতুন জন্ম হ'ল বিশুর। গোবিন্দপুরের জীবন খসে পড়েছে পিছনে। নরহরি মুখুজ্জের বাড়ীর চাকরের জীবন অবসান। তা ছাড়া আরও একটা বিরাট পরিবর্তন এল মনে। টেঁপীর চুলের গন্ধ, শরীরের গন্ধ অনেকক্ষণ ঘিরে রইল বিশুকে।

কয়েক মুহূর্তে যেন বিশুর মনের বয়স কয়েক বছর বেড়ে গেল।

পবের দিন খুব ভোবে বিশুর ঘুম ভেঙে গেল। ঝাঁপ ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এল। উঠানেব এ পাশে সজনে গাছের গুঁড়িব ওপর বসে নিমে সর্দার দাঁতন করছে। খালি গা, পরনে লালপাড় আট হাতি ধুতি।

বিশুকে দেখে হাত নেড়ে ডাকল। কাছে আসতে হাত ধরে পাশে বসাল। বিশুর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে হাসতে হাসতে বলল, কিরে, ভাবসাব হ'ল টেঁপীর সঙ্গে ?

বিশু উত্তর দিল না। মাথা নিচু করে রইল।

নিমে সর্দার একটা হাত রাখল বিশুর কাঁধে। খুব আস্তে বলল, মেয়েটা ভারি ভালরে। দেখিস খুব আদর যত্ন করবে। ওর মা আমার কম সেবাটা করেছে। মরবার দিন পর্যন্ত কাছে কাছে ঘুবেছে। কবরেজের নিষেধ শোনে নি।

কি ভেবে বিশু বলে ফেলল, ওব মাকে তো চুরি করে এনেছিলে ?

নিমে সর্দার ভ্রূ কুঁচকে ঘাড় নাড়ল, না, চুরি কবে নয়, ডাকাতি করে। না আনলে গুষ্টি সুদ্ধ না খেয়ে মরত। ওই বামুনের সাধ্যি ছিল না পরিবারকে খাওয়ায়। দিনরাত পুঁথি নিয়ে বসে থাকত। মাসের মধ্যে দশদিন ছুটত নবদ্বীপ। পণ্ডিতদের কাছে মীমাংসা করতে। আরে তোর ভাত ডালের মীমাংসা কে করে ঠিক নেই, তুই চলেছিস শাস্ত্রের মীমাংসার জন্য ! সুযোগ বুঝে জ্ঞাতি ভাইরা

জমিজমা সব হাতিয়ে নিল। বসতবাটিটাও কায়দা করে নিজেদের কবলে। আর কিছুদিন পরেই গলা ধাক্কা দিয়ে বৌ আর মেয়েটাকে সুদ্ধ পুরুত ঠাকুরকে রাস্তায় বের করে দিত।

ওর যখন পয়সাকড়ি কিছু নেই তো, ওর বাড়িতে ডাকাতি করতে গিয়েছিলে কেন?

নিমে সর্দার দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা কামড়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর হুঙ্কার ছেড়ে বলল, কিরে ব্যাটা বড় চড়া সুরে কথা বলছিস যে? কৈফিয়ৎ চাচ্ছিস নাকি?

সভয়ে বিশু ঘাড় নাড়ল, না, না, এমনি জিজ্ঞাসা করছি।

কি ভাবল নিমে সর্দার তারপর গলাটা খাদে নামিয়ে বলল, টেঁপীর মার জন্য গিয়েছিলাম। টেঁপীকে দেখে তার মাকে তুই আন্দাজ করতে পারবি না। এটা তো বাপের রং পেয়েছে। মাব ছিল ধবধবে রং, আর কি চোখের বাহার রে। ভৈরবেশ্বরের মন্দিরে পূজো দিতে গিয়েছিল চড়কের সময়, আমরাও গিয়েছিলাম ভিড়ের মধ্যে মিশে। টেঁপীর মাকে দেখে আমার তো তাক লেগে গেল। এই পদ্মফুলেব মতন চেহারা, নিতাই চক্রবর্তীর গোবরে ফুটে আছে! চর লাগিয়ে খোঁজ খবর নিলাম। চক্রবর্তী বৌকে খেতে দিতে পারে না, পরনের কাপড় দিতে পারে না, সুখে রাখবার কোন চেষ্টাই করে না। দিনরাত কেবল পুঁথিতে মুখ গুঁজে পড়ে আছে।

দলবল নিয়ে এক রাতে হৈ হৈ করে গিয়ে পড়লাম। দলকে বলেছিলাম, কোন জিনিস যেন কেউ না ছোঁয় সে বাড়ীর, কারুর গায়ে আঁচড়টি না লাগে। শুধু চিৎকার আর দাপাদাপি। ব্যস, তাতেই কাজ হ'ল। পুরুত মশাই তক্তপোশের তলায় পৈতে জড়িয়ে দুর্গা নাম জপ করতে লাগল, আর টেঁপীর মা টেঁপীকে বুকে জড়িয়ে খিড়কীর দরজা দিয়ে বেরোতেই আমার খপ্পরে পড়ল।

নিমে সর্দার একটু চুপ করে রইল। পুরানো দিনের কথা মনে

পড়ছে। কপিশ দুটো চোখে কোমল ছায়া। মরুভূর বুকে মরুদ্যানের আভাস।

আশ্চর্য মেয়েছেলে। মেয়েকে বুকে জড়িয়ে সোজাসুজি চাইল আমার দিকে। তোর গা ছুঁয়ে বলছি বিশে, কোম্পানীর বরকন্দাজদের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি, গাদাবন্দুকের সামনাসামনি, বুক একটু কাঁপেনি, কিন্তু টেঁপীর মার সে রাতের চাউনির সামনে দাঁড়িয়ে বুকটা গুরগুর করে উঠেছিল।

একটু ভয় ডর নেই। স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করলে, কে তুমি? বললাম, কালীর সেবক নিমাই চাঁদ। নাম শুনে দশখানা গাঁয়ের লোক থরথর করে কেঁপে ওঠে কিন্তু টেঁপীর মা একটু চমকাল না পর্যন্ত। বলল, কি চাও? আমাদের টাকাকড়ি কিচ্ছু নেই। একটু হাসবার চেষ্টা করে বললাম, টাকাকড়ি নিতে আসি নি।

তবে?

তোমাকে নিতে এসেছি।

মশালের আলোয় দেখলাম একটু যেন লালচে হ'য়ে উঠল টেঁপীর মার মুখ। নাকের পাটা দুটো অল্প কেঁপে উঠল। বলল, খেতে পরতে দিতে পারবে? সুখে রাখতে পারবে আমাকে আর আমার মেয়েকে?

বললাম, সাধ্যমত। কালীর কৃপায় যতদূর সম্ভব।

ঠিক আছে। শাড়ির আঁচলটা দিয়ে মেয়েকে জড়িয়ে নিল, তারপর বলল, চল।

গাঁয়ের কোণে পালকি রেখেছিলাম। সোজা এসে পালকির মধ্যে বসল। ঠিক যেন বাড়ীর বৌ বাপের বাড়ী থেকে শ্বশুর বাড়ী চলেছে।

সর্দার একটু থামল। হাতের দাঁতনটা ছুঁড়ে দিল উঠানের ওপর, তারপর উঠে দাঁড়াল।

বছর দশেক টেঁপীর মা আমার সঙ্গে ঘর করেছিল। .বিয়ে করা বৌয়ের মতন। একদিনের জন্য ঝগড়া ঝাটি হয় নি, মন কষাকষি নয়। পিঠে একবার একটা বর্শার খোঁচা লেগেছিল। দিন দশেক উঠতে পারিনি। টেঁপীর মা নাওয়া খাওয়া ছেড়ে দিনরাত পাশে বসে সেবা করেছিল ঘায়ের গন্ধে কেউ কাছে আসত না যখন, তখন টেঁপীর মা কবরেজের মলম লাগাত।

চওড়া বুক কাঁপিয়ে নিমে সর্দার দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

বিশুও উঠে দাঁড়াল। হাত বাড়িয়ে নিমের একটা ডাল ভেঙে নিয়ে পুকুরঘাটের দিকে পা বাড়াল। একটু এগিয়ে পিছনে ছপ ছপ শব্দ হতে বিশু ফিবে চাইল। নিমে সর্দারও ঘাটে আসছে।

বিশু তালকাঠের গুঁড়ির ওপর বসল। সর্দারও বসল পাশ ঘেঁসে।

বুঝলি বিশে, টেঁপী মেয়েটাও ভাল। আরে বাবা, কটা আর কালোয় কি যায় আসে? ছাল ছাড়ালে সবই সমান। কিন্তু মেয়েটা ঠিক মার মতন হয়েছে। মানুষকে যত্ন আত্তি খুব করতে পারে। খুব সেবা পাবি। আর সেইটেই তো সব। মেয়েছেলে ঘরের মানুষকে সেবা যত্ন করবে, তার শরীর গতিকের খোঁজ খবর নেবে, এই তো। আর কি চাই।

বিশু কোন উত্তর দিল না। ঝুঁকে পড়ে মুখ ধুতে লাগল। বেশী সময়ও হাতে নেই। এখনি গুপী লেঠেল আসবে। লাঠি খেলা শুরু হবে।

ঘাটের এ পাশে নেমে নিমে সর্দারও মুখ ধুয়ে নিল। দু'জনে একসঙ্গেই বাড়ী ফিরল।

দাওয়ার ওপরে টেঁপী অপেক্ষা করছিল।

নিমে সর্দার গিয়ে দাঁড়াতেই আবদেরে গলায় বলল, কোন চুলোয় গিয়েছিলে, কখন থেকে দুধের বাটি হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছি?

দাঁড়িয়ে আছিস তো সোনার অঙ্গ খয়ে গেছে নাকি? নিমে সর্দার হাত বাড়িয়ে দুধের বাটিটা টেনে নিল।

দুধের বাটিতে চুমুক দিতে দিতে সর্দার চেঁচাল, টেঁপী, বিশেকে এক বাটি দুধ দিয়ে যা।

টেঁপী চলতে চলতে ফিরে দাঁড়াল। এ আবার কি নতুন ব্যবস্থা। সর্দার ছাড়া দলের কেউ তো দুধের ভাগ পায় না।

টেঁপীর মুখ দেখে সর্দার ব্যাপারটা অনুমান করল।

গলায় কপট গাম্ভীর্য এনে বলল, আজ থেকে বিশেকেও এক বাটি দুধ দিবি। জামাই মানুষ যত্ন আত্তি করতে হবে বৈ কি।

টেঁপী মুখ তুলে বিশুর দিকে চাইল। বিশুও চোখ ফেরাল টেঁপীর দিকে। চোখাচোখি হ'তেই টেঁপী জিভ বার করে বিশুকে দেখাল।

দুধ শেষ করে সর্দার উঠে পড়ল। লুটের মাল ভাগ বাটোয়ারা হবে। ঝঞ্ঝাটের কাজ। রাগারাগি, মন কষাকষি সব এই সময়ে। দলের সবাইকে খুশী করা অসম্ভব, তবে সর্দারের কথার ওপর কথা বলবে এমন বুকের পাটা কারুর নেই।

সর্দার পুকুরের পাড় দিয়ে ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যেতেই টেঁপী এসে বিশুর পাশে বসল।

আজ রাত্তিরে তো খুব ধুম।

কিসের ?

মন্দিরে পুজো হবে। কালী পুজো।

কালীপুজো, এখন ?

কাল বেশ ভাল রোজগার হয়েছে, সেই জন্য পুজো দেবে সর্দার।

ভাল রোজগার ?

হ্যা, কাল জাঁদরেল শিকার জুটেছিল। অনেক টাকা পয়সা গহনা গাঁটি পেয়েছে। আজ ভাগ হবে। আমি আগে থেকে সর্দারকে বলে রেখেছি, ভাল দু একটা গহনা আমার চাই।

কার সর্বনাশ হ'ল ? দুধের বাটিতে দু একবার চুমুক দিয়ে বিশু

হাত দিয়ে সরিয়ে দিল। অনভ্যাসের ফোঁটা। দুধ মুখে ঠেকলেই শরীরটা ঘুলিয়ে ওঠে।

কি হ'ল, দুধের বাটি সরিয়ে রাখলে কেন?

ভাল লাগছে না।

ভাল লাগছে না? রাঙী গাইয়ের টাটকা দুধ। ক্ষীর ফেলে লোকে এ দুধ খায়, আর তোমার মুখে রুচল না?

না, না, দুধ ভাল। এত ভাল জিনিস আমার খাওয়া অভ্যাস নেই কিনা তাই। খুড়োর বাড়ীতে শুধু ডাল আর ভাত, বড় জোর সজনের চচ্চড়ি জুটত, দুধ দুইতাম, কিন্তু পেটে দিই নি কোনদিন।

দুধের বাটি সরিয়ে রাখতে টেঁপী চটেছিল কিন্তু বিশুর অকপট স্বীকৃতিতে তার মন ভিজে গেল।

বিশুর কাছে বসে টেঁপী বলল, অনেকে শুধু দুধ খেতে পারে না। একটু মুড়ি ফেলে দিই বরং, তাহ'লে আর খুব খারাপ লাগবে না।

কথা শেষ করেই টেঁপী ঘরের মধ্যে থেকে মুড়ির ধামা বের করল। উপুড় করে দিল দুধের বাটির মধ্যে।

এবার খেতে বিশুর খুব খারাপ লাগল না। খেতে খেতেই পুরানো কথার খেই ধরল।

কাল রাত্তিরের শিকারের কথাটা বললে না?

বলছি। টেঁপী আবার বিশুর কাছে সরে বসল। শাড়ির আঁচলটা আঙুলে পাকাতে পাকাতে বলল, মুন্নাবাঈ ফিরছিল শহরে। বছরে একবার করে বেরোয়। তিন চারটে জায়গায় গান শেষ করে শহরে ফিরে যায়। অন্যবার নৌকায় যায়। সর্দারের দল অনেক চেষ্টা করেও সুবিধা করতে পারে নি, তবে তক্কে তক্কে ছিল। এতদিন পরে সুযোগ জুটে গেল।

তুমি শুনলে কোথা থেকে?

রমাই বলছিল।

রমাই, রমাই আবার কে?

ওই যে চর সেজে মুন্নাবাঈয়ের পালকির সঙ্গে সঙ্গে আসছিল। সেই তো চকদিহির চটিতে গিয়ে বাঈজির লোকেদের বুঝিয়েছিল। জলে ডাকাতদের ভয় বেশী। পর পর তিনটে নৌকা লুট হয়ে গেছে। টাকাপয়সা তো গেছেই, মানুষ-জনকেও নিকেশ করে দিয়েছে। বজরায় যাওয়া ঠিক নয়।

সর্বনাশ, তবে উপায়? বাঈজির দলের লোকেরা মাথায় হাত দিয়ে পড়েছিল।

সর্বনাশ আবার কিসের, রমাই অভয় দিয়েছিল। কোপাইচণ্ডীর জঙ্গল দিয়ে গেলে খুব সোজা। রাত থাকতে উঠে বেরোতে পারলে সন্ধ্যার আগে রতনপুরের চটিতে এসে পৌঁছোতে পারবে। সেখানে অঢেল গরুর গাড়ী পাওয়া যায়। হাটবারে তো কথাই নেই।

খবর শুনে বাঈজি রমাইকে ডেকে পাঠিয়েছিল। মুন্নাবাঈয়ের নাম শুনেছিল রমাই, দেখল এই প্রথম।

সারা তাঁবু যেন আলো করে বসে আছে বাঈজি। দু পাশে দুজন ঝি বাতাস করছে। ঝলমলে পোশাক, জরির কাজ করা। মাথায় ফিকে সবুজ ওড়না। রমাইকে দেখে ওড়নাটা মুখে টেনে দিয়েছিল, কিন্তু দেখতে রমাইয়ের অসুবিধা হয় নি। লাল টুকটুকে রং, কালো টানা দুটি চোখ, একমাথা কোঁকড়ানো চুলের রাশ।

তুমি কোপাইচণ্ডীর পথ চেন?

রমাই আভূমি সেলাম করেছিল, চিনি বেগমসায়েবা।

বাণেশ্বরীতে ডাকাতি হচ্ছে কি করে জানলে?

আজ্ঞে, রামনগরের চৌধুরীরা যাচ্ছিলেন, সঙ্গে এক যোড়া বন্দুকও ছিল, কিন্তু আটকাতে পারেন নি। মাঝরাতে হৈ হৈ করে বজরায় লোক ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। বল্লম দিয়ে পাটাতনের ওপর রাখা বাতিটা ভেঙে চুরমার করে দিয়ে লুটপাট আরম্ভ করেছিল।

চৌধুরীর ছোট ছেলে বন্দুক নিয়ে তেড়ে এসেছিল, কিন্তু বন্দুক ছোঁড়বার আগেই শড়কীর ফলায় গিঁথে গিয়েছিল।

স্পষ্ট দেখতে পেল রমাই, মুন্নাবাঈ শিউরে উঠল।

তারপরে জোড়াপুকুরের গুড়ের কারবারী দামোদর বসাকেরও সব গেছে। দামোদর লাঠি হাতে বাধা দিতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু রামদার ঘায়ে দু খণ্ড হ'য়ে—

থাক, আর শুনতে চাই না। মুন্নাবাঈ হাত নেড়ে বারণ করেছিল, তারপর পাশে দাঁড়ানো কর্মচারীর সঙ্গে ফিসফাস করে কি পরামর্শ করে আবার রমাইকে জিজ্ঞাসা করেছিল, কিন্তু জলপথে তো আগে এত ডাকাতি হ'ত না?

রমাই ঘাড় নেড়েছে, না, আগে কখন হয় নি, কিন্তু ইদানীং কতকগুলো চর জেগে উঠেছে বাণেশ্বরীর বুকে। সেগুলোই ডাকাতের আস্তানা হয়ে উঠেছে।

তুমি আমাদের সঙ্গে করে নির্বিঘ্নে রতনপুরের চটিতে পৌঁছে দিতে পারবে?

চেষ্টা করব, তবে সবই মহামায়ার ইচ্ছা।

তুমি যদি বিনা বিপদে আমাদের রতনপুরে পৌঁছে দিতে পার তো দশ আশরফি বখশিশ দেব।

বমাই আবার মাথা নিচু করে সেলাম করেছিল।

তারপর? শুনতে বিশুর খুব ভাল লাগছে।

তারপর আর কি, রমাই মুন্নাবাঈয়ের পালকির পাশে পাশে আসছিল, বেলা পড়তেই ভান করল যেন পথ হারিয়ে গেছে। এদিক ওদিক ঘুরল মিছামিছি, তারপব অন্ধকার হ'তেই ছুটকে এসে দলকে খবর দিল।

বিশুর দু চোখে উদগ্র কৌতূহল। এক নিশ্বাসে টেঁপীর কথাগুলো শুনতে লাগল।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সব শেষ। টাকাকড়ি অলঙ্কার সব মিলিয়ে অনেক। এত জিনিস যে পাওয়া যাবে তা দলের লোকেরাও ভাবে নি।

খুন জখম হয় নি কেউ?

হয়েছিল নিশ্চয়! যারা বাধা দিতে এসেছিল, তারা নিশ্চয় সাবাড় হয়েছে। তবে শুনলাম, ডাকাতের দল পড়তেই মুন্নাবাঈ নিজে এগিয়ে এসেছিল সর্দারের সামনে। টাকা পয়সা গহনাগাঁটি সব ফেলে দিয়ে প্রাণভিক্ষা চেয়েছিল।

কি হ'ল মুন্নাবাঈয়ের?

কিছুই হ'ত না। স্বচ্ছন্দেই সবাই প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারত, সর্দারেরও তাই হুকুম ছিল, কিন্তু রমাই মুন্নাবাঈয়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই, কেলেঙ্কারী হয়ে গেল।

কেলেঙ্কারী?

হ্যা, কেলেঙ্কারী বই কি। রমাইকে দেখেই মুন্নাবাঈ চটে আগুন। রমাইয়ের মুখের ওপর থুতু ফেলে বাঈজি চেঁচিয়ে উঠল, নেমকহারাম, বেইমান। ব্যস, গোলমাল শুরু হয়ে গেল। মারপিট। মুন্নাবাঈকেও খতম করে ফেলত, শুধু সর্দার বাঁচিয়ে দিল।

সর্দার বাঁচিয়ে দিল? কেন?

সর্দার কথা দিয়েছিল, টাকাপয়সা সব দিয়ে দিলে বাঈজির কোন ক্ষতি করবে না, তাই নিজে সঙ্গে করে তাকে রতনপুরেব চটিতে পৌঁছে দিয়ে এল। তা ছাড়া মুন্নাবাঈকে প্রাণে মারা উচিতও হ'ত না।

কেন?

অত বড় গাইয়ে আমাদের দেশে আর আছে? দেশ বিদেশের আসর থেকে ডাক আসে। কত বড় ঘরের মেয়ে।

খুব বড় ঘরের মেয়ে বুঝি?

হ্যা, ওর এক নানীর মা নবাবের হারেমে ছিল। বিখ্যাত সুন্দরীর গুষ্ঠি। রমাইয়ের মুখে থুতু দিলে কি হবে, রমাই তার রূপে একেবারে মজে গেছে। আমায় বলছিল, সর্দার বাধা না দিলে ঠিক বাঈজিকে নিয়ে নিজের আস্তানায় তুলত।

বিশু কি একটা উত্তর দিতে গিয়েই থেমে গেল। একজন ছুটতে ছুটতে উঠানের মাঝখানে এসে দাঁড়াল।

ওস্তাদ ডাকছে।

ওস্তাদ! বিস্মিত দৃষ্টি মেলে বিশু চেয়ে রইল।

গুপী লেঠেল ডাকছে তোমায়। লাঠি খেলা শিখতে হবে না? বিশুর দিকে চেয়ে টেঁপী বলল।

বিশু আর দেরী করল না। ছুটতে ছুটতে লোকটার সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

লোক খুব কম, বড় জোর জন চারেক। ইতস্তত দাঁড়িয়ে রয়েছে। মাঝখানে লাঠি হাতে গুপী।

বিশু যেতেই খেলা শুরু হ'ল। নতুন কয়েকটা প্যাঁচ শেখান হ'ল, তাবপর গুপী বিশুকে কাছে ডাকল।

বিশু, দেখি তোর মুরদ, আমার হাত থেকে লাঠিটা কেড়ে নে দেখি।

বিশু প্রাণপণ চেষ্টা করল লাঠি কেড়ে নেবার, কিন্তু পারল না। প্রত্যেকবারই গুপীর ঝাঁকানিতে ছিটকে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দলের অন্য লোকগুলো 'দূয়ো বিশে' বলে চেঁচিয়ে উঠল।

গুপী হাসল, কি মরদ কি হ'ল?

হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছে বিশু আবার গুপীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

প্রায় ঘণ্টা খানেকের ওপর এই চলল। লাঠি কেড়ে নেওয়ার কসরতও গুপী শেখাল। কি করে কব্জি চেপে ধরে পাঁজরে গুঁতো দিয়ে মুষ্টি শিথিল করতে হয়, তার কায়দা।

লেঠেল গুপী থামতেই দলের সবাই গোল হয়ে বসল।

বিশুই প্রথম কথা বলল, কি ব্যাপার, লোক আজ এত কম যে?

দলের আর একজন ছোকরা দয়াল, বয়সে প্রায় বিশুর মতনই হবে, ইসারায় বিশুকে পাশে ডেকে বলল, কালকে বড় কারবার হয়েছে যে, তারই ভাগের ব্যাপারে সব ব্যস্ত। সোনার জিনিস পশুপতি স্যাকরার কাছে পৌঁছে দিতে হবে তো। তাড়াতাড়ি গালিয়ে না ফেললেই বিপদ। ওসব জিনিস ঘরে রাখতে আছে।

কেন রাখলে কি হবে?

হাতে দড়ি পড়বে, আর কি হবে।

কে দড়ি পড়াবে?

দয়াল হাসল, রাজার বেহাই, আবার কে। বাঈজিই কি আর এমনি ছাড়বে। সেপাই সান্ত্রীদের ঠিক খবর দেবে। সেই জন্যই তো সর্দারের হুকুম আজ রাতে কালীপূজো হ'য়ে গেলেই সবাই এদিক ওদিক গা ঢাকা দেবে। ছিটকে পড়বে নানাদিকে। এখন কিছুদিন শিকার বন্ধ।

বিকেল থেকেই তোড়জোড় শুরু হল। বিশু দাওয়ায় বসেছিল, সর্দার এসে পাশে দাঁড়াল।

নে বিশে, এ গুলো পরে নে।

কথার সঙ্গে সঙ্গে বিশুর কোলের ওপর নতুন লালপাড় একটা ধুতি, গেরুয়া রঙের পিরান আর লাল রঙের একটা কোমরবন্ধ ফেলে দিল।

বিশু নতুন পোশাক পরে নিল। বাইরে এসেই দেখল নিমে সর্দার দাঁড়িয়ে। পরনে একই পোশাক। বাড়তির মধ্যে কেবল কপালে জড়ান লাল কাপড়ের একটা ফেট্টি।

দুজনে রওনা হ'ল। একটু এগিয়েই বিশু অবাক। দলে দলে

লোক চলেছে। শুধু ওদের দলের লোক, সব এক পোশাক্। মাঝে মাঝে ভাষণভাবে চিৎকার করছে। কালীমায়ের জয়ধ্বনি, নিমে সর্দারের জয়ধ্বনি।

কালীবাড়ীর কাছাকাছি পৌঁছে বিশু আরো আশ্চর্য হ'য়ে গেল। মশালের আলোয় জায়গাটা দিনের মত পরিষ্কার। ছুঁচ পড়লে কুড়িয়ে নেওয়া যায়। জয়ঢাক আর রামশিঙার শব্দে কান পাতা দায়। মন্দিরের ওপাশে চিক ফেলা। তার পিছনে অনেকগুলো মেয়েছেলের অস্পষ্ট আভাস। মাঝখানে হাঁড়িকাঠ। সিঁদুর মাখানো। আরো একটু দূরে বটগাছের তলায় এক পাল ছাগল বাঁধা। তাদের আর্তস্বর বাজনার আওয়াজে চাপা পড়ে গেছে।

নিমে সর্দার গিয়ে পৌঁছতেই দলের সবাই চিৎকার করে তাকে ঘিরে দাঁড়াল। পায়ের ধুলো নেওয়া আর কোলাকুলি শুরু হ'ল। অনেকে বিশুকেও বুকে জড়িয়ে কোলাকুলি করল।

দলের পিছন পিছন বিশু মন্দিরের মধ্যে ঢুকল।

জবাফুলের মালায় মূর্তি চাপা পড়ে গেছে। কাঁসর ঘণ্টার শব্দ। নৈবেদ্যর সামনে পুরোহিত বসে। নিমে সর্দার পুরোহিতের পাশে গিয়ে বসল।

এদিক ওদিক দেখে বিশু বেরিয়ে পড়ল। গাছের তলায় তলায় লোকদের জটলা।

বিশু একটু এগোতেই কে একজন ডাকল, এই বিশে, এদিকে আয়।

বিশু আওয়াজ অনুসরণ করে কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

গুপী লেঠেলকে ঘিরে একদল গোল হয়ে বসেছে। দয়াল, রমাই, নেত্য, পশুপতি সব রয়েছে। বিশুও গিয়ে পিছনে বসল।

কালীঠাকুরের কথা হচ্ছে। জাগ্রত কালীমূর্তি। অনেক পুরানো। গুপী লেঠেল বলছে, আর সবাই শুনছে।

অনেককাল আগের কথা। তখন বাণেশ্বরী আরো চওড়া ছিল। এপার ওপার দেখা যেত না। বড় বড় পালতোলা নৌকা যেত এই নদীর মধ্য দিয়ে। ভারি ভারি মাল নিয়ে। সেই সময় জলদস্যুর হাঙ্গামা ছিল খুব। এদেশী ডাকাত নয়, পর্তুগীজ। লাল মুখ, লাল চেহারা, যেন ইস্পাত দিয়ে গড়া। তাদের আস্তানা ছিল এই সব জলে জঙ্গলে, নদীর পারে পারে। টাকাকড়ি ধনদৌলত সব তারা মাটির মধ্যে পুঁতে রাখত। আজকাল চাষারা মধ্যে মধ্যে লাঙল চালাতে চালাতে মোহর ভরা ঘড়া, প্যাঁটরা ভরা গহনা লাঙলের ফলায় পেয়ে যায়। এইসব জলদস্যুরা এদেশী মেয়েকে বিয়ে থাও করতে লাগল। এদেশী দেবদেবীরও পূজা করতে আরম্ভ করল। তারাই এই কালী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে। আগে বিরাট মন্দির ছিল, তা আজকের কাঠামো দেখে কতকটা আন্দাজ করা যায়। কে একজন পর্তুগীজ বুঝি অবিশ্বাস করেছিল। রাতারাতি কালীমূর্তি সরিয়ে ফেলতে চেষ্টা করেছিল, মূর্তি তো নড়াতে পারেই নি, উপরন্তু সকালে সবাই দেখল মন্দিরের চাতালের ওপর লোকটা অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে, দু হাত ভর্তি কুষ্ঠ।

কথার সঙ্গে সঙ্গে গুপী মন্দিরের দিকে চেয়ে দু হাতযোড় করল।

মা, মা, কালী করালবদনী।

গুপীর দেখাদেখি সবাই হাতযোড় করল।

এক ফাঁকে দয়ালকে কাছে ডেকে বিশু জিজ্ঞাসা করল, দয়াল আজ-রাতে এত হৈ চৈ করাটা কি ঠিক হচ্ছে?

প্রথমবার দয়াল বোধ হয় কথাটা ভাল করে শুনতেই পায় নি, বিশু আবার বলতেই সে জিজ্ঞাসা করল, কেন, এ কথা বলছিস কেন?

মানে, এই জন্য বলছি, বাঈজি যদি সিপাই বরকন্দাজ নিয়ে হাজির হয় এখানে, দলকে দল ধরে ফেলবে যে?

দয়াল খুব জোরে হেসে উঠল, তারপর হাসি থামিয়ে বলল, তোর

মাথা খারাপ বিশে। সে সব বন্দোবস্ত সর্দার ঠিক করে রেখেছে। শহরে পৌঁছতে বাঈজির আরো দশ দিন, তার কম নয়।

দশ দিন!

হ্যা, তা হবে বৈকি। আমাদের চর তার পিছু নিয়েছে। তেমন কিছু দেখলে ঠিক খবর পাঠাবে। তা ছাড়া সিপাইয়ের সাহস নেই, এ আড্ডায় মাথা গলাবে। মাঝে মাঝে কোপাইচণ্ডীর জঙ্গলের ধারে দু একটা ফাঁকা আওয়াজ করে চলে যায়।

হঠাৎ সামনে সোরগোল উঠল। মন্দিরের চাতালে নিমে সর্দার এসে দাঁড়িয়েছে। দু পাশে সাঙ্গ পাঙ্গ। সকলের গলায় জবার মালা। কপালে আধুলি পরিমাণ সিঁদুরের টিপ।

গুপী লেঠেলও উঠে দাঁড়াল।

একটু এগিয়ে যাই, এবাব মায়ের বলি আরম্ভ হবে।

শুধু গুপী নয়, সমস্ত দলটাই এগিয়ে বসল। হাঁড়িকাঠের চার-পাশে। বাজনার শব্দ আরো জোর। দশ বারো জন পাঁঠাগুলোকে টানতে টানতে নিয়ে এল। আকাশে বাতাসে উন্মত্ত কোলাহল। সমস্ত আওয়াজ ছাপিয়ে পাঁঠার অন্তিম চিৎকার শোনা গেল। রাত্রের আকাশকে চিরে দিল আর্ত্ত কণ্ঠ।

গোটা তিনেক পাঁঠা বলি হবার পরেই বীভৎস কাণ্ড শুরু হ'ল। সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ল হাঁড়িকাঠের ওপর। নিচু হয়ে রক্তের স্রোতে আঙুল ডুবিয়ে নিজেদের কপালে ফোঁটা কাটতে আরম্ভ করল।

কালীপূজা বিশু আগেও দেখেছে। গোবিন্দপুর বৈষ্ণবপ্রধান পাড়া। গাঁয়ের দেবতা শ্যামসুন্দর আর রাধা-গোবিন্দজী। সেখানে বলি হ'ত না। কিন্তু পাশের পাড়া চন্দনপুরেব রক্ষাকালী বিখ্যাত। দু একবার খুড়িদের পাল্কির সঙ্গে সঙ্গে বিশু গিয়েছে রক্ষাকালীতলায়। সেখানে পাঁঠা বলি হ'ত। পাঁঠা বলির পরে কয়েকজন এই ভাবেই ছুটে গিয়ে পাঁঠার রক্ত কপালে মেখে নিত, কিন্তু আজকের পরিবেশ

আরো ভয়াবহ। চারপাশে বিরাট গাছের সার। মানুষ সমান উঁচু মশাল জ্বলছে, মাঝখানে নররক্তলোলুপ দানবের পাল। জীর্ণ মন্দির, অনেক বছরের শ্যাওলা আর ফাটল মন্দিরের অঙ্গে অঙ্গে। সব মিলিয়ে যেন আদিম পরিস্থিতি।

বিশুর সমস্ত শরীর ঘুলিয়ে উঠল। পিছু হেঁটে হেঁটে একটা গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়াল।

হঠাৎ কপালে একটা স্পর্শ লাগতেই বিশু চমকে চোখ খুলল। নিমে সর্দার সামনে দাঁড়িয়ে আঙুল দিয়ে বিশুর কপালে রক্তের ফোঁটা দিয়ে দিল। কপাল বেয়ে রক্ত গড়িয়ে তার গালে, চিবুকে, পিরানের ওপর টপ টপ করে ঝরে পড়ল।

রক্তের দিকে চোখ ফিরিয়েই বিশু হাঁউ মাউ করে কেঁদে উঠল। তার এত দিনের শুচিতা, জীবনের ধারা এই রক্ততিলকের স্পর্শে এক মুহূর্তে যেন পালটে গেল। সামনে দাঁড়ান ডাকাতদের সঙ্গে আর তার যেন কোন প্রভেদ নেই, কোন ব্যবধান নয়।

নিমে সর্দার আশ্চর্য হয়ে গেল। ভয় পেয়েছে বিশেটা। প্রথম প্রথম এমন হয়। পাঁঠা বলি দেখে অনেকে ভয় পায়, কেঁদে ওঠে।

সর্দার পাশে দাঁড়ান একজনকে ইশারা করল তারপর বিশুর একটা হাত ধরে তাকে টেনে বসাল নিজের কাছে।

মিনিট পাঁচেক, তারপরই লোকটা দু হাতে দুটো ভাঁড় নিয়ে এসে নিমে সর্দারের সামনে রাখল। নিমে সর্দার একটা ভাঁড় নিজে তুলে নিল আর একটা বিশুর হাতে দিল। বলল, নে খেয়ে নে, মায়ের প্রসাদ, সব ঠিক হয়ে যাবে।

আধ অন্ধকারে বিশু অতটা খেয়াল করে নি, সে ভেবেছিল চরণামৃত কিন্তু মুখ বরাবর তুলেই নাক সিঁটকে তাড়াতাড়ি ভাঁড়টা মাটিতে নামিয়ে রাখল।

এ গন্ধ তার পরিচিত। পঞ্চানন চক্রবর্তীর মুখে বহুদিন এ গন্ধ

সে পেয়েছে। সে রাতে জমিদার প্রতাপ নন্দীর কাছে যেতে এ রকম গন্ধই যেন পেয়েছিল।

বিশু ভাঁড়টা মাটিতে রাখতেই সর্দার হুঙ্কার ছাড়ল, কিরে, বিশে মায়ের প্রসাদ মাটিতে নামিয়ে রাখলি যে ?

কেমন গন্ধ।

চোপ। সর্দারের গর্জনে গাছের পাতাগুলো পর্যন্ত যেন থরথরিয়ে কেঁপে উঠল। বলি দেবার জন্য যে লোকটা খাঁড়া তুলেছিল, সে হকচকিয়ে থেমে গেল।

নে, তুলে নে।

আর একটুও দেরী করল না বিশু। সঙ্গে সঙ্গে ভাঁড়টা তুলে নিয়ে গালে ঢেলে দিল। মনে হ'ল গলা দিয়ে যেন তরল আগুনের স্রোত নেমে গেল। জিভটা অসাড়। মাথায় তীব্র যন্ত্রণা।

ভাঁড়টা নামিয়ে রাখবার আগেই পাশে দাঁড়ান কে একজন ভাঁড়টা ভর্তি করে দিল।

কালী মায়ীকি জয়। সর্দার চিৎকার করে নিজের ভাঁড়টা মুখে তুলল। আশে পাশে বসা সবাই তাই করল। এমন কি বিশুও।

তারপরে আর কিছু বিশুর মনে নেই। গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে চুপচাপ পড়ে রইল।

অনেকক্ষণ পর। বিশুর মনে হ'ল পুরো একটা যুগ। আচমকা পিঠে ধাক্কা লাগতেই বিশু ফিরে চাইল, তারপর অনেকক্ষণ আর চোখ ফেরাতে পারল না।

চওড়া লাল পাড় শাড়ি পরনে, এলো চুলের গোছা বুকে পিঠে ছড়ানো, কপালে সিঁদুরের টিপ, গলায় জবার মালা। টেঁপীকে নেশার চোখে যেন হাজার গুণ সুন্দরী মনে হ'ল বিশুর।

টেঁপী একটা হাত বাড়িয়ে বিশুর একটা হাত ধরল তারপর ইশারায় তাকে উঠতে বলল।

টেঁপীর একটা হাত আঁকড়ে ধরে বিশু সোজা হ'য়ে দাঁড়াল। দুটো পা ভীষণ টলছে। সামনের গাছপালাগুলোও দুলছে বাঁ দিক থেকে ডানদিকে। মশালের আলোগুলোও কাঁপছে।

কোথায় যাব ?

এস না।

টেঁপী এগিয়ে এগিয়ে চলল। বিশু পিছন পিছন।

একটু দূরেই রাংচিতা আর ঘেঁটু বন। বেশ অন্ধকার। সেখানে টেঁপী বসল। পাশে বিশু।

সর্দার কোথায় ? বিশুর গলা অল্প জড়ানো।

সর্দারের এখন হুঁস নেই। ভাঁড় আর কড়ি নিয়ে বসেছে। জুয়োখেলা শুরু হয়েছে।

দেখ না, আমায় যা তা কি সব গিলিয়ে দিলে, শরীরটা এমন খারাপ লাগছে।

ছি, বলতে নেই, মহাপ্রসাদ। সবাইকেই খেতে হয় আজকের দিনে। এতে শরীর খারাপ হয় না, ভালই হয়। ক ভাঁড় তুমি খেয়েছ ?

দু ভাঁড় তো মনে পড়ছে, তারপর কত ভাঁড় এরা দিয়েছে জানি না।

কাল ভোরে তোমায় লেবুর জল করে দেব। খেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

টেঁপী একটা হাত বিশুর হাঁটুর ওপর রাখল। মুখটা বিশুর মুখের কাছে এনে বলল, আমি তোমায় খুঁজে খুঁজে হয়রান। শেষকালে সর্দার বলল গাবগাছের তলায় বসে আছ।

তোমার এ সব ভাল লাগে ? হঠাৎ বিশুর মনে হ'ল নেশাটা যেন আস্তে আস্তে কেটে যাচ্ছে।

কি সব ?

এই পাঁঠা বলি, মানুষ খুন, ভাঁড়ের রস খাওয়া ?

টেঁপী হঠাৎ কোন উত্তর দিল না, তারপর আস্তে আস্তে বলল, পাঁঠা বলি তো মার পূজো, ওটা খারাপ বললে পাপ হবে যে।

কিন্তু এই সব ডাকাতি, মানুষের সর্বনাশ ?

বিশুর গলার স্বরে টেঁপী চমকে উঠল। কোপাইচণ্ডীর জঙ্গলে টেঁপী এমন সুর আব শোনে নি। এমন কথাও কেউ বলে নি। এ কথার উত্তর টেঁপীর জানা নেই, কিন্তু মশালের আলোয় চিক চিক করে ওঠা দু চোখের দৃষ্টি, আলো আর অন্ধকার মেশানো মুখ থেকে এ ধরনের কথা শুনতে ভালই লাগল টেঁপীর। যে কথা কেউ কখনো বলে নি, বলতে সাহস করে নি, বিশু সেই কথা বলছে।

শাড়ির পাড় দিয়ে টেঁপী নিজের পা দুটো ঢাকল, একটা ঘাসের শিষ নিয়ে মুখে পুরল, তারপর আস্তে আস্তে বলল, ভাল না লাগলে কি কবছি বল ? পড়েছি যবনের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে।

সর্দারের লোক যে চারদিকে ছড়ানো, নয়তো ঠিক আমি তোমায় নিয়ে কোথাও পালিয়ে যেতাম।

টেঁপী চমকে উঠল। দুটো হাত দিয়ে বিশুর হাঁটুটা আঁকড়ে ধরল। আবো সরে এল বিশুর দিকে। আস্তে আস্তে বলল, তা হ'লে বেশ হ'ত সত্যি। দুজনে অনেক দূরে কোথাও চলে যেতাম। দলের কেউ আমাদের খোঁজ পেত না।

হঠাৎ ঘণ্টার শব্দ। টেঁপী নিজেকে ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়াল।

চল, এবার খেতে বসবে সবাই।

বিশু উঠল। ফুরফুরে হাওয়ায় নেশা বেশ জমে উঠেছে।

চিকের আড়ালে ওরা কারা ?

দলের আর সকলের বৌ ছেলেপুলে।

তুমি .চিকের আড়ালে যাও নি যে ?

টেঁপী খিল খিল করে হেসে উঠল, বাবা, বিয়ের আগেই যে

শাসন আরম্ভ করলে? আমি সর্দারের মেয়ে, আমি চিকের আড়ালে যাব কোন দুঃখে!

মন্দিরের কাছাকাছি এসে দুজনে দুদিকে চলে গেল।

মাঠের ওপর শালপাতা নিয়ে সার সার সবাই বসে গেছে। বিশুও একপাশে বসে পড়ল। একেবারে মাঝখানে সর্দার। পাশে গুপী লেঠেল।

খাওয়া দাওয়া শেষ করে যখন সবাই উঠে দাঁড়াল তখন ভোর হয়ে এসেছে। গাছের ডালে ডালে দু একটা পাখীর কিচির মিচির শোনা গেল।

শুধু লাঠি খেলা নয়, বিশু ছোরাখেলাও শিখল। মন্দ লাগছে না এ জীবন! লোকালয়ে ফিরতে আর ইচ্ছা করছে না। এখানকার মানুষদের মনে অন্তত দয়া মায়া আছে। দলের লোকদের ওপর অসীম মমতা। একজনের বিপদ হ'লে দশজন ছুটে আসে।

একবার বিশুর একটা হাতে বিছেয় কামড়ে দিয়েছিল। একরাশ জড়ো করা বাঁশের মধ্যে থেকে একটা ভাল বাঁশ বাছছিল, হঠাৎ কব্জিতে অসহ্য যন্ত্রণা। বিশু প্রথমে ভেবেছিল সাপ। চিৎকার করে উঠতেই, দয়াল আর নেত্য কাছে বসে ছোরায় শান দিচ্ছিল, তারা ছুটে এল। নেত্য চূণ লেপে দিল, আর দয়াল কি একটা গাছের পাতা চিবিয়ে কব্জিতে লাগিয়ে দিল। যন্ত্রণা কমল না। বিশু ছটফট করতে লাগল।

বিশুকে পাঁজাকোলা করে দয়াল যখন উঠানে এসে দাঁড়াল, সর্দার বসে বসে সিদ্ধির বাটিতে চুমুক দিচ্ছিল। ব্যাপার দেখে লাফিয়ে উঠল।

কি হ'ল কি?

বিছেয় কামড়েছে বোধ হয়।

সর্দার নিচু হ'য়ে ক্ষতস্থানটা দেখল তারপর দয়ালের দিকে ফিরে বলল, কি বিছে?

তেঁতুলে বিছে। নেত্য মেরে ফেলেছে। একেবারে পাকা জাতের।

দিন দুয়েক বিশু শুয়েছিল, কিন্তু এ কদিনে দলের প্রায় সবাই এসে দেখে গিয়েছিল। টেঁপী তো কাছ ছাড়াই হয় নি। অনেক বলে বলে তবে স্নান আহার করতে যেত।

শুয়ে শুয়ে বিশু নরহরি মুখুজ্জের কথা ভেবেছে। এরা তো পর, রক্তের সম্পর্ক দূরে থাক, কোন সম্পর্কই নেই। কিন্তু নরহরি মুখুজ্জে একেবারে অনাত্মীয় নয়, লতায় পাতায় একটা সম্পর্ক ছিল। অথচ আপদে বিপদে ফিরেও চায় নি। নরহরি মুখুজ্জে তো নয়ই, খুড়িরাও নয়। অন্য সকলের একটু অসুখে অনঙ্গ কবিরাজকে ডাক পড়েছে। দরকার হ'লে দিনে দুবার, কিন্তু বিশুর জ্বরজ্বারি হ'লে খুড়িরা বলেছে, ঢং, গা একটু গরম হ'লেই নবাবপুত্তুরের কাজে কামাই। কথায় কথায় বদ্যি ডাকবার আমাদের ক্ষমতা নেই।

শুধু কি নরহরি মুখুজ্জেরা! কুমুও শেষদিনে তার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছে, সে জীবনে ভুলবে না। বিশুর তিল তিল করে গড়ে তোলা ধারণা একেবারে পাল্টে দিয়েছে। লোকালয়ের মানুষগুলোর মনে দয়ামায়া কিছু নেই। স্বার্থপর, কেবল নিজের কোলে সবাই ঝোল টানে। কি করে পরের সর্বনাশ কববে দিনরাত তাবই ফন্দী আঁটে।

সেরে ওঠার দিন দুয়েক পরেই ব্যাপারটা ঘটল। ছোরা খেলা শেষ করে বিশু বসেছিল দলের আর সবাইয়ের সঙ্গে।

ছোরাখেলা শেখাত বসির মিঞা। বাঁ হাতটা কাটা। কিন্তু একটা হাতেই অসাধ্য সাধন করে। ছোরাটা যখন এদিক ওদিক চালায় মনে হয় যেন বিদ্যুতের ফুলকি।

বলাই এসে পাশে দাঁড়াল, এই বিশে, শোন।

বিশু মুখ তুলে চাইল। বলাইয়ের দু চোখ লাল। চুলগুলো উস্কো খুস্কো। পা দুটোও বেশ টলছে। সাতসকালে উঠেই বুঝি নেশা শুরু করেছে।

বলা যায় না বিশুকেও হয়তো দলে টানবে। ঝোপের মধ্যে ভাঁড় নিয়ে বসবে। সামনে শালপাতায় ছোলাভাজা। আজকাল মাঝে মাঝে বিশু ভাঁড়ে চুমুক দেয়। মন্দ লাগে না। শরীরটা চাঙ্গা হ'য়ে ওঠে, কিন্তু সব সময় নেশাভাং তার ভাল লাগে না।

তাই সে বসে বসেই বলল, কি বল না ? আর উঠতে পারছি না।

শোন, দরকারি কথা আছে।

বিশু উঠে দাঁড়াল। ছোরাটা কোমরে গুঁজে বলল, কি বল ?

আয়, এদিকে আয়।

বলাই ঝোপের পাশ দিয়ে আরো গভীর জঙ্গলের দিকে রওনা হ'ল।

একটু এগিয়েই বিশু থেমে গেল, নেশাটেশা এখন কবতে পাবব না, তা বলে দিচ্ছি।

না, না, নেশা নয়। অন্য কথা আছে, আয়।

ভাল করে বিশু বলাইয়েব দিকে চেয়ে চেয়ে দেখল। এমনি বলাই বিশুর সঙ্গে কম কথা কয়। নিতান্ত দরকাব না হ'লে কাছেই আসে না। কিন্তু আজ তার মুখ চোখের চেহারা বেশ গম্ভীব।

খানিকটা গিয়ে বলাই বসল। বাঁশঝাড়। বাতাসে দুলে দুলে বাঁশগুলো করুণ আর্তনাদ তুলছে। তলায় শুকনো পাতার বাশ।

বলাই হাত নেড়ে বিশুকে পাশে বসতে বলল।

কি ব্যাপার ? বিশু পা দিয়ে পাতার বাশ সরিয়ে বসে পড়ল। একেবারে বলাইয়ের পাশে নয়। একটু ফাঁক রেখে, মুখোমুখি।

বলাই কিছুক্ষণ কোন কথা বলল না। একদৃষ্টে চেয়ে রইল বিশুর

দিকে তারপর আস্তে আস্তে বলল, তোর সঙ্গে একটা গোপনীয় কথা আছে বিশে।

গোপনীয় কথা আমার সঙ্গে? দলের কথা আমার সঙ্গে কেন?

দলের কথা নয়, আমার নিজের কথা।

তোর কথা?

হ্যা, আমার কথা আর টেঁপীর কথা।

বিশু চমকে উঠল। সব কিছু যেন নতুন নতুন ঠেকছে। বলাই আর টেঁপীর আবার কি কথা!

তুই এখানে আসবার আগে টেঁপী আমার ছিল। অনেকদিন থেকে আমাদের জানাশোনা। শুধু আমি বামুন নই বলে, সর্দার আমাদের বিয়েতে রাজী হ'ত না। তাই আমরা ভেবে রেখেছিলাম, সুযোগ সুবিধে বুঝে আমরা দুজনে কোথাও পালিয়ে যাব।

কোথায় পালাবি? যেখানে যাবি নিমে সর্দার চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে আসবে।

ঘন বাঁশপাতার ফাঁক দিয়ে রোদ এসে পড়েছে। সেই রোদে বিশু স্পষ্ট দেখতে পেল, বলাইয়ের দুটো চোখ যেন জ্বলে জ্বলে উঠল।

বলাই ঠোঁট দিয়ে নিচের দাঁতগুলো চেপে আস্তে আস্তে বলল, পালানোর রাস্তা আমার জানা। আমি দলের লোক, আমাকে কেউ আটকাবে না। তবে টেঁপীকে নিয়েই মুস্কিল। ভেবেছিলাম, ওকেও ব্যাটাছেলে সাজিয়ে কোনরকমে কোপাইচণ্ডীর জঙ্গল পার করে দেব।

টেঁপী তোকে বিয়ে করবে?

এখন করবে কিনা জানি না। তোকে দেখে তার মাথা ঘুরে গেছে। আগে কথা দিয়েছিল।

আমায় কি করতে হবে?

তুই সরে দাঁড়া।

আমি কবে আবার তোর পথ আগলে দাঁড়ালাম?

তুই টেঁপীকে একটু বুঝিয়ে বল। তুই বললেই ও বুঝবে।

বিশু উঠে পড়ল। চলতে চলতে বলল, বেশ, বলব।

বলাই বিশুর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। দুটো হাত দিয়ে বিশুর একটা হাত আঁকড়ে ধরে বলল, তোকে ছুঁয়ে বলছি, মাইরি, টেঁপীকে ছাড়া আমি বাঁচব না।

বিশু আর কোন কথা বলল না। বলাইয়ের হাত ছাড়িয়ে দ্রুত পায়ে চলে গেল।

উঠানে পা দিয়েই টেঁপীর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা।

ছুরিখেলা শেষ হয়েছে তো অনেকক্ষণ? কোথায় ছিলে?

বিশু কোন উত্তর দিল না। মুখ ফিরিয়ে দাওয়ার ওপর গিয়ে উঠল।

পিছন পিছন টেঁপীও উঠল, কি হল, শরীর খারাপ নাকি?

না, গম্ভীর গলায় উত্তর দিয়ে গামছাটা টেনে নিয়ে বিশু খিড়কির পুকুরের দিকে ছুটল।

জলে নেমে বিশুর প্রথম মনে হ'ল। বলাইয়ের কথাটা শোনার পর থেকে তার মনটা খিঁচড়ে গেল কেন? তবে সেও কি ভালবাসে টেঁপীকে? আজকাল অবশ্য টেঁপী কাছে এলে ভাল লাগে। তার সঙ্গে কথা বলতেও মন আনন্দে ভরে ওঠে। অবসর সময়ে মাঝে মাঝে মনেও পড়ে টেঁপীর কথা। এই কি ভালবাসা!

অনেকক্ষণ ধরে বিশু স্নান করল। জল থেকে উঠলেই টেঁপীর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। ছলনাভরা দুটো চোখের দিকে চাইতে হবে। বলাইয়ের কথা টেঁপী ঘুণাক্ষরেও তাকে বলে নি। অথচ আকারে ইঙ্গিতে এমন ভাব দেখিয়েছে যেন তার জীবনে বিশুই প্রথম পুরুষ।

সর্দারের পাশাপাশি বিশু খেতে বসল। পরিবেশন করল টেঁপী। তরকারি দিতে দিতে একবার জিজ্ঞাসা করল, কি শরীরটা খারাপ নাকি?

বিশু কোন উত্তর দেবার আগেই সর্দার কথা বলল, রোজ রোজ ব্যাটাছেলের আবার শরীর খারাপ কিরে? ননীর পুতুল নাকি তুই?

বিশু সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নাড়ল, না, শরীর ঠিক আছে।

তবে, মন খারাপ বুঝি? আঁচলটা মুখে দিয়ে টেঁপী খিল খিল করে হেসে উঠল।

গা যেন জ্বালা করে উঠল বিশুর। মেয়েছেলে সব সমান। খুড়িরা, কুমু, টেঁপী সবাই একরকম। মনের বালাই নেই। মানুষকে যন্ত্রণা দিয়েই আনন্দ পায়।

সর্দারও হো হো করে হেসে উঠল। বিশুর দিকে ফিরে বলল, আর দুটো মাস মনটাকে ঠিক করে রাখ বাবা। এ দু মাস বিয়ের দিন নেই, তারপরের মাসেই টেঁপীর সঙ্গে চার হাত এক করে দেব।

বিশু ঘাড় হেঁট করে রইল। কোন উত্তর দিল না, দিয়েও লাভ নেই।

খাওয়া শেষ করে ঝাঁপ ঠেলে বিশু নিজের ছোট ঘরে গিয়ে ঢুকল। পাটি পেতে মেঝের ওপর শুয়ে পড়ল।

মনে মনে ঠিক করল কথাটা সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করবে টেঁপীকে। লুকোচুরির কি দরকার!

আধঘণ্টার মধ্যে টেঁপী ঘরে এসে ঢুকল। হাতে পানের ডিবে।

টেঁপীর পায়ের শব্দ কানে যেতেই বিশু চোখ বন্ধ করে ঘুমের ভান করল।

টেঁপী কাছ ঘেঁসে বসল। খুব মোলায়েম সুরে বলল, কি করেছি আমি? সেই থেকে মুখ ভার করে রয়েছ?

বিশু চোখ খুলল। টেঁপীর দিকে ভাল করে চেয়ে দেখল। নিরাহ মুখের ভাব। ছলনার আঁচড়ও কোথাও নেই। অবশ্য মুখ দেখে মেয়েদের কতটুকুই বা বোঝা যায়। কুমুর আপাতশান্ত মুখের ভাব দেখে কখন কি বিশু বুঝতে পেরেছিল শেষ দেখার দিন ল্যাজে ভর দিয়ে অমন করে সে ফণা তুলবে?

কি করেছ তোমারই তো ভাল জানবার কথা।

আমার জানবার কথা ?

হ্যাঁ, যদি মনে না থাকে বলাইকে বরং জিজ্ঞাসা ক'রো, মনে করিয়ে দেবে।

পানের ডিবেটা টেঁপী আছড়ে মেঝেয় ফেলল। চড়াসুরে বলল, কি, কি বলেছে বলাই ?

কি বলতে পারে তুমি জানো না ?

কি ন্যাকামী করছ। সোজা কথাটা বলতে তুমিই বা অত ঢোঁক গিলছ কেন ?

টেঁপীর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বিশু সোজা হয়ে উঠে বসল। গলায় ব্যঙ্গের বিষ ঢেলে বলল, আমি আসবার আগে বলাইয়ের সঙ্গে কি সম্পর্ক ছিল তোমার ?

কি সম্পর্ক ছিল ? টেঁপীর দুটো চোখ জ্বল জ্বল করে উঠল।

বলাইয়ের সঙ্গে দেখা হলে জিজ্ঞাসা ক'রো।

না বলাই নয়, তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই।

বলাই আজ আমায় বলেছে। বলেছে, আমি না এলে তুমি ওর হতে। তোমাদের পালানোর বন্দোবস্ত হচ্ছিল, সর্দারের চোখে ধুলো দিয়ে।

ব্যস, আর একটি কথাও নয়। টেঁপী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। খোলা ঝাঁপ দিয়ে বিশু দেখল, টেঁপী দাওয়া থেকে উঠানে নামল, উঠান পার হয়ে হন হন করে বাঁশঝাড়ের পিছন দিয়ে চলে গেল।

হাসি পেল বিশুর। পালানো ছাড়া টেঁপীর আর কোন পথ ছিল না। সব জানাজানি হয়ে গেছে। লজ্জায় টেঁপী মুখই তুলতে পারবে না, বিশুর দিকে চাইতেই সঙ্কোচ হবে।

বিশু ঘুমাল না, এপাশ ওপাশ করল। একটু তন্দ্রার ভাব আসতেই চমকে জেগে উঠল।

নিমে সর্দার ডাকছে।

হন্তদন্ত হয়ে বিশু সর্দারের ঘরে ঢুকল।

সর্দারের আশে পাশে আরো জন চারেক লোক বসে আছে। দলের হোমরা চোমরা গোছের। বিশু সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই সর্দার বলল, নে, বোস এখানে।

বিশু বসে পড়ল।

আজ রাতে তোকে বেরোতে হবে।

আমাকে?

আলবত। তা নয় তো কি, দুধ কলা দিয়ে পুষবো তোমায়? দলের কাজ করতে হবে না?

বিশু কোন কথা বলল না। ঘাড় হেঁট করে রইল।

অনন্তপুরের চটি একরাতের পথ। সেখানে শ্রীক্ষেত্র যাবার একদল যাত্রী এসে জুটেছে। তার মধ্যে শাঁসালো শিকারও কিছু আছে। তারা পথ ঠিক চেনে না। পথ দেখিয়ে কোপাইচণ্ডীর জঙ্গলে নিয়ে আসতে হবে। কোন রকম সন্দেহ না করে। তোর সঙ্গে নেত্যকেও দেব। দুজনে বোষ্টুম সেজে যাবি।

বিশুর সারা শরীর শিউরে উঠল। সর্বনাশ। এইবার অদৃষ্টে মৃত্যু আছে, কেউ রোধ করতে পারবে না। এখনি বিশুর গা হাত পা ঠক ঠক করে কাঁপছে। লোকজনের সামনে কথাই বের হবে না মুখ দিয়ে।

যা এখন ঘরে গিয়ে একটু গড়িয়ে নে। ঠিক সময়ে নেত্য তোকে ডেকে নিয়ে যাবে।

বিশু উঠে পড়ল। নিজের ঘরে গিয়ে পাটির ওপর বসল, কপালে হাত দিয়ে।

রোদের তেজ পড়ে এল। বাজপড়া ন্যাড়া তালগাছটায় বসে একটা চিল অশ্রান্ত ডেকে চলেছে। বিশুর বুকটা আতঙ্কে গুরগুর

করে উঠল। কিছু বলা যায় না, হয়ত যাত্রীদের সঙ্গে পাইক বরকন্দাজও আছে। বিশুর কথাবার্তায় ঠিক ধরে ফেলবে তাকে। পিছমোড়া করে বেঁধে নিয়ে যাবে। অদৃষ্ট মন্দ, বিশু রাজভোগ খেতে খেতে মনে ভেবেছিল দুঃখের মেঘ বুঝি তার কেটে গেল। আর কষ্টের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে না। কিন্তু বিধি বাম।

বাইরে চেয়ে থাকতে থাকতে বিশু দেখল টেঁপী দ্রুতপায়ে দাওয়া পার হয়ে ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকল। কোন দিকে চাইল না। মুখও তুলল না।

বোধ হয় বলাইয়ের সঙ্গে বোঝাপড়া করে এল। গোপন কথা ফাঁস করে দেবার জন্য তাকে ধমক দিয়ে এল। কিন্তু আর তাতে লাভ নেই। টেঁপীর স্বরূপ বিশু ঠিক জানতে পেরেছে। আর বিশু ভুল করবে না।

একটু পরেই নেত্য এসে .উঠানে দাঁড়াল। ঘরের দিকে চেয়ে বলল, কইরে বিশে, তাড়াতাড়ি আয়।

বিশু বাইরে এসে দাঁড়াল, কিরে, সর্দাব তো বলল, রাত্রে রওনা হতে হবে। তুই এত সকাল, সকাল ?

ভোল পালটাতে হবে না ? এই বেশে গেলে আর জ্যান্ত ফিরতে হবে না। তোকে না চিনতে পাবে, কিন্তু নেত্যধনকে পুলিশের লোক খুব চেনে।

ঠিক। বিশুর মনে পড়ে গেল। সর্দাব বলেছিল বটে যে দুজনকে বোষ্টুম সেজে অনন্তপুরের চটিতে যেতে হবে।

এদিক ওদিক বিশু চেয়ে দেখল। অন্যদিন এই সময় টেঁপী মুড়ির ধামি এনে দেয়। সঙ্গে লঙ্কা আর মুলো, কিন্তু আজ টেঁপীকে ডাকবার সাহস বিশুর নেই। মুখের ওপর হয়তো যা তা বলেই বসবে।

পুকুরের ওপারেই চালাঘর। বৈকুণ্ঠ কর্মকারের মতন এমন সিঁদকাটি

নাকি এ তল্লাটে কেউ তৈরী করতে পারে না। দেওয়ালে ঠেকালেই ঝুর ঝুর করে মাটি খসে পড়ে। শুধু তাই নয়, সিঁদ দেয়ালে ছোঁয়ালে গৃহস্থের চোখেও ঘুম নেমে আসে। মন্ত্রপূত সিঁদকাটি। কিন্তু এ ছাড়াও বৈকুণ্ঠ কর্মকারের যে আরো গুণ ছিল, তা বিশু জানত না। আধঘণ্টার মধ্যে নেত্য আর বিশুর চেহারা এমন বদলে দিল যে বিশু অবাক। গলায় কণ্ঠী, নাকে রসকলি, কপালে চন্দন, চুলের ঝুঁটিতে গাঁদাফুল বাঁধা। পরনে বৃন্দাবনী ধুতি, কাঁধে নামাবলী। তাকের ওপর থেকে দুজোড়া খঞ্জনী পেড়ে বৈকুণ্ঠ দুজনের হাতে দিল।

খঞ্জনীতে মৃদু আওয়াজ তুলে নেত্য গাইল, রাধে গো, তোমার সাধের কালাচাঁদ লুটায় ধরণী।

বিশু আয়নায় অনেকক্ষণ ধরে নিজের প্রতিবিম্ব দেখল। নকল বৈষ্ণব। শুধু তিলক আর রসকলি কাটলেই বুঝি বৈষ্ণব হওয়া যায়! আসল বৈষ্ণব ছিলেন কুমুর বাবা। দু চোখের ভাবালস দৃষ্টিতে, সুললিত কণ্ঠে, মনের মাধুর্যে সত্যিকারের বৈষ্ণব।

বাইরে বেরিয়ে নেত্য বাঁদিকের পথ ধরতেই বিশু জিজ্ঞাসা করল, এদিকে কেন?

বারে, যন্ত্রপাতি নিতে হবে না?

পোড়ো বাড়ী একটা। দেয়াল ধসে পড়েছে। উঠানে আগাছার জঙ্গল। সাবধানে কাঁটাঝোপ বাঁচিয়ে নেত্য এগিয়ে গেল। পিছনে বিশু।

বাড়ীর বাইরেটা যত জরাজীর্ণ, ভিতরটা তেমন নয়। বোধ হয় সংস্কার করা হয়েছে। চৌকাঠে পা দিয়েই বিশু থেমে গেল।

নিমে সর্দার মাঝখানে বসে। চারপাশে দলের লোক। মেঝের ওপর লাল চাদর পাতা। স্তূপাকার অস্ত্রশস্ত্র তার ওপরে। বল্লম, টাঙী, শড়কী, ছোরা, খাঁড়া, বেঁটে তলোয়ার, ভোজালী, নানারকমের।

সর্দার নিজের হাতে দুটো ছোরা বেছে দিল দুজনকে। পেট কাপড়ে ছোরা দুটো লুকিয়ে নেত্য আর বিশু বেরিয়ে পড়ল।

চার ক্রোশ পথ। এখন রওনা না হ'লে ঠিক সময়ে পৌঁছানো মুস্কিল। ভোরের দিকে যাত্রীরা যাত্রা শুরু করবে, এর মধ্যে ভাব সাব করে তাদের বিশ্বাসভাজন হতে হবে। ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে আসতে হবে কোপাইচণ্ডীর পথে।

এ ছোরা কিসের জন্য জানিস তো?

নিজেকে বাঁচাবার জন্য। আর কেন। বিশু উত্তর দিল।

না, শুধু নিজেকে বাঁচাবার জন্যই নয়, দলকে বাঁচাবার জন্যও। যদি ধরা পড়িস তো এ ছোরা নিজের বুকে বসিয়ে দিবি। দলের নাম যেন আমাদের মুখ থেকে কেউ জানতে না পারে।

বিশু চমকে উঠল। সর্দার কাজটা দেওয়ার পব থেকেই তাব ভয় ভয় করছে। এ যাত্রাই শেষযাত্রা হয় তো। আর বিশু ফিরে আসবে না।

অনন্তপুরের চটি সরগরম। যাত্রীতে ঠাসবোঝাই। নেত্য দাওয়ার এক কোণে গিয়ে বসল। বিশুকেও পাশে বসাল।

যাত্রীবা ঘুমে অচেতন। ভোবের আগে কারুর ঘুম ভাঙবে না। তখন কাজ শুরু করতে হবে।

অনেক খোঁজ কবে দোকানীকে ঠেলে তুলে মুড়ি মুড়কিব যোগাড় হ'ল। রাত্রে আর কিছু জুটবে না। এই খেয়েই কাটাতে হবে।

নেত্য চোখ বুজল, বিশুব চোখে ঘুম নেই।

কিছুক্ষণ পরে বিশু নেত্যকে ঠেলা দিল, নেত্য, ও নেত্য, ঘুমালি নাকি?

উঁ। ঘুমজড়ানো গলায় নেত্য উত্তর দিল।

একটা কথা জিজ্ঞাসা করব তোকে।

কি কথা? নেত্য সোজা হয়ে বসল।

টেঁপী কেমন মেয়ে রে?

নেত্য দুটো চোখ অল্প খুলেছিল, বিশুর প্রশ্নের ধরনে চোখদুটো পুরোপুরি খুলে সোজা হয়ে বসল।

তার মানে? এ কথা আমায় জিজ্ঞাসা করছিস কেন?

তুই তো অনেকদিন আছিস এ দলে, তাই বলছি।

কিছুক্ষণ নেত্য কি ভাবল, তারপর বলল, ভালই মেয়ে। সর্দার ওর মাকে ধরে নিয়ে আসে, তখন টেঁপী খুব বাচ্ছা। আমাদের চোখের সামনেই তো বড় হ'ল।

দলের কারো সঙ্গে ভাবসাব আছে নাকি?

ভাবসাব? ও বাবা, কেউটের ছানা, ওর ল্যাজে কে পা ঠেকাতে যাবে! বলাই বোধ হয় চেষ্টা করেছিল, সুবিধা হয় নি।

সুবিধা হয় নি?

বোধ হয় না। তাই তো শুনেছিলাম। খিড়কীর পুকুরে টেঁপী বাসন ধুচ্ছিল, বলাই সেখানে গিয়ে বুঝি কি রসিকতা করেছিল, থালা ছুঁড়ে টেঁপী এমন মেরেছিল বলাইকে যে আজও কপালে দাগ রয়ে গেছে। অবশ্য বলাই লোককে বলে লাঠি খেলতে গিয়ে লেগেছে।

বিশু সোজা হয়ে বসল। সর্বনাশ, বলাইয়ের কথায় বিশ্বাস করে টেঁপীকে অবিশ্বাস করছিল। দলের আরো দু একজনের কাছে খোঁজ খবর নিতে হবে। উড়ো কথায় বিশ্বাস করলে ঠকতে হয়।

হঠাৎ এ কথা জিজ্ঞাসা করলি যে?

এদিক ওদিক নানারকম কথা শুনলাম কিনা, তাই বলছি।

বলাই কিছু বলেছে বুঝি? মেয়েটার ওপর ওর অনেকদিনের নজর। টেঁপীকে বাগাবার তালে ঘুরছে, ফন্দী-ফিকির আঁটছে, কিন্তু সুবিধে করে উঠতে পারছে না। কথাটা সর্দারের কানে উঠলেই সর্বনাশ। নিমে সর্দারের মনে দয়া মায়ার বালাই নেই। একেবারে শড়কীর ফলায় গিঁথে ফেলবে।

বিশু কোন উত্তর দিল না। দু হাঁটুর ওপর মুখটা রেখে চুপচাপ অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইল।

কিরে কি ভাবছিস? নেত্য ঠেলা দিল একবার।

না, কিছু নয়। বিশু পাশ কাটিয়ে গেল।

টেঁপী ভাল মেয়ে। ও মেয়েকে বিয়ে করে তুই সুখীই হবি। তোর ওপরও সর্দারের নজর ভাল। ভালই হবে তোর।

বিশু চুপ করে রইল। আশ্চর্য, কেবলই টেঁপীর কথা মনে পড়ছে। ইচ্ছা করছে, ছুটে গিয়ে তার দুটো হাত ধরে ক্ষমা চায়। টেঁপী মুখ-ভার করে সরে থাকলে বিশুর বিশ্রী লাগবে।

সোরগোলে বিশুর ঘুম ভেঙে গেল। ভোর হয়েছে। নেত্য পাশে নেই।

বিশু উঠে দাঁড়াল। পিছনেব পুকুরের ধারে সবাই বসেছে। মুখ হাত ধুচ্ছে। নেত্যও বোধ হয় সেখানেই আছে। একটু এগোতেই নেত্যর সঙ্গে দেখা হ'ল।

নে, মুখ হাত ধুয়ে নে। আমি দাওয়ায় বসে আছি।

মুখ হাত ধুয়ে ফিরে এসেই বিশু অবাক। নেত্য গান শুরু কবে দিয়েছে খঞ্জনী বাজিয়ে। তাকে ঘিরে ছোটখাট ভিড়। লোকজনকে ঠেলে বিশুও নেত্যর পাশে গিয়ে বসল। গান ওর সাত জন্মে আসে না। খঞ্জনীতে আস্তে আস্তে ঠোকা দিতে লাগল।

চাল, আলু জমতে লাগল। দু একটা পয়সাও।

দু একজন গায়ে পড়ে আলাপও করল।

বাবাজীরা যাবে কোথায়?

শ্রীক্ষেত্তর। নেত্য খঞ্জনীশুদ্ধ হাত কপালে ঠেকিয়ে বলল।

শ্রীক্ষেত্র! বা, ভালই তো হ'ল। আমরাও সেখানে যাচ্ছি। সারা পথ প্রভুর নাম শুনতে শুনতে যাওয়া যাবে।

ছু একজন অন্য কথাও জিজ্ঞাসা করল, কাল বিকেলে তো দেখি নি বাবাজীদের ? কাল ছিলে কোথায় ?

নেত্য উত্তর দিল, আমরা আসছি চর-ইসলামপুর থেকে। সেখানে আশ্রম আছে। প্রভু ডেকেছেন তাই চলেছি শ্রীক্ষেত্তরে।

ঠিক কথা, খুব সত্যি কথা। প্রভু না ডাকলে ঘরের টান ছিঁড়ে কেউ কখনও বেরোতে পারে! পথটা কি সোজা। বিষয় সম্পত্তি সব উইল করে তবে বেরোতে হয়। প্রভু আর ফেরাবেন কিনা তিনিই জানেন।

বাবাজীদের কি এই প্রথম ?

নেত্য অমায়িক হাসল, না, প্রথম নয়। বছর ছুয়েক আগে আমরা গিয়েছিলাম প্রায় জনা পাঁচেক। একজনকে পথেই রেখে যেতে হয়েছিল। আমরা চারজনে পৌঁছেছিলাম।

তাই নাকি ? সাগ্রহে ভিড় যেন আরো জমাট বাঁধল।

তবে তো ভালই হ'ল। বাবাজীরা আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পাববে।

নেত্য মৃদু আঘাত দিল খঞ্জনীতে। হেসে বলল, পথ দেখাবার মালিক মহাপ্রভু। পথ তিনিই দেখাবেন, আমরা শুধু তাঁর নির্দেশে চলব।

আসল লোকগুলো কিন্তু ধারে কাছে ভিড়ল না। কর্তা, গিন্নী, এক জোয়ান ছেলে। কর্তার বিরাট কারবার। অঢেল টাকা কিন্তু মনে সুখ নেই। গিন্নীর অম্বলের অসুখ, বাত, ইদানীং বুকের ব্যথাও দেখা দিয়েছে। সঙ্গে ছুটো পালকি আছে। বারো জন বেহারা। এ ছাড়া গাদা বন্দুক নিয়ে ছুজন পাইক। চেহারা দেখে মনে হয় কর্তা বেশ মালদার লোক। ছু হাতে আটটা আংটি। পাথরগুলো জ্বল জ্বল করছে। গিন্নীর গায়েও অলঙ্কারের কমতি নেই। তবু তীর্থযাত্রার সময়ে অনেকেই গহনাপত্র বেশী সঙ্গে নেয় না।

নেত্য এক দৃষ্টে চেয়ে চেয়ে দেখল। ভিড় একটু কমলে ফিস ফিস করে বিশুকে বলল, ওদের কোপাইচণ্ডীর জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে না ফেলতে পারলে মজুরী পোষাবে না বিশে। কিন্তু ওরা তো এদিকই মাড়াচ্ছে না। চল, আমরাই বরং ওদের কাছে যাই।

নেত্য আর বিশু দুজনেই উঠল। চটির কোণের দিকের দুটো ঘর নিয়ে তারা রয়েছে। তাদের খবর অন্য যাত্রীরা দিয়েছে। পয়সাকড়ির খবর আর অসুখ বিসুখের খবর।

দাওয়ায় বসে পাইক দুটো বন্দুক পরিষ্কার করছিল, বাবাজীদেব দেখে ভ্রূ কোঁচকাল। এখানে কি চাই ?

নেত্য খঞ্জনীতে সুর তুলল, মুখে বলল, ভিক্ষা ছাড়া আর কি চাইতে পারি ?

এখানে সুবিধা হবে না। গিন্নীমার অসুখ।

কি অসুখ ?

বাতটা কাল থেকে বেড়েছে। সাবাবাত ছটফট করেছেন।

অসুখ সারাবার ওষুধ আমাদেব কাছে আছে।

পাইকরা হেসে উঠল।

শহবের বড় বড় কবরেজ হাব মেনে গেল, আর বাবাজীবা দেবে ওষুধ।

নেত্যও নাছোড়বান্দা। বলল, ভগবানের দেওয়া অসুখ, ভগবানের ওষুধেই সারে। মানুষের ওষুধে কি উপকার হয় ?

গোলমাল শুনে ছেলেটা বাইরে এসে দাঁড়াল।

কি হয়েছে ?

নেত্য মাথা নিচু করে নমস্কার করল, আজ্ঞে, শুনলাম মা ঠাকরুণের বাতের ব্যথা বেড়েছে, আমাদের গৌরাঙ্গের কৃপায় কিছু টোটকা জানা আছে। অনুমতি দিলে একবার দেখতে পারি

ছেলে কিছুক্ষণ কি ভাবল তারপর ঘরের মধ্যে যেতে যেতে বলল, দাঁড়াও একটু, বাবাকে একবার জিজ্ঞাসা করে আসি।

একটু পরেই ছেলে বাপকে নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল।

কর্তা চোখ কুঁচকে নিরীক্ষণ করলেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তারপর বললেন, এস, ভিতরে এস।

তক্তপোশের ওপর দশাসই চেহারা। মাংসের স্তূপ, মাঝে মাঝে সোনার বেড় দিয়ে জড়ানো। বাতে কাতরাচ্ছে।

নেত্য ঝুলি নিয়ে এগিয়ে গেল। হাত দিয়ে টিপে টিপে হাঁটু দুটো দেখল তারপর কর্তার দিকে ফিরে বলল, আমি দুপুর নাগাদ একটা পাতা দেব, গরম করে হাঁটুতে লাগিয়ে দেবেন। একটা বালাও দেব, পরিয়ে দেবেন ডান হাতে।

দুজনে বাইরে আসতেই বিশু জিজ্ঞাসা করল, লম্বা লম্বা কথা তো বলে এলি, কি করবি এখন?

ওষুধ একটা আছে, শেখ সায়েবের কাছে শিখেছিলাম। বনে বাদাড়ে খুঁজতে হবে। নেহাৎ না পাই তো আকন্দর পাতা গরম করে দিতে বলব।

বিশুর মনে পড়ে গেল। অনঙ্গ কবিরাজও এই রকম বনে বাদাড়ে ওষুধ খুঁজে বেড়াতেন। তাঁর ওষুধ যেন কথা কইত।

খাওয়া দাওয়া সেরে নেত্য দুপুরের দিকে আবার গিয়ে হাজির হ'ল। সঙ্গে বিশু। কি একটা লতা যোগাড় করেছে। তামার তাব ঝুলিতেই ছিল, বেঁকিয়ে নেত্য বালা তৈরী করে দিল।

পরের দিন ভোরে কর্তা নিজে এসে হাজির। দাওয়ার ওপর চাটাই পেতে নেত্য আর বিশু শুয়েছিল। বিশু ধড়মড় করে উঠে বসল।

ভোরের দিকে একদল যাত্রী যাত্রা শুরু করেছিল। গিন্নী বাতে কাত না হ'লে এঁরাও সেই সঙ্গে রওনা হতেন।

আছেন, ও মশাইরা ?

বিশু নেত্যকে ঠেলে তুলে দিল। মনে মনে ভয় পেল বিশু। যা তা একটা পাতা গরম করে লাগিয়ে দিতে, হয় তো বাতের ব্যথাটা বেড়েই উঠেছে।

না, তা নয়, গিন্নী অনেকটা ভাল। উঠে দাঁড়িয়েছে, অল্প সল্প চলাফেরাও করতে পারছে। একটা নিবেদন নিয়ে কর্তা এসে দাঁড়িয়েছেন। বাবাজীরা যখন শ্রীক্ষেত্র যাবেন তো এক সঙ্গে গেলেই ভাল। এখান থেকে বাড়তি একটা পালকির বন্দোবস্ত করা যেতে পারে। এমন লোক সঙ্গে থাকলে কর্তাও একটু বল পান। পথে ঘাটে ব্যথাটা আচমকা বেড়ে উঠলে, একটা বিহিত হতে পারে।

নেত্য দুটো চোখ বুজিয়ে ফেলল। মিহি সুরে বলল, গৌরাঙ্গ হে, সবই তোমার দয়া প্রভু !

তারপরের ব্যাপারটা আর মোটেই শক্ত নয়। পথ দেখিয়ে আগের পালকিতে নেত্য আর বিশু চলল। তারা এর আগে যখন একবার শ্রীক্ষেত্র গেছে, তখন পথঘাট অচেনা নয়। অনন্তপুর থেকে ঈশান-গঞ্জ, সেখান থেকে চাঁদখালি, তারপর বাণেশ্বরী নদীর পাড় দিয়ে কোপাইচণ্ডীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে সোজা ভৈরবদীঘির চটিতে।

পাইকরা বেঁকে বসল। না, কোপাইচণ্ডীর জঙ্গলের মধ্যে ঢুকবে না, তার চেয়ে বাণেশ্বরী নদী পার হয়ে নীলচক ঘুরে যাবে।

নেত্য আর বিশু দুজনেই হেসে উঠল।

নেত্য বলল, ভর দুপুরে কোপাইচণ্ডীর জঙ্গলে ঢুকতে ভয় ? তা হ'লে মাথার পাগড়ীগুলো খুলে বরং ঘোমটা দিয়ে নাও। বন্দুক দুটো কর্তা আর ছেলের হাতে দিয়ে দাও, সেই ভাল।

কর্তার ছেলে রুখে দাঁড়াল। হাতে বন্দুক থাকতে কাকে ভয় ! মিছিমিছি দু দিনের পথ বাড়িয়ে লাভ আছে। পাইকরা বন্দুক

অবশ্য ছাড়ল না, কিন্তু দুজনেই পালকির দু পাশে এসে দাঁড়াল। নেত্য আর বিশু যে পালকিতে ছিল তার দু পাশে।

কোপাইচণ্ডার জঙ্গলের মাঝবরাবর আসতেই বিপদ ঘটল।

নিমে সর্দার আর তার লোকজন ঝাঁকড়া অশ্বত্থ গাছের পিছনে লুকিয়ে ছিল, পালকিগুলো কাছে যেতেই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

নেত্য আর বিশুও তৈরী ছিল। ডাকাতের দল লাফিয়ে পড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে কোমর থেকে ছোরা বের করে পাইক দুটোকে ঘায়েল করল। নেত্যর ছোরা ঠিক একটা পাইকের বুকে গিয়ে বিঁধল, কিন্তু বিশুর এই প্রথম মানুষ শিকার। হাতটা কেঁপে উঠে ছোরাটা আর একজন পাইকের কাঁধের ওপর গিয়ে পড়ল।

ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। বিশুর জামাকাপড় ভিজিয়ে দিল। মুখেও কিছুটা এসে লাগল।

সমস্ত শরীর শির শির করে উঠল। লবণাক্ত স্বাদ শুধু মুখে নয়, সারা দেহের রক্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। নতুন এক অনুভূতি। ঠিক এই রকম শরীরের অবস্থা হয়েছিল টেঁপীর স্পর্শে। সে দিনের মতন আজকেও যেন নতুন এক জীবনের দ্বার খুলে গেল বিশুর সামনে।

পাইকটা হাতের বন্দুক ঘুরিয়ে বিশুকে আক্রমণ করার আগেই বিশু আবার ছোরাটা তাকে লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করল। এবারে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হ'ল না। একেবারে পাঁজরের মধ্যে গিয়ে গিঁথল। আহত আর্তনাদ। চাপ চাপ রক্তে পাইকের জামা ভিজে গেল। ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমল কপালে। ঠোঁটের দু পাশে ফেনার রাশ। প্রথমে হাঁটু মুড়ে তারপর পাইকটা ঝোপের ওপর উপুড় হয়ে পড়ল।

বিশু নিচু হয়ে তার শ্লথ হাত থেকে বন্দুকটা কেড়ে নিল।

অন্য দিকে মরণোৎসব শুরু হয়ে গেছে। এখানে ওখানে মানুষের মৃত দেহ। ভাঙ্গা পালকি, পোশাকের ছিন্ন অংশ।

পাশ দিয়ে আহত একটা পালকির বেহারা গুঁড়ি দিয়ে সরে

যাচ্ছিল, বিশু হাতের বন্দুকের বাঁট দিয়ে তাকে সজোরে একটা আঘাত করল। ফট করে একটা শব্দ। মাথাটা দু ভাগ হয়ে ফেটে গেল। বেহারার শরীরটা থর থর করে কেঁপে উঠল বার দুয়েক, তারপর নিস্পন্দ।

বিশু আর দাঁড়াল না। বন্দুকটা ছুঁড়ে ফেলে তীরবেগে ছুটল বাড়ীর দিকে। মাইল দুয়েকেরও বেশী। পথে বাব দুয়েক হোঁচট খেল, কাঁটায় দুটো পা ক্ষত বিক্ষত, ক্লান্ত পায়ে উঠানে এসে আছাড় খেয়ে পড়ল।

দাওয়ার ওপর টেঁপী বসে বসে সলতে পাকাচ্ছিল, ছুটে এসে বিশুর কাছে দাঁড়াল।

নামাবলী রক্তে ভিজে গেছে। নিমীলিত দুটি চোখ। মাঝে মাঝে ঠোঁট দুটো অল্প কাঁপছে।

গায়ে হাত দিয়ে টেঁপী বার কয়েক ডাকল। বিশুব সাড় নেই। বিশুকে তুলে ঘরের মধ্যে নিয়ে যাওয়া টেঁপীর পক্ষে সম্ভব নয়। হঠাৎ তার মনে পড়ল তুলসীর কথা। কদিন জ্বব চলেছে বলে দলের সঙ্গে শিকারে বেরোয় নি। ঘরেই আছে। পুকুবপাড়ে দাঁড়িয়ে টেঁপী চিৎকাব করে তুলসীকে ডাকল।

তুলসী দেয়ালে হেলান দিয়ে বসেছিল। টেঁপীব ডাকে বাইরে এল। দুজনে ধরাধরি করে বিশুকে ঘরের মধ্যে নিয়ে এল। গা যেন পুড়ে যাচ্ছে। দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা কামড়ে ধরে বিড় বিড় করে কি বকছে। টেঁপী সাবধানে রক্ত ধুইয়ে দিল। তন্ন তন্ন কবে খুঁজল। না, আঘাতের দাগ কোথাও নেই। শুধু দুটো পা কাঁটার আঁচড়ে ছড়ে গেছে।

গামছা ভিজিয়ে গা মুছিয়ে দিল। কপালে ভিজে ন্যাকড়া জড়াল। মাথার কাছে বসে হাত-পাখা নেড়ে বাতাস করতে লাগল।

সর্দার দলের কয়েকজনকে নিয়ে সন্ধ্যা নাগাদ ফিরল।

টেঁপী বাইরে এসে দাঁড়াল।

হ্যারে টেঁপী, বিশে এসেছে? সর্দারের গলায় উদ্বেগের রেশ।

হ্যাঁ, এসেছে। খুব জ্বর হয়েছে। গা যেন আগুন।

বিশু ফিরেছে এই খবরেই সর্দার খুশী হয়ে উঠল। দলের লোকের দিকে ফিরে খবরটা দিল। মনে হ'ল সবাই মিলে অনেকক্ষণ ধরে বিশুকে যেন খুঁজেছে।

সর্দার দাওয়ার ওপর এসে দাঁড়াল। বিশুর ঘরে ঢুকতে গিয়েই কি ভেবে থেমে গেল। জামাকাপড় রক্তে লাল। মুখে গালেও রক্তের ছিটে। নিজের ঘরে ঢুকে সর্দার জামাকাপড় ছেড়ে অন্য কাপড় পরল। পুকুরে গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে আবার এসে দাঁড়াল বিশুর ঘরের চৌকাঠে।

বিশু এক পাশ হয়ে শুয়ে আছে। প্রদীপের ম্লান আলোয় মুখটা যেন আরো বিষণ্ণ, আরো করুণ। থেকে থেকে শরীরটা কেঁপে উঠছে। অস্পষ্ট কান্নার শব্দ বেরোচ্ছে গলা দিয়ে।

কপালে হাত রেখেই সর্দার কপাল কোঁচকাল। টেঁপীর দিকে ফিরে বলল, জ্বর তো খুব বেশী বলে মনে হচ্ছে। বিশে ফিরেছে কখন?

দুপুরের দিকে। ছুটতে ছুটতে এসে উঠানের ওপর অজ্ঞান হয়ে পড়ল। তুলসীকে ডেকে দুজনে মিলে ঘরে তুললাম। বোধ হয় তোমাদের কাণ্ড দেখে ভয় পেয়েছে।

ভয়? সর্দার ঘাড় নাড়ল, না, না, ভয় পায় নি। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম যে, একটা পাইককে ছোরায় ঘায়েল করে তার হাত মুচকে বন্দুক কেড়ে নিল। পালকির একটা বেহারা সরে যাচ্ছিল, তাকে সাবাড় করল। তারপর আর বিশেকে খুঁজে পেলাম না। একটা বেহারা আর যোয়ান ছোকরা একটা খুব লড়েছে। আমাদের জন দুয়েকের অবস্থা কাহিল। আমি ভাবলাম বিশেটাও বুঝি চোট

খেয়ে কোথাও পড়ে আছে। তন্ন তন্ন করে সব খুঁজে তারপর বাড়ীতে ফিরে আসছি।

টেঁপী বিশুর কপালের ন্যাকড়াটায় আবার জল ছিটিয়ে দিল। সর্দারের দিকে মুখ তুলে বলল, কাউকে একটা খবর দিতে হয়।

হুঁ, তাই ভাবছি। অনুকুলবাবু মারা গিয়ে বড্ড অসুবিধা হয়েছে।

সর্দার বেরিয়ে উঠানে এসে দাঁড়াল। দলের দু একজন গোল হ'য়ে জটলা করছে তাদের একজনকে ডেকে ফিস ফিস করে নির্দেশ দিল। লোকটা ছুটে বাইরে চলে গেল।

বদ্যি যখন এল, তখন রাত অনেক।

পরনে খাটো পিরান, আট হাতি ধুতি, মাথায় কদম-ছাঁট চুল, গোলগাল চেহারা। উঠানে দাঁড়িয়ে লোকটা থরথরিয়ে কাঁপছে।

ব্রজহরি সেন। জাত বৈদ্য। অদ্ভুত নাড়ীজ্ঞান। রোগীব ঘরের মধ্যে ঢুকলেই নাকি রোগেব হদিস পান। আশ পাশেব পাঁচ খানা গাঁ থেকে ডাক আসে। সবে পালকিতে উঠতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় নিমে সর্দাবেব চব গিয়ে দাঁড়াল। চেঁচিয়ে কিছু বলে নি, ব্রজহরিকে এক পাশে ডেকে খববটা দিয়েছিল। ব্যস, সেই থেকে ব্রজহরির কাঁপুনি শুরু হয়েছিল, এখনও থামে নি। নিমে সর্দাবেব বাড়ীতে রোগী দেখতে যাওয়া মানে, বাঘেব গর্তে মাথা ঢোকানো। না-বললে তো আরো সর্বনাশ। রাতারাতি বাড়ী চড়াও হয়ে সর্বস্ব জ্বালিয়ে দেবে। একটা লোককেও জ্যান্ত রাখবে না।

নিমে সর্দার নিজে এগিয়ে গেল। ব্রজহরিকে অভ্যর্থনা করে ঘরে নিয়ে এল।

ছেলেটার বড্ড জ্বর। একবার দয়া করে যদি দেখেন।

ব্রজহরি কাঁপতে কাঁপতে নিমে সর্দারের পিছন পিছন ঘরের মধ্যে ঢুকলেন। রোগীর সামনে বসে ব্রজহরি অনেকটা ধাতস্থ হলেন।

পরিবেশ ভুলে গেলেন। অনেকক্ষণ ধরে বিশুকে দেখলেন। উল্টিয়ে পাল্টিয়ে।

তারপর সর্দারের দিকে ফিরে বললেন, জ্বরটা ভাল নয়। বাঁকা পথ নেবে বলেই মনে হচ্ছে।

ভাল নয়? খুব আস্তে আস্তে শুকনো গলায় সর্দার উচ্চারণ করল।

উহুঁ। নাড়ির গতিও সুবিধের ঠেকছে না। বোধ হয় মনে একটা খুব আঘাত পেয়েছে।

সর্দার আর টেঁপী তুজনে তুজনের দিকে চাইল।

ব্রজহরি বললেন, কেউ চলুক আমার সঙ্গে। ওষুধ দিয়ে দেব।

যে লোকটা ডাকতে গিয়েছিল সেই সঙ্গে গেল। পালকি করে গেল পালকিতেই ফিরল। ব্রজহরি নিজের পালকি ছেড়ে দিয়েছেন।

দিন কুড়ি। প্রায় যমে মানুষে টানাটানি। মাঝে মাঝে চিৎকার কবে ওঠে বিশু, ইস, কি রক্ত, আমার সারা গা ভবে গেল রক্তে, মুখে রক্তেব ছিটে লাগল। ধুলেও যে উঠছে না!

টেঁপী শিয়বে বসে রইল। সর্দার চৌকাঠে। রক্ত দেখে অনেকের অমন হয়। পাগল হয়ে যায় মানুষ। এ সর্দার নিজের চোখে অনেকবার দেখেছে। বৌয়ের সামনে স্বামীকে কেটেছে ভোজালী দিয়ে। না কেটে উপায়ও ছিল না। বৌটা গা থেকে অলঙ্কার খুলে দিচ্ছিল কিন্তু স্বামী বাদ সাধল। হাতের লাঠি উঁচিয়ে বাধা দিল। অনেক বারণ করেছে সর্দার, ভয় দেখিয়েছে, স্বামী শোনে নি, কাজেই বাধ্য হয়ে সর্দার ভোজালী দিয়ে ধড় থেকে মাথাটা নামিয়ে নিয়েছিল।

বৌটা একবার উঃ বলে চোখে হাত চাপা দিয়ে কেঁদে উঠেছিল, তারপর একেবারে উন্মাদ অবস্থা। গায়ের সমস্ত অলঙ্কার খুলে ফেলে,

পরনের কাপড় খুলে হো হো করে হাসি আর লাফালাফি। দলের চারজন যোয়ান লোক ধরে রাখতে পারে নি। গায়ে যেন শত হস্তীর বল।

আর একবার। বাপের সামনে ছেলেকে খতম করতে হয়েছিল। সেও একই ব্যাপার। বুড়ো বাপ টাকা পয়সা সব দিতে রাজী ছিল, কিন্তু ছেলে বেঁকে দাঁড়াল। দলের একজন সঙ্গে সঙ্গে তাকে শড়কীর ফলায় গেঁথে ফেলেছিল। বুড়ো বাপ একটু চিৎকার নয়, একটি কথা নয়। বনের মাঝখানে সেই যে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছিল পুরো একটা দিন একটা রাত কেটে গেল, নড়েও নি, চড়েও নি। দুটো চোখ বিস্ফারিত, শিথিল গালের পেশীগুলো থর থর করে কাঁপছে, সে এক অদ্ভুত অবস্থা। শেষকালে দয়াপরবশ হয়ে সর্দারই বুড়োকে শেষ করে দিয়েছিল। যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি।

রক্ত দেখলে এমনি হয়। চোখের সামনে খুন দেখলেই এমনি ধাক্কা লাগে মনে। তাই হয়েছে বিশুর। সামলাতে সময় নেবে।

সেরে উঠতে প্রথমেই নিমে সর্দার বিশুর পিঠ চাপড়াল। বাহাদুর ছেলে। এলেম আছে। মনে একটু সাহস আনলে আর দেখতে হবে না, দলের চাঁই হয়ে যাবে।

বিশু কিছু কথা বলল না। শরীর এখনও দুর্বল। চোখের সামনে অস্পষ্ট ছায়ার সার। হাত বাড়িয়ে টেঁপীর হাত থেকে চিঁড়ের বাটিটা টেনে নিল। ব্রজহরি সেন বলেছেন দিন কতক চিঁড়ের মণ্ড আর মাছের ঝোল খেতে।

বিশু সেরে উঠতে নিমে সর্দার টাকার থলি ব্রজহরির হাতে তুলে দিতে গিয়েছিল, ব্রজহরি নেন নি। হাতযোড় করেছেন।

বয়স হয়েছে, আর কটা দিন বাঁচব সর্দার। তোমায় মিনতি

করছি ও অধর্মের টাকা আমায় ছুঁতে বল না। মনে কর তোমার ছেলের আমি এমনিই চিকিৎসা করেছি।

নিমে সর্দারের মুখটা লাল হয়ে উঠেছিল। ডানহাতটা কোমরের কাছে ছোরার সন্ধান করেছিল কিন্তু কয়েক মিনিট, তারপরই সর্দার শান্ত হয়ে গিয়েছিল, ব্রজহরির দিকে চেয়ে বলেছিল, একটু দাঁড়ান, আমি আসছি।

টাকার থলি রেখে লাল কাপড়ে মোড়া একটা পুঁটলি এনে ব্রজহরির হাতে দিয়েছিল, মা কালীর নামে বলছি, এ অন্য টাকা। আমার নিজের টাকা। বাঁশঝাড় আর গোলপাতা বিক্রী করে কিছু টাকা প্রত্যেক বছর পাই, সেই টাকা আপনাকে দিচ্ছি। এ নিতে নিশ্চয় আপনার আপত্তি হবে না।

ব্রজহরি টাকাটা নিয়েছিলেন। নেবার সময় সর্দারের একটা হাত ধরে বলেছিলেন, আমার একটা কথা রাখতে হবে সর্দার।

বলুন।

আমি কাচ্ছাবাচ্ছা নিয়ে ঘর করি, তোমাদের কাছ থেকে আমার যেন কোন বিপদ আপদ না হয়, তার বদলে তোমার দলের যখন যার কোন ব্যায়রাম হবে, আমায় খবর পাঠিও, আমি সব কাজ ফেলে চলে আসব।

সর্দার উঠানের পাশে দাঁড় করানো লাঠিটা হাতে নিয়ে বলেছিল, এই লাঠি ছুঁয়ে কথা দিচ্ছি, যদ্দিন নিমে সর্দার বেঁচে থাকবে, এ দলের লোক আপনার বাড়ীর ধারে কাছে কোন বদ মতলব নিয়ে যাবে না।

ব্রজহরি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিলেন।

সর্দার ফিরে এসে বিশুর সামনে দাঁড়াল। হেসে বলল, এই বদ্যি আর আমার মেয়ে টেঁপী এরা না থাকলে এ যাত্রা আর উঠতে হ'ত না তোকে। চলতে ফিরতে পারলে একদিন তরি তরকারির ডালি

নিয়ে দিয়ে আসবি বস্তির বাড়ীতে। আর টেঁপীকে নিজের লুটের মালের সেরা গহনাটা দিবি। বুঝলি ?

বিশু কোন উত্তর দিল না। চোখ ঘুরিয়ে টেঁপীকে খুঁজল। টেঁপী ধারে কাছে নেই। আশ্চর্য কাণ্ড। সারা দিনরাত টেঁপী সেবা করেছে। যখনই বিশু চোখ খুলেছে, দেখেছে মাথার কাছে টেঁপী। ওষুধ খাওয়াচ্ছে, মুখ মুছিয়ে দিচ্ছে, বাতাস করছে। অথচ একটি কথাও বলে নি। সেদিনের সেই ব্যাপারের পর থেকে টেঁপী কথা বলে নি বিশুর সঙ্গে। সেরে ওঠার পরেও আহার পথ্য ঠিক সময়ে দিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কোন কথা বলছে না। বিশুর কথার উত্তরও দিচ্ছে না।

সন্ধ্যার ঝোঁকে বিশু শুয়েছিল, টেঁপী তার গায়ে পাতলা একটা চাদর দিতে আসতেই বিশু হঠাৎ টেঁপীর হাতটা ধরে ফেলল।

ইচ্ছা করলেই টেঁপী নিজের হাতটা বিশুর দুর্বল মুষ্টি থেকে খুলে নিতে পারত কিন্তু টেঁপী তেমন জোর করল না, কেবল মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বস, কথা আছে।

টেঁপী বসল। মুখটা কিন্তু অন্যদিকে।

বিশু আস্তে উঠল। এখনও শরীর বেশ দুর্বল। টেঁপীর দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল, আমায় মাপ কর তুমি। আমি অন্যায় করেছি।

শেষদিকে বিশুর গলার আওয়াজ কান্নায় জড়িয়ে এল। টেঁপী বিশুর দিকে মুখ ফিরিয়ে কৌতূহলী দৃষ্টি দিয়ে দেখল।

নেত্য আমায় সব বলেছে। বলাই আমায় যা তা বুঝিয়েছিল। দাঁড়াও না, ভাল করে সেরে উঠি আগে। ওকে আমি মজা দেখাচ্ছি।

টেঁপী একটু সহজ হ'ল। বিশুর হাতের মুঠোয় ধরা হাতটা অনেক শিথিল। দুটি চোখের চাউনিও অনেক কোমল।

বিশু একটু ঝাঁকানি দিতেই টেঁপী বিশুর বুকের ওপর এসে পড়ল। আর একটা হাত দিয়ে বিশু টেঁপীকে নিবিড় করে আঁকড়ে ধরল।

বল, রাগ কর নি। আমার সব দোষ ক্ষমা করলে ?

টেঁপী মুখ তুলল। ঠোঁট দুটো নেড়ে কি বলতে যাবার মুখেই বিপত্তি, বিশুর মুখটা আরো কাছে নেমে এল।

শিরায় শিরায় তীব্র দাহ। বিশুর মনে হ'ল হৃদস্পন্দনে যেন মাদলের সুর। দুটো ঠোঁট জ্বালা করে উঠল। আর এক রাত্রে ভাঁড়ের তরল বহ্নি গলায় ঢালার সময় ঠিক এমনি অবস্থা হয়েছিল শরীরের।

টেঁপী চুপচাপ বুকের ওপর পড়ে রইল। নরম কাদার তালের মতন। চেতনা নেই, একটু পরেই নিমে সর্দার ঘরে এসে ঢুকতে পারে, কিন্তু দুজনের কেউ তা ভেবেও দেখল না।

বোধ হয় টেঁপীর তোয়াজেই বিশুর শরীর দিন দিন শক্ত, সমর্থ হয়ে উঠল। পুকুর ধারে স্নান করতে নেমে বিশু নিজেই অবাক। বুক বেশ চওড়া, দু হাতের গুল লোহার বলের মতন, সরু কোমর। নিমে সর্দারের নির্দেশে আজকাল রোজ ভোরে মাইলখানেক দৌড়োতে হ'চ্ছে বিশুকে, বুক-ডন দিতে হ'চ্ছে, তার ওপর লাঠি খেলা, ছোরা খেলা তো আছেই।

বিশুর শরীর দেখে সর্দারও তারিফ করেছে। পাশের সাঙ্গাতদের দিকে ফিরে বলেছে, বিশে ব্যাটা যেন চিতাবাঘের বাচ্ছা হ'য়ে উঠছে দিন দিন। দলের নাম রাখবে বিশে। এবার থেকে রাত্রে ওকে নিয়ে বেরোতে হবে।

তারপর থেকে বিশু দলের সঙ্গে বেরিয়েছে। ছোট খাট শিকার সর্দার বিশুর হাতেই ছেড়ে দিয়েছে। একলা দোকলা

মানুষ, কোমরে কিছু টাকা পয়সা নিয়ে ভিন গাঁয়ে চলেছে, বিশুই ভোজালী কিংবা লাঠি হাতে সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। তাড়া করে ঝোপের মধ্যে ফেলে সব কেড়ে নিয়েছে। তেমন তেমন হ'লে ভোজালীর উল্টো পিঠ দিয়ে ঘায়েল করে পয়সাকড়ি লুটে নিয়েছে। তারপর অচেতন দেহটা টানতে টানতে কোপাইচণ্ডীব জঙ্গলের মধ্যে ফেলে দিয়ে এসেছে।

মাঝে মাঝে চাব পাঁচজন সমবয়সী নিয়ে বিশু ওৎ পেতে থেকেছে ঝোপের ধাবে। মশাল জ্বালিয়ে পালকি চলেছে এক গাঁ থেকে আর এক গাঁয়ে! নতুন বিয়ে করা বরবৌ কিংবা নায়েব চলেছে মহাল থেকে খাজনা আদায় কবে।

সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। প্রথমে বন্দুকধাবী ববন্দাজকে পিছন থেকে ঘায়েল করে তাবই হাতের বন্দুক কেড়ে নিয়ে লুঠপাট করেছে। লুটেব মাল সমস্ত নিয়ে সর্দারকে এনে দিতে হয়। দলেব এই নিয়ম। দামী গহনা থেকে শুরু কবে পাই পয়সাটি পর্যন্ত সর্দারের সামনে ফেলে দিতে হবে। একটু এদিক ওদিক হলে আস্ত রাখবে না সর্দার। মুণ্ড কেটে মাদাব গাছেব ডালে ঝুলিয়ে রাখবে।

এমনি এক পালকি লুট করে বিশু টাকা পয়সা বেশী পেল না বটে, কিন্তু নতুন বৌ গা থেকে একটি একটি করে সমস্ত গহনা খুলে দিল। নতুন বর তখন পালকির মধ্যে মূর্ছা গেছে।

সমস্ত অলঙ্কার পৌটলা বেধে সর্দারেব কাছে এনে দিতেই সর্দাব ভাগ বাটোয়ারা করতে বসল।

সোনার একজোড়া কান। মাঝখানে পাথব বসানো। সেটা তুলে নিয়ে সর্দার বিশুর হাতে দিল।

এই নে বিশে, ওটা তোর ভাগের। যা টেঁপীকে পরিয়ে দিয়ে আয়।

দলের সবাই হেসে উঠল। বিশু মাথা নিচু করে জিনিসটা নিয়ে উঠে আসার মুখেই চোখে পড়ল। মশালের আলোয় বাঘের মতন

জ্বল জ্বল করছে তু চোখের দৃষ্টি। একেবারে পিছনে বলাই বসে আছে।

কদিন ধরে বিশু খুঁজছে বলাইকে কিন্তু তার পাত্তা নেই। বিশুর ধারে কাছে ঘেঁষে না। চোখাচোখি হলেই সরে যায়।

বিশু ডাকলেও কোন ওজর আপত্তি ক'রে দলের আর সকলের মধ্যে গিয়ে বসে।

আর কিছু নয়। শুধু সোজাসুজি একবার জিজ্ঞাসা করবে বলাইকে। সেদিন টেঁপীব নামে ওসব বাজে কথা বলার কৈফিয়ত চাইবে।

সুযোগ জুটে গেল।

গুপী লেঠেল লাঠিখেলার পরীক্ষা নিচ্ছিল। এ পর্যন্ত যা শিখিয়েছে, সে সব কসরত ছাত্রেরা কেমন শিখেছে তাই দেখবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

দলের তুজন করে মুখোমুখি দাঁড়াল। লাঠি হাতে গুপী সঙ্কেত করতেই খেলা শুরু হ'ল।

বলাই আর বিশু সামনাসামনি দাঁড়াল। প্রথম প্রথম সস্তা প্যাঁচগুলো আরম্ভ হ'ল। তামেচা, বাহেরা, শির। তারপর তুজনেই মেতে উঠল। বিশু একটু বেকায়দায় পড়ে গেল। বলাই যেন ঠিক খেলার ভাবে নিচ্ছে না। শুধু লাঠির ঘাই জোর নয়, মুখ চোখের চেহারাও অন্যরকম। তু একবার নীতিবিরুদ্ধ ভাবেও বিশুকে আঘাত করার চেষ্টা করল।

সুরু থেকেই বিশু খুব সাবধানে খেলছিল নিজেকে বাঁচিয়ে। ইচ্ছা ছিল, খেলার ফাঁকে বলাইয়ের কাছে টেঁপীর কথাটা পাড়বে কিন্তু বলাইয়ের কাণ্ড দেখে সুযোগ পাচ্ছিল না। বার তুয়েক সে বলাইকে হুঁসিয়ারও করে দিল কিন্তু বলাই কানও দিল না তার কথায়।

গুপী লেঠেল একটু দূরে ছিল। আর কয়েকজনের খেলা লক্ষ্য করছিল। হাততালি দিয়ে থামবার নির্দেশ দিল। মিনিট কয়েকের বিশ্রাম।

বিশু .হাতের লাঠিটা ফেলে দেবার সঙ্গে সঙ্গে বলাইয়ের লাঠি বিদ্যুতবেগে তার কাঁধের ওপর এসে পড়ল। কাঁধটা চেপে ধরে বিশু চিৎকার করে উঠল যন্ত্রণায়।

বলাই থামল না। লাঠি ঘুরিয়ে আবার আক্রমণের চেষ্টা করল।

মাথাটা ঘুরিয়ে বিশু আক্রমণ এড়াল। তারপবই লাঠিটা কুড়িয়ে তীরবেগে বলাইয়ের দিকে তেড়ে গেল।

দলের অন্য সবাই ঝোপের আড়ালে বিশ্রাম করছে। গুপী লেঠেলও। কেউ লক্ষ্য করল না।

বলাইও ঘুরে দাঁড়াল লাঠি নিয়ে। বলাই পুবোনো সাকবেদ, কিন্তু বিশুর খেলার হাত অনেক ভাল। মারপ্যাঁচ সে খুব ভালভাবে আয়ত্ত কবেছে। মিনিট কয়েকের মধ্যে বলাইয়ের লাঠি ছিটকে পড়ে গেল আব বিশু বলাইয়েব লাঠিটা পা দিয়ে চেপে ধরে প্রাণপণে নিজের লাঠিটা তার মাথা লক্ষ্য করে চালাল।

ওই লাঠিব আঘাত মাথায় পড়লে বলাইকে মাটি নিতে হ'ত। জন্মের মতন। কিন্তু বলাই মাথাটা ঘুরিয়ে নিতে, লাঠিটা ওব গালের ওপর এসে পড়ল। ' সঙ্গে সঙ্গে ফিনকি দিয়ে রক্ত।

বাপ, বলে বলাই বসে পড়ল। বেশীক্ষণ বসতে পারল না। দু হাত দিয়ে গাল চেপে ধরে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

বলাইয়ের চিৎকারে দলের সবাই ছুটে এল। গুপী লেঠেল সব চেয়ে আগে।

ঈস্, এ কি করলি রে বিশে? নেত্য বিশুকে জিজ্ঞাসা করল।

বিশু কিছু উত্তর দেবার আগেই গুপী কথা বলল, বিশের দোষ নেই। আমি অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছিলাম, বলাই এলোপাথাড়ি

লাঠি হাঁকড়াচ্ছিল। এমন কি আমি হাততালি দেবার পরও বিশের কাঁধে বলাই লাঠি দিয়ে মেরেছে। বিশের মানুষের জান তো। কত আর সহ্য করবে। উচিত শাস্তি হয়েছে বলাইয়ের।

দলের সবাই চুপচাপ বসে বলাইয়ের সেবা করতে লাগল। এটুকু সবাই বুঝল, আর কিছু নয়, বোঝাপড়া হচ্ছিল দুজনের মধ্যে। টেঁপীকে নিয়ে।

বলাই একটু সামলে নিয়েই উঠে পড়ল। দলের একজন সঙ্গে যেতে চাইছিল কিন্তু বলাই হাত দিয়ে তাকে ঠেলে সরিয়ে দিল। লাঠিগাছটাও কুড়োল না।

খেলা ভেঙে গেল। গুপী লেঠেল উঠে পড়ল।

নেত্য বিশুকে একপাশে ডেকে বলল, একটু সাবধানে থাকিস বিশে। বলাইটা ক্ষেপে রইল। আড়াল আবড়াল থেকে কি করে বলা যায় না।

প্রথমে বিশু একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল কিন্তু গুপী লেঠেল তার কাজে সায় দিতে সাহস বেড়ে গেল।

গম্ভীব গলায় বলল, হাতে লাঠি থাকতে বিশে যমকেও ভয় পায় না। কি করবে কি আমার!

নেত্য আর কিছু বলল না। এখন তেতে রয়েছে, বুঝিয়ে লাভ নেই। রাগ কমে গেলে নিজেব থেকেই সাবধান হবে।

বিশু উঠতে নেত্যও উঠল। সঙ্গে সঙ্গে চলল।

বিশুই প্রথম কথা বলল, জানিস্, টেঁপী আজকাল আর আমার সঙ্গে কথা বলে না।

কথা বলে না? কেন?

ওই যে বলাইয়ের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম একদিন।

তুই আবার ওসব জিজ্ঞাসা করতে গেলি কেন?

এসব কথা সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করে ফেলাই ভাল। যাকে

নিয়ে ঘর করতে হবে তার সঙ্গে কোন লুকোচুরি করা ঠিক নয়।

নেত্য আর কিছুই বলল না, জঙ্গলের বাইরে এসে নিজের গ্রামের পথ ধরল।

সন্ধ্যার ঝোঁকে বিশুর ডাক পড়ল। সর্দারের ঘবে।

নিমে সর্দার একলা বসে আছে।

বিশু ঘরে ঢুকতেই জিজ্ঞাসা কবল, কিরে, বলার সঙ্গে তোর কি হয়েছে? গুপী বলছিল।

বিশু কিছুক্ষণ চুপ করে বইল, তারপব একটু একটু করে সব বলল। এমন কি টেঁপীর সম্বন্ধে বলাই যা বলেছিল, সব।

নিমে সর্দার হুঙ্কার দিয়ে উঠল, বলার জিভটা টেনে বেব করতে পারছি না। এক ঘা লাঠির চোট দিয়েই ছেড়ে দিলি?

বিশু নির্বাক।

কেরে, বাইরে কে আছিস। নিমে সর্দাব আবাব গর্জন করে উঠল।

বাইরে কেউ নেই। বিশু একবার উঠে উঠান অবধি দেখে এল, তারপর বলল, কেউ নেই এখানে। কিছু বলবে?

না, থাক। বলবার কিছু নেই। যা বললাম, তাই কববি। বলার সঙ্গে দেখা হ'লে শড়কী দিয়ে তার জিভটা ফুঁড়ে দিবি, ব্যস। বাঘের ঘবে ঘোগের বাসা।

বিশু আস্তে আস্তে বাইবে চলে এল। ঘরেব মধ্যে ঢুকতে গিয়েই থেমে গেল। টেঁপী দাঁড়িয়ে আছে দেয়ালে ঠেস দিয়ে।

বিশু ঢুকতেই টেঁপী এগিয়ে এল, কি হয়েছে, সর্দার অমন চেঁচাচ্ছিল কেন?

বিশু আবার বলল বলাইয়ের কথাটা। লাঠি মারার ব্যাপারটা চেপে গেল।

টেঁপী আরো সরে এল। বিশুর গা ঘেঁষে দাঁড়াল, বলল, তুমি মরদের কাজ করেছ। আমি সব শুনেছি। সেদিন তোমার ব্যবহারে আমার ঘেন্না হয়ে গিয়েছিল। এই তোমার ভালবাসা? আমার নামে লোকে কুৎসা রটাবে, আর তুমি কান পেতে তাই শুনবে?

বিশু উত্তর দিল না। একটা হাত বাড়িয়ে টেঁপীর একটা হাত আঁকড়ে ধরল। হেসে বলল, সর্দার তো ঢালা হুকুম দিয়ে দিয়েছে, বলাকে দেখলেই তার জিভ ফুঁড়ে ফেলতে।

তুমি সর্দারের হুকুমের আশায় ছিলে? আমি তার আগেই আমার কাজ করেছি।

কি করেছ?

তোমার কাছে শুনেই বলাইকে গিয়ে ধরলাম। পাল-পুকুরে ছিপ ফেলে বসেছিল, পিছন থেকে মারলাম টেনে এক চড়।

তুমি?

হ্যাগো আমি। কেন ভয় নাকি? আমার ওপর রাগের চোটটা তোমার ওপর গিয়ে পড়েছিল। বেকায়দায় তোমাকে ঘায়েল করতে চেষ্টা করেছিল।

বিশু চুপ করে রইল। খুব কাছে এসে দাঁড়িয়েছে টেঁপী। চুলের গন্ধ পাচ্ছে বিশু। দেহের সুবাসও। টেঁপীর জন্য বলাইকে মারতে দ্বিধা করে নি। টেঁপীকে পাবার জন্যই এই হাঙ্গামা। সেই টেঁপী আয়ত্তের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। তারিফ করছে তার বীর্যবত্তার।

দু হাত দিয়ে বিশু টেঁপীকে কাছে টেনে নিল। কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল, তোমাকে আমার কাছ থেকে কেউ নিয়ে যেতে পারবে না। কোনদিন নয়।

বলাই নিখোঁজ। নিমে সর্দার চর পাঠিয়ে সমস্ত কোপাইচণ্ডীর জঙ্গল তোলপাড় করে ফেলল, কোথাও বলাইকে পাওয়া গেল না।

দলেব লোক সর্দারেব হুকুমে কাছাকাছি হু একটা গাঁও খুঁজে এল। যদি বলাই লুকিয়ে থাকে কোথাও। কিন্তু তাকে পাওয়া গেল না।

কেউ কেউ বলল, বলাই পালিয়েছে। ধাবে কাছে নেই। আব কোন দলে গিয়ে জুটেছে। আবাব কেউ কেউ অন্য কথাও বলল, কিছু বলা যায় না। একটু গা ঢাকা দিয়ে বয়েছে বলাই। সুযোগ সুবিধা পেলেই প্রতিশোধ নেবে।

কথাটা নিমে সর্দাবেব কানে যেতেই সে চিৎকাব কবে উঠল, কে প্রতিশোধ নেবে? বলা! বাজপাখীব কাছে হুর্গা টুনটুনি!

কিন্তু কোথা দিযে কি হ'য়ে গেল। নিমে সর্দাব বিশু আব টেঁপীব বিয়েব দিন পর্যন্ত ঠিক কবে ফেলল। সামনেব মাসেব পনেবোই। তাব আগে একটা কাজ শুধু সাবতে হবে। বাজীদপুবেব লোচন চাটুয্যে এতদিন পবে পশ্চিম থেকে ফিবেছে। সঙ্গে অঢেল পযসা। ইচ্ছা আছে মোটা টাকা খবচ কবে শিবমন্দিব তৈবী কববে। টাকাটা খবচ হবাব আগে ঝাঁপিযে পডতে হবে। এ অভিযানেব নেতা বিশু। নিমে সর্দাবও সঙ্গে থাকবে, তবে দূবে দূবে। সাগবেদদেব কেবা-মতিটা দেখবে, বিশেষ কবে বিশুব কাবসাজি। সর্দাবেব জামাই হ'তে হ'লে এ পথেব কায়দাকানুন সব বপ্ত কবতে হবে বৈকি।

বিশু ঠিক কাজ হাসিল কবল। লোচন চাটুজ্যে কাঁপতে কাঁপতে পৈতেয় বাঁধা সিন্দুকেব চাবিব গোছা ফেলে দিয়েছিল, কিন্তু বাদ সাধল পুকুত মশাই। হু হাত দিযে সিন্দুক আঁকডে ধবে বলল, মন্দিব প্রতিষ্ঠার টাকা কাউকে ছুঁতে দেবে না।

অবশ্য প্রাণ থাকতে ছুঁতেও দেয় নি। বিশু শডকীব ফলায় পুকুতেব দেহ এফোঁড ওফোঁড় কবে তবে টাকায হাত দিতে পেরেছিল।

কাজ ফতে কবে এসে বিশু টাকাব পোঁটলাটা নিমে সর্দাবেব হাতে তুলে দিতেই সর্দাব বিশুর পিঠ চাপড়ে ছিল।

সাবাস বেটা। দলের নাম রাখবি তুই। দলের জন্য আর আমার ভয় নেই।

বাড়ী ফিরেই কিন্তু সর্দার মাথায় হাত দিয়ে পড়েছিল। টেঁপী নেই।

বিরাজমোহিনী বুড়ী টেঁপীর সঙ্গে থাকত। দেখাশোনা করত। আফিমের নেশায় অঘোরে ঘুমাচ্ছে। তাকে ডাকতেই সে হাঁউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠল।

সর্বনাশ, গেল কোথায় মেয়েটা। শেকল তুলে দিয়ে দুজনেই ঘরের মধ্যে শুয়েছিল। বিরাজমোহিনী চৌকাঠের কাছে আর টেঁপী জানলার পাশে। তারপর বিরাজমোহিনী ঘুমিয়ে পড়েছে। আর খেয়াল নেই। ঘরের শেকল খোলা।

খোঁজা শুরু হ'ল। খিড়কীর পুকুর, সামনের জঙ্গল, এমন কি বিশু পালপুকুরের ধারটাও খুঁজে এল। কোথাও নেই।

খোঁজ পাওয়া গেল ভাল করে রোদ উঠতে। পিছনে ঘন বাঁশ ঝাড়। খিড়কীর পুকুরের ওপারে। রাত বিরেতে দরকার হ'লে মেয়েছেলেরা ওখানে যেত। বিরাজমোহিনীর চিৎকারে সবাই গিয়ে জড়ো হ'ল।

ঘন বাঁশঝাড়ের মধ্যে পরনের শাড়িটা, তার একটু দূরেই জামরুল গাছের নিচে টেঁপীর সম্পূর্ণ নিরাবরণ দেহ। উপুড় হ'য়ে পড়ে আছে। পিঠের দু জায়গায় ছোরার দাগ। প্রচুর রক্ত পড়ে পিঠটা কাল হ'য়ে গিয়েছে।

নিমে সর্দার ছেলেমানুষের মতন কেঁদে উঠল। আছড়ে পড়ল দেহটার পাশে। বিশু দু হাঁটুর ওপর মুখ রেখে একদৃষ্টে চেয়ে রইল টেঁপীর দেহের দিকে। একদিন আগেই ওই দেহের উত্তপ্ত স্পর্শ সে পেয়েছিল। আজ সে দেহ নিথর, হিমশীতল। ও দেহে আর কোনদিনই স্পন্দন জাগবে না।

ওই দেহ স্পর্শ করে বলেছিল কেউ টেঁপীকে তার কাছ থেকে নিয়ে যেতে পারবে না। কোনদিন নয়। কথা রাখতে পারেনি বিশু। দুশমন টেঁপীকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। চিরজন্মের মতন।

বলাই ছাড়া আর কেউ নয়। সেই প্রতিশোধ নিয়েছে। তক্কে তক্কে ছিল, এ বাড়ীর আনাচে কানাচে, রাত্রে টেঁপী উঠে বাঁশবনের মধ্যে যেতেই তাকে শেষ করে দিয়েছে।

দু চোখ বেয়ে বিশুর জল গড়িয়ে পড়ল। যদি মরদ হয় বিশু, তো এর শোধ নেবে। টেঁপীর সঙ্গে বিয়ে হয় নি বিশুর, কিন্তু সব ঠিকঠাক ছিল। আর কটা দিন পরেই টেঁপী তারই হ'ত। তার পরিবারকে বলাই খতম করেছে, এ অপমান মুখ বুজে বিশু সহ্য করবে না। কিছুতেই নয়।

সব যেন স্বপ্নের মতন। টেঁপীর দেহটা বাঁশের ওপর চড়াল। ফুল নিয়ে এল দলের লোক। নতুন শাড়ি পরিয়ে, চুল এলো করে তাকে নিয়ে চলল পোড়াগাঁর শ্মশানে।

চিতার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠতে সর্দার ভাঙা গলায় বিশুকে ডাকল।

এই বিশে।

বিশু একটা গাছে হেলান দিয়ে চুপচাপ বসেছিল। অনেক কথা মনে পড়ছিল। শ্মশানে আসা তার এই প্রথম। মা বাপ যখন গেছে, তখন তার বোঝবার বয়স হয় নি। হয় তো এমনি ভাবেই বাঁশে বেঁধে তাদের নিয়ে আসা হয়েছিল। আগুন নিয়ে ছুঁইয়েছিল তাদের মুখে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সব শেষ। এত হাঁকাহাঁকি, লাফালাফি, তর্জন গর্জন সব এসে মেশে কয়েক মুঠো ছাইয়ে।

সর্দারের ডাকে বিশু চমকে উঠে দাঁড়াল। নিমে সর্দারের কাছে যেতেই সে বিশুর দিকে ফিরে বলল, টেঁপীর চিতার আগুন ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর, টেঁপীর যে এ অবস্থা করেছে তাকে তুই নিকেশ করবি?

এ একেবারে বিশুর মনের কথা। সর্দার বলবার আগেই সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছে। আর একবার আগুন ছুঁয়ে সেই কথাগুলোই আওড়াল।

সর্দার বেশ ভেঙে পড়ল। দিনকয়েক কোথাও বেরোল না। নিজের ঘরে চুপচাপ বসে রইল। মাঝে মাঝে চিৎকার করে উঠল, কালী, কালী, কালী। চিৎকার নয় যেন পাঁজরে গুলিলাগা বাঘের আহত আর্তনাদ।

বিশু এদিক ওদিক তন্ন তন্ন করে খুঁজল। দলবল নিয়ে নয়, একলা। কোথাও বলাই নেই। আশ্চর্য কাণ্ড, যেন পাখী হ'য়ে উড়ে গেল।

দিন গেল, মাস গেল। একটু একটু করে সামলে নিল নিমে সর্দার। একদিন বিশুকে ডেকে বলল, কিরে, তুই কি করবি ?

কিসের কি করব ?

বিয়ে থা করবি না ? করবি তো বল ঘটক লাগাই ?

না। নিজের কণ্ঠের দৃঢ়তায় বিশু অবাক হ'য়ে গেল।

সর্দার কোন কথা বলল না। কিছুক্ষণ চুপ করে একদৃষ্টে বিশুর দিকে চেয়ে রইল, তারপর আস্তে আস্তে বলল, তুই পারবি বিশে এ দলের ভার নিতে ?

বিশু অবাক। নিমে সর্দারের দলের ভার নেবে বিশু! তা কখন হয়। দলের অন্য লোক যে আপত্তি করবে।

মনের কথাটা বিশু সর্দারকে মুখ ফুটেই বলল।

সর্দার হুঙ্কার দিয়ে বলল, আমার কথার ওপর কথা বলবে এ রকম বুকের পাটা আছে দলের কারো ? আমাকে অমান্য করবে—

কথাটা আর শেষ করল না সর্দার। বোধ হয় বলাইয়ের কথাটা মনে পড়তেই থেমে গেল। এই তো দলের একজন সর্দারের চোখের

সামনে তার মেয়েকে খতম করে গেল, কি করতে পারল সর্দার? কি শাস্তি দিল তাকে? শাস্তি দেওয়া তো দূরের কথা, চুলের টিকিও ছুঁতে পারল না।

শুধু গায়ের জোর হ'লেই হয় না বিশে, বুদ্ধি থাকা চাই। বুদ্ধি, সাহস আর শক্তি এই তিনটে না থাকলে সর্দার হওয়া যায় না। তুই ভদ্রঘরের ছেলে, তোর বুদ্ধি আছে, পারিস তো তুইই পারবি। শেষ দিকে সর্দারের গলাটা যেন ভেঙে এল।

লক্ষ্য করেছে বিশু, সর্দারের সে দাপট যেন আর নেই। একটু পরিশ্রমেই ধুঁকতে থাকে। রাত্রে শিকারে বেরোয় বটে কিন্তু সরে সরে থাকে। আগের মতন আর দলের সামনে গিয়ে দাঁড়ায় না। মাঝে মাঝে লুটের মাল বখরা করার ভারও বিশুর ওপর দেয়। নিজে অবশ্য বসে থাকে সেখানে।

একদিন ভোরে পাঁচু খবর আনল।

নিমে সর্দার আর বিশু পাশাপাশি বসেছিল দাওয়াব ওপব, পাঁচু এসে হাজির। পাঁচু জাতে নাপিত কিন্তু জাত ব্যবসা ছেড়ে লাঠি ধরেছিল।[1] জোয়ান বয়সে অসীম ক্ষমতা ছিল শবীবে, বয়সেব সঙ্গে সঙ্গে একটু কাহিল হ'য়ে পড়েছে।

কি খবর রে পাঁচু, এতদিন ছিলি কোথায়? সর্দাব জিজ্ঞাসা করল।

মাস তিনেক পাঁচু দলের বাইরে ছিল। সর্দারকে বলেই গিয়েছিল, সর্দারের হয়তো খেয়াল নেই।

পিসির অসুখ শুনে গিয়েছিলাম, পিসিকে পুড়িয়ে ফিবছি।

তা হ'লে পিসির টাকাপয়সা বিষয় সম্পত্তি কিছু বাগিয়েছিস বল? সর্দার হাসল।

পাঁচুও হেসে বলল, তা কিছু পেয়েছি সর্দার। এক জোড়া ছেঁড়া থান, একটা থালা, একটা টোল খাওয়া ঘটি, আর আনা চারেক পয়সা।

পাঁচু থামল তারপর সর্দারের দিকে মুখ তুলে বলল, একটা কথা ছিল সর্দার।

বল ?

বলাইয়ের খোঁজ পেয়েছি।

কার ? সর্দার টান হ'য়ে বসল।

কথাটা বিশুর কানে ঠিকই গিয়েছিল। একটা হাত কোমরের ছোরায় রেখে সে সোজা হয়ে দাঁড়াল। ছোরাটা পকেটে গোঁজাই ছিল। একটু পরেই ছোরাখেলা করতে যাবার কথা। ছোরা খেলা শিখতে নয়, শেখাতে। দলে নতুন ছোকরা যারা ভর্তি হয়েছে, তাদের বিশু নিজের হাতে ছোরা খেলা শেখায়।

বলাইয়ের খোঁজ পেয়েছি।

কোথায় ? সর্দারের হুঙ্কারে মনে হ'ল যেন সে নবযৌবন ফিরে পেয়েছে।

সেলিমপুরে।

সেখানে কি করছে ?

পথ দিয়ে আসছিলাম, দেখলাম মাঠে লাঙল দিচ্ছে। প্রথমে ঠিক বুঝতে পারি নি, কিন্তু একটু এগিয়ে যেতেই চিনতে পারলাম।

বলা তোকে দেখতে পেয়েছে ?

বোধ হয় না।

ঠিক আছে। সর্দার বিশুর দিকে ফিরল, বিশে।

বিশু ততক্ষণে দাঁড়িয়ে উঠেছে।

পাঁচু, তুই বিশেকে নিয়ে বেরিয়ে পড়। বিশে, যদি কাজ হাসিল করে আসতে পারিস তবেই ফিরবি, শিকার যদি ফসকায় তো বাণেশ্বরীর জল আছে, মনে থাকে যেন। মাথা হেঁট করে যেন ফিরিস নি।

হঠাৎ কি মনে হ'ল বিশুর। যা কোনদিন করে নি, তাই করল।

নিচু হ'য়ে সর্দারের পায়ের ধুলো নিয়ে জোর পায়ে উঠান পার হ'য়ে গেল।

মাঝখানে দুজনে একটু থামল। বিশু একটা শড়কী আর একটা রামদা নিল আর পাঁচু একটা মাঝারি আকারের ছোরা। এ ছাড়া দুজনে দু জোড়া রণ-পাও নিল। এখান থেকে সেলিমপুর ক্রোশ ছয়েকের কম নয়। একটু তাড়াতাড়ি যাওয়া প্রয়োজন।

যখন পৌছল তখন ঝাঁঝাঁ দুপুর। রণ-পাগুলো জঙ্গলের মধ্যে রেখে দুজনে মেঠো পথ ধরল। শড়কীটাও বিশু শুকনো পাতাব স্তূপের মধ্যে লুকিয়ে রাখল।

দূর থেকেই স্পষ্ট দেখা গেল। একটা গাছের নিচে জন চারেক বসে আছে, তার মধ্যে একজন বলাই। ভোল পালটে ফেলেছে একেবারে। কদমছাঁট চুল, হাতে মাদুলি, পরনেব কাপড়ের ওপব গামছা বাঁধা। সবাই খেতে বসেছে। মাঝখানে পান্তা ভাতের রাশ।

ঘন বাঁশঝাড় আর আকন্দর ঝোপ। বিশু আর পাঁচু ঝোপের মধ্যে গিয়ে বসে রইল। বিশুর দুটো চোখ জ্বলছে। দৃঢ়বদ্ধ দুটি মুষ্টি, চওড়া বুকটা উত্তেজনায় ওঠানামা করছে। সামনে শিকার, শুধু একটু সুযোগের অপেক্ষা। একবার দলছাড়া হ'লেই আর দেখতে হবে না। বিশু বাঘের মতন ঝাঁপিয়ে পড়বে। টুঁটি টিপে রামদার ঘায়ে ধড় আর মুণ্ড আলাদা ক'রে দেবে একেবারে।

সুযোগ জুটে গেল। তিনজন শানকি হাতে করে উঠে গেল, বলাই তখনও বসে। বিশু গুঁড়ি মেরে এগোতেই পাঁচু তার একটা হাত চেপে ধরল। থামতে বলল ইশারায়। বাকি চাষীগুলো ফিরে আসছে।

এইবার বলাই উঠল। কোমরের গামছাটা খুলে কাঁধে নিল, তারপর হেলতে দুলতে চলতে শুরু করল।

খুব আস্তে পা ফেলে বিশু বাঁশঝাড়ের মধ্য দিয়ে অনুসরণ করল

একটু এগিয়েই পুকুর। তাল গাছের গুঁড়ি ফেলা। ভাতের থালাটা হাতে নিয়ে বলাই সাবধানে নামতে শুরু করল।

খুব সন্তর্পণে বিশু বাঁশঝাড় থেকে বেরিয়ে এদিক ওদিক দেখল, তারপর পুকুরের পাড়ে এসে দাঁড়াল। থালাটা পাশে রেখে ঝুঁকে পড়ে বলাই মুখ ধোবার চেষ্টা করছে। অনাবৃত পিঠ। এমন সুযোগ জীবনে দু বার আসে না।

বিশু দ্রুতপায়ে নেমে এল। একেবারে বলাইয়ের পিছনে। দুপুরের রোদে রামদাটা একবার ঝকমকিয়ে উঠল। তারপর ফিনকি দিয়ে উঠল তাজা রক্তের স্রোত। হুড়মুড় করে বলাই পুকুরের মধ্যে গিয়ে পড়ল।

একটু বোধ হয় পায়ের শব্দ হয়েছিল বিশুর। আওয়াজে বলাই মুখ ফিরিয়েছিল। মুহূর্তের জন্য, কিন্তু দেখতে বিশুর অসুবিধা হয় নি। সারা মুখের রক্ত নিমেষে নিঃশেষিত, দুটো চোখ বিস্ফারিত, অব্যক্ত একটা আর্তনাদের রেশ। বিশুকে চিনতে পেরেছে বলাই।

হাতের রামদাটা ছুঁড়ে পুকুরের মধ্যে ফেলে বিশু তীরবেগে বাঁশঝাড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ল। পাঁচু তার আগেই সরে গেছে। হামাগুড়ি দিয়ে বিশু এগোতে শুরু করল।

ইচ্ছা করেই রাতটা দুজনে গাছের ডালের ওপর কাটাল। ভোর হ'তেই রওনা দিয়ে নিমে সর্দারের আস্তানায় যখন পৌঁছাল তখন বেশ বেলা হয়েছে।

নিমে সর্দার উঠানে পায়চারি করছিল। দুটো হাত বুকের ওপর আড়াআড়িভাবে রাখা। দেখে মনে হল সর্দার বোধ হয় সারাটা রাত এমনিভাবে পায়চারি করেছে, একবারও বিছানা ছোঁয় নি।

পায়ের শব্দ হ'তেই সর্দার মুখ তুলল।

বিশু ছুটে আসছে, পিছনে পাঁচু।

খবর? নিমে সর্দার হুঙ্কার দিয়ে উঠল।

কাজ ফতে, বিশুর গলার স্বর সপ্তমে, পিঠ রামদা দিয়ে একেবারে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছি। মুখ দিয়ে একটি বোল ফুটতে দিই নি।

নিমে সর্দারের সমস্ত শরীরটা থর থর করে কেঁপে উঠল। বিশু ধরে না ফেললে বোধ হয় উঠানেই আছাড় খেয়ে পড়ত। বিশুকে জাপটে ধরে সর্দার ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠল। অসহায় শিশুর মতন।

বিশুরও জ্ঞান নেই। দু চোখ জলে ভরে এল। সেও ফুঁপিয়ে উঠল রুদ্ধ আবেগে।

আজ বোধ হয় বিশ বছরেরও আগের কথা। তবু কোন কিছু একটু আবছা নয়। রূপান্তরের কাহিনী। বিশু থেকে বিশাল। সেদিনের বামুনের গোবেচারা বাপমাখেকো ছেলে আজ দুর্ধর্ষ নরদানব। এক হুঙ্কারে কোপাইচণ্ডীর গাছের পাতা কেঁপে কেঁপে ওঠে।

দয়া, মায়া, স্নেহ কোমলবৃত্তিগুলো বিশাল উপড়ে ফেলে দিয়েছে।

পুরুষ, মেয়েছেলে কারুর রেহাই নেই। উদ্যত লাঠির সামনে আতঙ্কগ্রস্ত পুরুষের মুখগুলো দেখলে বিশালের মনটা খুশীতে ভরে যায়। সব যেন নরহরি মুখুজ্জের প্রতীক। এদের আবার ক্ষমা, এদের ওপর সহানুভূতি! মেয়েছেলেরা কেঁদে লুটিয়ে পড়েছে বিশালের পায়ে। মনে মনে সে হেসেছে। ভেবেছে খুড়ির দল লুটোপাটি খাচ্ছে মাটিতে। হাতযোড় করে পরমায়ু ভিক্ষা চাইছে। কিন্তু সেদিন কে আশ্রয় ভিক্ষা দিয়েছিল বিশুকে। অমানুষিক প্রহারের পর ব্যথায় জর্জরিত দেহ নিয়ে যখন সে কাতর চোখে খুড়িদের দিকে চেয়েছিল, তখন পরিবর্তে পেয়েছিল তিনজোড়া চোখের ব্যঙ্গভরা হাসি, পানের রসে রাঙা ঠোঁটের কোণে উপেক্ষা আর ঘৃণার ছাপ।

প্রচণ্ড হুঙ্কার করে বিশাল হাতের খাঁড়াটা নামিয়ে আনে।

মারা যাবার আগে সর্দার বিশালের হাতে নিজের খাঁড়া আর লাঠিটা দিয়ে বলেছিল, আজ মানুষের সমাজ আমাদের ভাল চোখে দেখলে আমরা ডাকাত হতাম না বাবা। তারা ঘেন্নায় মুখ ফিরিয়েছে, ঘাড় ধাক্কা দিয়ে পথে বের করে দিয়েছে, একফোঁটা দয়া মায়া দেখায় নি, তাই আজ তাদের জন্যও আমাদের, ছিটে ফোঁটা দয়া মায়া নেই। বনের বাঘ ভালুক আমাদের দোস্ত, মানুষ আমাদের শত্রু।

ঠিক কথা, মানুষ আমাদের শত্রু। মনে মনে বিশাল, সর্দারের প্রাণহীন দেহটা কোলের ওপর নিয়ে, বিড় বিড় করে বলেছে, গোবিন্দপুর কি শুধু একটা? সারা দুনিয়ায় লক্ষ লক্ষ গোবিন্দপুর ছড়িয়ে আছে। গোবিন্দপুরের মানুষের মতন কোটি কোটি মানুষ। লম্পট জমিদার প্রতাপ নন্দী, কুটিলস্বভাব পঞ্চানন চক্রবর্তী, স্বার্থান্বেষী রামগোবিন্দ গোসাঁই, নরহরি মুখুজ্জে, বিদ্যাভিমানী কাশীপতি ন্যায়রত্ন, মিথ্যাবাদী বলাই। কুমু, কুমই বা কি। সে রাত্রে সেও ভুল বুঝল বিশুকে। সে ভেবেছিল ফুসলিয়ে বুঝি শহরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে বিশু, কিন্তু সর্দারের লাঠি ছুঁয়ে বিশাল বলতে পারে, এসব কথা তার একবারের জন্যও মনে হয়নি। সে শুধু চেয়েছিল কুমুর দুঃখ দূর করতে। বামুনের ঘরের সুন্দরী বিধবা, কত ভাল ভাল ছেলে হয়তো তাকে বিয়ে করতে এগিয়ে আসত। বিদ্যাসাগর জোগাড় করে দিতেন।

এসব কথা কুমু তাকে বলতেও দেয়নি। গালাগাল দিয়ে হটিয়ে দিয়েছিল।

হঠাৎ বিশাল কান খাড়া করে ফেলল। পাতা মাড়িয়ে মাড়িয়ে কে যেন আসছে। সতর্ক হরিণ কিংবা সন্ত্রান্ত মানুষও হ'তে পারে। গাছের তলায় বিশাল টান হ'য়ে শুয়ে পড়ল।

পোড়াগাঁ থেকে বিশালই চলে এসেছে। আস্তানা পেতেছে

কোপাইচণ্ডীর জঙ্গলে। ওদিকে বন সাফ করে বসতি হ'চ্ছে। তাছাড়া একদিকে নদী থাকায় পালাবার একটা পথ বন্ধ। তার চেয়ে কোপাইচণ্ডীর জঙ্গল আরো নিবিড়।

একটা শুধু আক্ষেপ বিশালের, ওই রকম গাদা বন্দুক যদি দু'একটা পাওয়া যায়। সেপাইদের হাতে যেমন থাকে কিংবা জমিদার-দের পাইক-বরকন্দাজদের ঘাড়ে। কল টিপলেই আগুনের ফোয়ারা। দূর থেকে মানুষ ঘায়েল করার পক্ষে চমৎকার।

এই ক'বছরে খুন জখম বড় কম করে নি বিশাল। খাঁড়ার কোপ বসিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে দেখেছে, ছটফট করে মরা মানুষের কাতরানি, ফিনকি দিয়ে রক্তের স্রোত, তারপর আস্তে আস্তে সব ঠাণ্ডা। এও সর্দারের কাছে শেখা।

এক কোপে সাবাড় করলে তো ছেলের কাজ করলি রে। নড়ল না, চড়ল না, একেবারে পটল তুলল। ওতে মজা নেই। তার চেয়ে এই চেয়ে দেখ।

দু'হাঁটুর মধ্যে হাঁসটাকে চেপে ধরে সর্দার তার মাথায় লোহার পেরেক ঠুকে দিত। অসহ্য যন্ত্রণায় হাঁসটা চিৎকার করে উঠত। প্রাণান্ত চিৎকার। পাখার ঝাপটানি। তারপর আস্তে আস্তে নিস্তেজ হ'য়ে পড়ত।

শেয়ালের বেলাতেও তাই। পাঁজরে বেঁধা ছুরির ফলা নিয়ে উঠান তোলপাড় করে ফেলত। রক্তের ধারা সারা উঠানময়। অশ্রান্ত গোঙানি। একসময়ে সব ঝিমিয়ে আসত। চারটে পা ছুঁড়ে শুয়ে পড়ত এক পাশে। ধারালো দাঁতের ফাঁক দিয়ে জিভটা বেরিয়ে পড়ত। বিস্ফারিত দুটি চোখ।

কেমন একটা নেশা লাগত বিশালের। নিজের হাতেও অনেকবার করেছে। প্রথমে বনের পাখী, সাপ, বুনো কুকুর, বাচ্চা হরিণ, তারপর মানুষে হাত দিয়েছে। তবে মানুষের বেলাতেই চরম মজা। লম্বা-

চওড়া জলজ্যান্ত একটা মানুষের আছড়ানি, বাঁচবার আগ্রহে নাগালের মধ্যে পাওয়া গাছের ডালপালা শিকড় আঁকড়ে ধরা, তারপর ছিটকে পড়ে মাটির ওপর। বার দুয়েক হাত পা ছুঁড়ে, একেবারে খতম।

সকাল থেকে বিশালের শরীরটা ম্যাজ ম্যাজ করছিল। ভেবেছিল বেরোবে না, কিন্তু দুপুর হ'তেই মনটা চনমন করে উঠল। দেয়ালে টাঙান রামদা হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। খবর এসেছে, ভুবনপুর চটি থেকে একদল লোক রওনা হ'য়েছে, যাবে শ্রীক্ষেত্রেব দিকে। বিশালের দলের ভোলা সঙ্গে রয়েছে। পাণ্ডা সেজে। ভুলিয়ে ভালিয়ে এ পথেই নিয়ে আসবে।

আধখানা কপাল যেন ফেটে পড়ছে। বিশাল চোখ চাইতে পারছে না। কিন্তু আজ বাড়ীতে শুয়ে থাকলে চলবে না। যাত্রীর ভারি দল আসছে। বিশাল না থাকলেই লুটের মাল নিয়ে তার দলেব মধ্যে ঝগড়া বাধবে। মারপিট, খুনোখুনি হওয়াও আশ্চর্য নয়।

বামদাটা কোমরে ঝুলিয়ে বিশাল গোলপাতার ঝোপের পিছনে গিয়ে বসল।

ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক, ছুটন্ত কাঠবেরালীর পায়ের চাপে খসে পড়া শুকনো পাতার শব্দ, মাঝে মাঝে ঘাসের ওপর সাপের ছুটে যাওয়ার আওয়াজ। তাছাড়া কোথাও আলোড়ন নেই। সারা কোপাইচণ্ডীর জঙ্গল আরামে দিবানিদ্রা দিচ্ছে।

বিশালের একটু ঝিমুনি এসেছিল, হঠাৎ শব্দ হ'তেই উঠে বসল। টিন পেটানোর আওয়াজ। মাঝে মাঝে যাত্রীদের সম্মিলিত গলার স্বব, জয় প্রভু জগন্নাথ। অগতির গতি, দীনের শবণ, কৃপা কর প্রভু।

দাঁতে দাঁত চেপে বিশাল একটা শব্দ করল। বলল, প্রভু কৃপা করবে তোদের, আর দেরী নেই, একেবারে কোলে টেনে নেবে।

এ নামগান ঠিক যে প্রভুর কৃপার জন্য তা নয়, সব যাত্রীরাই এই ধরনের কিছু একটা আওড়াতে আওড়াতে আসে। ভগবানের নাম করাও হয়, আবার জোর আওয়াজে হিংস্র জন্তুরাও দূরে সরে থাকে।

রামদাটা কোমর থেকে খুলে হাতে নিয়ে বিশাল সন্তর্পণে এগিয়ে গেল। গাছের আড়াল দিয়ে দিয়ে।

দলের আর সবাই এগিয়ে আছে। পায়ে চলা পথের পাশে পাশে।

বিশাল থাকে সব চেয়ে পিছনে। যাত্রীদের কেউ এদিক ওদিক পালাবার চেষ্টা করলে টুঁটি টিপে ধরে। তারপর এক ঘায়েই খতম।

হঠাৎ জঙ্গলের নীরবতা ভেদ করে আর্তস্বর ভেসে উঠল। দলেব লোকজন কাজ শুরু কবেছে। একজন ঘায়েল। সঙ্গে সঙ্গে আবো অনেকগুলো ভীত, সন্ত্রস্ত কণ্ঠস্বর। ডাকাতদের অট্টহাসি। দূবেব ঝোপে ঝোপে তীব্র আলোড়ন। জাপটা-জাপটি চলেছে। কেউ হয়ত শেষ চেষ্টা করছে সম্পদ বাঁচাবাব।

হাসি পেল বিশাল সর্দারের। এ বীবত্ব এখনি থেমে যাবে। ধনপ্রাণ কোনটাই বাঁচবে না।

আচমকা গাছেব ফাঁকে সাদা কাপড়ের টুকবো একটা দেখা যেতেই বিশাল সুঁদরিগাছের গুঁড়িব সঙ্গে মিশিয়ে দিল নিজেকে। বজ্রমুষ্টিতে রামদাটা চেপে ধরল। দলের সকলের চোখকে ফাঁকি দিয়ে কে একজন পালিয়ে আসছে। আসুক, ওর যম রয়েছে পথ আগলে। পালিয়ে যাবে কোথায়।

বিশালের কথাই ঠিক। ঘাড় অবধি ঝাঁকড়া চুল, শীর্ণ চেহারার একটা লোক এদিক ওদিক চেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে। পরনে বাসন্তী রংয়ের ধুতি, গায়ে সেই রংয়েরই উত্তরীয়।

বিশাল পায়ে পায়ে আরো এগিয়ে গেল। পলক পড়ছে না চোখের। পাছে শিকার হাতছাড়া হয়।

লোকটা খানিকটা হামাগুড়ি দিয়ে আবার দাঁড়িয়ে উঠল। গায়ের উত্তরীয়টা খুলে একবার এদিক ওদিক দেখে নিল।

বিশালের চোখ এড়াল না। বুকের সঙ্গে কাপড়ের ফালি দিয়ে বাঁধা। কৌটোর মতন কি একটা উঁচু হয়ে রয়েছে।

গোঁফে তা দিয়ে বিশাল হাসল। ওতো শুধু বুকে বেঁধেছে, পাঁজরের ভিতর লুকোনো জিনিসও বিশাল শড়কীর ফলায় ঠিক টেনে বের করবে। দা দিয়ে কুপিয়ে উদ্ধার করবে গোপন সম্পদ।

মুহূর্তের জন্য চোখাচোখি, তাতেই লোকটা শিউরে উঠল। একটু থেমেই তীরবেগে আড়াআড়িভাবে ছুটল গোলপাতার ঝোপ আর কেয়াবনের মধ্য দিয়ে।

বিশাল তৈরীই ছিল। সঙ্গে সঙ্গে পিছনে ছুটল। আশ্চর্য কাণ্ড, প্রাণপণে ছুটেও বিশাল লোকটার নাগাল পেল না। ভীরু হরিণের মতন গতি। বিদ্যুতকে হার মানানো।

ছুটতে ছুটতেই বিশাল রামদাটা হাত দিয়ে ঘোরাতে লাগল। অব্যর্থ লক্ষ্য। আর নিস্তার নেই।

ঠিকই তাই, তাক করে ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে করুণ চিৎকার। পায়ে চোট খেয়ে লোকটা উপুড় হ'য়ে ঘাসের ওপর পড়ল। আর ওঠার সাধ্য নেই। হাঁটুর ওপর পড়েছে দায়ের কোপ। তবুও লোকটা বুকে হেঁটে এগোবার চেষ্টা করল। সাপের মতন ঘসড়ে ঘসড়ে কিছুটা।

কিন্তু ততক্ষণে বিশাল এসে পড়েছে। রামদাটা কুড়িয়ে নিয়ে উল্টো পিঠ দিয়ে সজোরে তার মাথার ওপর আঘাত করল। ফট করে একটা শব্দ। ফিনকি দিয়ে রক্তের স্রোত। চাপা গোঙানিতে সারা বনভূমি কেঁপে উঠল। অট্টহাসিতে বিশাল আকাশ ফাটিয়ে দিল।

কোপাইচণ্ডীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে বিশালকে ফাঁকি দিয়ে মাল নিয়ে পালাবে, তা'কি হয় চাঁদ? মিছামিছি বেঘোরে প্রাণটা দিলে। এসব ধনরত্ন কি তোমার সঙ্গে যাবে মানিক?

কথার সঙ্গে সঙ্গে বিশাল পা দিয়ে লোকটার দেহটা সোজা করে দিল। ঝুঁকে পড়ে ক্ষিপ্রহাতে বুকের বাঁধন খুলতে আরম্ভ করল। চৌকো মতন শক্ত কি একটা। বোধ হয় বাক্সই হবে। দামী পাথর কিংবা সোনার টুকরো, কিছুই বলা যায় না। যাই হোক, দলের সবাইকে আবার ভাগ দিতে হবে। চুলচেরা হিসাব। তার চেয়ে মালটা সরিয়ে ফেলাই ভাল। দলের সবাই অন্য দিকে ব্যস্ত। এইবেলা আর কারুর নজরে পড়বে না।

রামদাটা ঘাসের ওপর মুছে নিয়ে বিশাল কাপড়শুদ্ধ জিনিসটা চেপে ধরে দৌড়াল। ঘাঁটি একটা নয়, গোটা তিনেক। প্রায়ই বিশাল ঠাঁই বদল করে। লালমুখো সায়েবগুলো আজকাল বড় ঝামেলা শুরু করেছে। ওদের টাকা একবার লুট হবার পর থেকেই জোর খবরদারী। মাঝে মাঝে জঙ্গলের কাছাকাছি এসে ফাঁকা বন্দুক ছোঁড়ে। বোধ হয় ভয় দেখায়। একটু ভুল হয়ে গিয়েছিল বিশালের। অতটা খেয়াল ছিল না। রানারটাকে একেবারে জানে শেষ করে দিলেই হত। গিয়ে আর কর্তাদের কাছে কাঁদুনি গাইতে পারত না। তা না করে, সবাই যখন টাকা গুণতে ব্যস্ত, তখন ব্যাটা গুটি গুটি সরে পড়েছে। সকলের চোখে ধুলো দিয়ে। আফসোসে বিশাল এখনও হাত কামড়ায়।

ভাঙা ঝরঝরে বাড়ী। পাতলা পাতলা ইঁটের গাঁথুনি। প্রায় ভগ্নস্তূপ। জানলা, দরজার বালাই নেই। অন্তত বাইরে থেকে তাই মনে হয়, ভিতরে কিন্তু বন্দোবস্ত ভাল। বিশালরাই করে নিয়েছে। মেরামত করে দিব্যি বাসের উপযোগী। এক সময়ে পর্তুগীজদের আস্তানা ছিল। জলদস্যুদের চোরাই মাল জমা করার আড়ত। এখন বিশাল সর্দারের আস্তানা হয়েছে। নির্ভয়ে এখানে লুকিয়ে থাকা যায়। দিনের পর দিন।

এদিক ওদিক চেয়ে বিশাল ইঁটের ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়ল। দিনের

বেলাতেও বেশ অন্ধকার। কোলের মানুষ দেখা যায় না। চোখ অভ্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত হাতড়ে হাতড়ে পথ চলতে হয়।

মেঝেয় বসে কাপড়ের গিঁট খুলতে শুরু করল। একটার পর একটা। শেষ যেন আর হয় না। গিঁটেরও অন্ত নেই। জিনিসটা দামী সে বিষয়ে বিশালের সন্দেহ রইল না। মণিমুক্তোও হতে পারে কিংবা সোনার বিগ্রহ।

কোনটাতেই বিশালের অসুবিধা নেই। ননী-স্যাকরা রয়েছে, হাতের লোক। চোখের সামনে গালিয়ে হাতে হাতে দাম দিয়ে দেবে। অন্য লোকের সঙ্গে দর-দস্তুর করে, চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা, কিন্তু বিশাল সর্দারের কাছে একেবারে কেঁচো। টুঁ শব্দটি পর্যন্ত নয়।

সাদা কাপড় শেষ হ'ল, এবার লাল কাপড়ের শুরু। বিশালের হাত টন টন করে উঠল। জানলার ধারে গিয়ে বসল। তাতেও হ'ল না। মেঘে ঢাকা আকাশ। ঘরের মধ্যে কিছু দেখবার উপায় নেই।

তাকের ওপর থেকে দেশলাই পেড়ে বিশাল তেলের কুপী জ্বালাল। অন্ধকারে ঠিক চেনা যাবে না, বোঝা যাবে না ঝুটো পাথর, না সাচ্চা! কিছুটা আজকাল বিশালও চিনতে পারে। সাচ্চাই হবে, না হ'লে আর মানুষ গিঁটের পর গিঁট দিয়ে বুকের সঙ্গে বেঁধে রাখে!

শেষ কাপড়টা সরিয়েই বিশাল মাথায় হাত দিয়ে বসল। দেখল উল্টে পাল্টে। বাতির খুব কাছে ঝুঁকে পড়ে নেড়ে চেড়ে। কিন্তু কোথাও কিছু নেই। পুঁথি। হাতে লেখা। হলদে তেলচিটে কাগজ। তার ওপর গোটা গোটা অক্ষর। এর জন্য এত!

তারপরই কথাটা বিশালের মনে পড়ে গেল। তাও তো হ'তে পারে। দু'একজনের মুখে শুনেওছে এমন ধরনের ব্যাপার। চার লাইন ছড়া, তার মধ্যে নির্দেশ দেওয়া থাকে। খুব অল্প কথায়।

শ্মশানের পূব-দক্ষিণে, আমড়াতলা নাও চিনে।
সেখান থেকে আড়াই পা, সারা জীবন বসে খা ॥

এক গরীব ব্রাহ্মণ সাত ঘড়া আকবরী মোহর পেয়ে গিয়েছিল। বাদশাহী আমলের গুপ্তধন। সে রকম যদি কিছু হয়! কিছু আশ্চর্য নয়, মুসলমানদের অত্যাচার আব বর্গীদের হামলার সময় মানুষ ধনদৌলত সব পুঁতে রাখত মাটির তলায়। গোলমাল থেমে গেলে সেই সব ধনরত্ন তুলে নিত। তবে এমনও হয়েছে, এক জনের ধন, আর একজন তুলে নিয়েছে। ফকিরের বরাতে আমিরী জুটে গেছে, আবার সম্পন্ন গৃহস্থ সব হারিয়ে মাথা চাপড়েছে সারাজীবন।

কিছু নিশ্চয় আছে, নয়ত বুকের মধ্যে এভাবে লুকিয়ে কখনও কেউ চলাফেরা করে। উদ্যত খাঁড়ার সামনেও আত্মসমর্পণ করে না। তাই হবে। তীর্থে যাবার আগে সব কিছু কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। ফিরে এসে পাছে জায়গাটা গোলমাল হয়ে যায়, তাই একেবারে পুঁথিতে লিখে ফেলেছে সব।

কিন্তু ওই লেখাই সার। ধনরত্ন আর ভোগে লাগল না। বিশাল সর্দারের চোখকে ফাঁকি দেওয়া অত সহজ নয়।

পুঁথি খুলতে গিয়েই বিশালের মনে পড়ে গেল। সাবধান হওয়া ভাল। দলের লোকরা চট করে অবশ্য ওর খোঁজে এখন আসবে না। অন্তত আজকের রাতটা তো নয়ই। মালপত্র ভাগাভাগি হবে আজ রাত্রে। বিশালকে একটু খুঁজবে হয় তো। ওই পর্যন্ত। ভাববে সর্দার নিশ্চয় দীনবন্ধুর দোকানে পড়ে আছে। সময় হ'লে ঠিক আসবে।

ভাগবাঁটোয়ারা হ'য়ে গেলে ফুর্তি চলবে রাতভোর। তখন আর সর্দারের কথা মনেই থাকবে না। তবু বলা যায় না। সাবধানের মার নেই। আস্তে আস্তে উঠে বিশাল দরজাটা বন্ধ করে দিল। খিল নেই। কাঠও ফোঁপরা হয়ে গেছে। এদিক ওদিক চেয়ে বিশাল

কোণে রাখা ভাঙা তক্তপোশটা টেনে এনে দরজার পাশে চেপে দিল। ব্যস, আর ভয় নেই। হঠাৎ কেউ দরজা খুলতে পারবে না। তা ছাড়া, এ আস্তানায় বিশাল আসেও না আজকাল। এতদূর আসার দরকারও হয় না। শুধু এই হতভাগাটা না-হক উল্টো পথে ছুটিয়ে এদিকে নিয়ে এসেছে।

দেয়ালে ঠেস দিয়ে বিশাল ভাল করে বসল। তেলের কুপীটা কাছে টেনে নিয়ে এল।

প্রথমে সরস্বতীবন্দনা। পাতাটা বিশাল উল্টে গেল। সব ব্যাপারেই মঙ্গলাচরণের একটা পদ্ধতি আছে, ওটার মধ্যে দরকারী কোন কথা থাকে না। পরের পাতায় দু লাইন করে লেখা। বানান করে করে বিশাল পড়ল। হাতের লেখাটা খুব স্পষ্ট। পড়তে কোন অসুবিধা হয় না।

কান্দ কেন শচীমাতা, কান্দ কেন বল।
নিমাই ছেড়েছে বাটি, জীবন বিফল॥

খুব আস্তে আস্তে বিশাল পড়ল। এর মধ্যে গুপ্তধনের কোন ঠিকানা আছে নাকি? সম্পত্তি কোথায় রাখা আছে, তার কোন হদিশ! এমনিতে তো মনে হচ্ছে নিমাই-সন্ন্যেসীর ব্যাপার। ছেলেবেলায় গোবিন্দপুরে থাকতে নিমাইয়ের পালা দু একবার শুনেছে। একবার তো মুখুজ্জের উঠানেই যাত্রা বসেছিল। বিখ্যাত যাত্রার দল। বামুনদের তামাক দেবার ফাঁকে ফাঁকে বিশাল শুনেছে। চোখে জল এসে যেত তখন। শচীমায়ের দুঃখে প্রাণ আকুলি বিকুলি করত।

কান্দে পশু, কান্দে পাখী, কান্দে গাছপালা।
কান্দে সারা নবদ্বীপ, কান্দে পুরবালা॥

বিশালের বেশ মনে পড়ছে। যাত্রার আসরে আছাড়ি পিছাড়ি খেয়ে শচীমাতা কাঁদতেন। পিছন থেকে বেহালার সুর। সব চুপচাপ। ছুঁচটি পড়লেও যেন শব্দ হয়। শচীমাতার দুঃখ সকলের দুঃখ হ'য়ে

ওঠে। একটি মাত্র ছেলে, চোখের মণি। তার কথা ভেবে পাগল হ'য়ে যান শচীমাতা। কিসের দুঃখ নিমাইয়ের, কিসের অভাব! শচীমাতা কোন জিনিস তাকে দিতে পারেন নি, যার জন্য রাতের অন্ধকারে সে ঘর ছাড়ল?

শুন শুন শচীমাতা কহি সবিশেষ।
ঘুচাতে প্রাণীর দুঃখ ছাড়িলাম দেশ॥

হঠাৎ শচীমাতা শুনতে পেলেন কোথা থেকে যেন নিমাইয়ের স্বর ভেসে আসছে। একি দৈববাণী! নাকি নিমাইয়ের গলার নকল ক'রে আর কেউ শচীমাতাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছে!

বুঝতে বিশালের কষ্ট হ'ল না। সোজা সোজা কথা, ছোট ছোট লাইন।

নিমাইয়ের মতন বিশালও দেশ ছেড়েছিল। রাতের অন্ধকারে মানুষজনকে লুকিয়ে নয়, দিনের আলোয়, মানুষের অত্যাচারে। এ ছাড়া তার উপায় ছিল না। কিন্তু দেশ ছেড়ে এসে কি করল বিশাল! প্রাণীদের দুঃখমোচন দূরে থাক, নিজের জন্য কি করল! ধাপে ধাপে আরও তো নিচে নেমে গেল। আরো নরকের অন্ধকারে।

পাপ থেকে উদ্ধারিতে মূঢ় পাপীজন।
নবদ্বীপে জন্ম নিল নিজে নারায়ণ॥

বিশাল টান হ'য়ে বসল। এগিয়ে গেল আলোর কাছে। স্বয়ং ভগবান এসেছেন ত্রাণকর্তারূপে। পাপী তাপীকে ঘৃণা নয়, উদ্ধার করার জন্য নিজে পৃথিবীর ধুলো মাটি অঙ্গে মেখেছেন।

সর্বভূতে নারায়ণ চরাচরময়।
সর্বস্থলে ভগবান জানিহ নিশ্চয়॥

ঠিক এ ধরনের কথা বিশাল কখনও শোনে নি। কেউ বলে নি ওকে। সব জায়গায় ভগবান? ইট, কাঠ, পাথরে? এই কোপাই-চণ্ডীর জঙ্গলে? বিশালের মধ্যেও? ওর অনুচরদের মধ্যে? তাহলে,

বিশাল পুঁথি মুড়ে উঠে দাঁড়াল। সব কেমন গোলমাল হ'য়ে যাচ্ছে। লোহার মতন বুকের পাটা, শক্ত সমর্থ হুটো হাত, অসুরের মতন শরীর, কিসের একটা চাপে যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। নিজেকে কাদার তালের সামিল মনে হ'চ্ছে। তুলতুলে নরম। যে লোকগুলোকে শড়কীর খোঁচায়, দায়ের কোপে, লাঠির ঘায়ে বিশাল নিকেশ করে দিয়েছে, তাদের মধ্যেও ভগবান আছে! ভগবানকেও আঘাত করেছে বিশাল?

পাতার পর পাতা বিশাল পড়ে গেল। একাগ্রমনে। রাত কেটে ভোর হ'ল। কাক ডাকতে শুরু করল। এক সময়ে নিভে গেল তেলের কুপী। শচীমাতার হুঃখে, বিষ্ণুপ্রিয়ার ব্যথায় বিশালের হুটো চোখ ঝাপসা হ'য়ে এল।

জগন্নাথ, দীননাথ, দীনের শরণ।
কালামুখী মোর কেন হয় না মরণ॥

রোজ সকালে উঠে শয্যা ঝাড়ে, স্বামীর অঙ্গের পরিচ্ছদ সাজিয়ে রাখে। প্রভুর ফেলে যাওয়া খড়ম আসনের ওপর রেখে তন্ময় হ'য়ে বসে থাকে প্রহরের পর প্রহর।

দিন কোনরকমে কেটে যায়, কিন্তু রাত এলেই বিষ্ণুপ্রিয়ার গা ছম ছম করে। অথচ শ্বাশুড়ীর কাছে শুতেও ইচ্ছা করে না। বিষ্ণুপ্রিয়া বিছানায় গা এলিয়ে দিলেই—

কোথা থেকে নুপূরের ধ্বনি ভেসে আসে।
সারা ঘর ভরে যায় ফুলেব সুবাসে॥

শুধু কি তাই। কে যেন বলে,—

মোহনিদ্রা ভাঙ রাই, দেখ হ'ল বেলা।
শেষ কর হুদিনের পুতুলের খেলা॥

পুতুলের খেলা! বিশাল হুটো ভ্রূ কুঁচকে ভাবতে লাগল। তা ছাড়া আর কি! পুতুলের খেলাই তো। প্রথম প্রথম কতদিন

মাঝরাতে বিশাল চিৎকার করে উঠেছে। অস্পষ্ট গোঙানী। শড়কীর ফলায় ছিন্নভিন্ন মানুষের বিকৃত মূর্তি। সার দিয়ে দাঁড়িয়েছে বিশালের বিছানার পাশে। তারই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের পরিণতি। অনেক ধনরত্ন চুরি করেছে বিশাল, কিন্তু তার এক কণাও কি জমাতে পেরেছে? অনেক প্রাণও নষ্ট করেছে, কিন্তু তার সব পাপ জমা হয়ে আছে। একটু ক্ষয় হয় নি। ক্ষয় হওয়ার মতন পুণ্যকাজও সে করে নি।

নেশা ধরেছিল, নেশার আমোদের জন্য নয়, নিজেকে ভুলিয়ে রাখবার জন্য। নিষ্কৃতি পাবার জন্য পাপের ছবিগুলোর কাছ থেকে।

এই কি জীবন! এক আস্তানা থেকে আর এক আস্তানায় পালিয়ে বেড়ানো, এক জঙ্গল থেকে আর এক জঙ্গলে আত্মগোপন। কিন্তু কতদিন এভাবে লুকিয়ে বেড়াবে! কোথা থেকে, কার কাছ থেকে? সব জায়গায় যদি ভগবান, সকলের মধ্যে, তবে তাঁর কাছে তো অনেক দিনই বিশাল ধরা পড়ে গেছে। অবসান হয়েছে এই লুকোচুরি খেলার।

বিশাল আবার পুঁথির পাতায় মন দিল।

কলসীর কানা ছোঁড়ে জগাই মাধাই।
কোল দেরে, কোল দেরে, কাঁদিছে গোসাঁই॥
কোল দেরে জগতের পাপীতাপীজনে।
চণ্ডাল ব্রাহ্মণে ভেদ না রাখয়ে মনে॥

বিশাল আর সামলাতে পারল না নিজেকে। বাঁধ-ভাঙা স্রোতের মতন অনর্গল জলের ধারা বুক ভাসিয়ে দিল। জগাই মাধাইয়ের চেয়েও বিশাল ঘোরতর পাপিষ্ঠ। শুধু কলসীর কানা নয়, আরো মারাত্মক অস্ত্র দিয়ে সে আঘাত করেছে ভগবানের অঙ্গে। নৃশংসভাবে হত্যা করেছে।

বিশাল হাঁটু মুড়ে বসল। পুঁথিটা কোলের ওপর তুলে নিল, আবার পড়তে লাগল। জলে চোখ ঝাপসা। বার বার দেহটা কেঁপে

কেঁপে উঠছে। পুঁথির অক্ষরগুলো একাকার। অক্ষর নেই, চোখের সামনে অজস্র মানুষের ছিন্ন দেহ, জমাট বাঁধা রক্তের ছোপ।

বিশালের কি ত্রাণ নেই। নরক থেকে তাকে উদ্ধার করতে পারে এমন কেউ নেই। এ জীবন থেকে নতুন জীবনে তাকে নিয়ে যেতে পারে, পাপের অন্ধকার থেকে পুণ্যের আলোয়!

প্রেম ধ্যান, প্রেম জ্ঞান, প্রেম চিন্তা মোর।
বিশ্বজনে প্রেম দিয়ে বাঁধি রাখিডোর॥
প্রভুর অপার লীলা বোঝে কোন মতি।
প্রভু বিনা নারকীর নাহি অন্য গতি॥

আর ভয় নেই বিশালের। তার মত পাপিষ্ঠেরও উদ্ধারের পথ রয়েছে। প্রভুর পায়ে শরণ নেওয়া ছাড়া আর গতি নেই। সমস্ত পাপ সমস্ত কলঙ্ক সমর্পণ করতে হবে প্রভুর চরণে।

সোজা হ'য়ে বিশাল মেঝের ওপর শুয়ে পড়ল। প্রভু উদ্ধার কর। মুক্তি দাও প্রভু। কোপাইচণ্ডীর জঙ্গল থেকে, নরকের এই ভয়াবহতা থেকে সরিয়ে আমাকে নতুন আলো দেখাও। পাপের এ নির্মোক পিছনে ফেলে পূত আবরণ অঙ্গে জড়াবার অধিকার দাও। আমায় গ্রহণ কব, আমায় গ্রহণ কর, ঠাকুর।

সজোরে দরজায় আওয়াজ। প্রথমে হাত দিয়ে, তারপর বোধ হয় ভারি কিছু দিয়ে আঘাতের শব্দ।

সর্দার, সর্দার!

কান খাড়া করে বিশাল শুনল, তাবপর আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল।

বেলা পড়ে এসেছে। চারদিকে আবছা অন্ধকার। টলতে টলতে গিয়ে বিশাল তক্তপোশ সরিয়ে দিল।

অনেকগুলো জলন্ত মশাল। একসার কঠিন মুখের কাঠামো। অনেক জোড়া আরক্ত চোখ।

মশালের আলোয় বিশালের চেহারা দেখেই তারা পিছিয়ে গেল।

একি চেহারা হয়েছে সর্দারের! চোখ কোটরে ঢুকেছে। খোঁচা খোঁচা দাড়ি। উস্কো খুস্কো চুল। কাঁপছে দুটো ঠোঁট। দরদর করে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছে গাল বেয়ে।

তোর কি হয়েছে সর্দার? শরীর খারাপ?

বিশাল কোন কথা বলল না। পুঁথিটা বুকে জাপটে ধরে এগিয়ে গেল।

কাল সারাটা দিন তোকে খুঁজেছি সর্দার। এখানে এসে বসে আছিস, কে জানে। ভোলার যেমন কাণ্ড, যত বাজে খবর। মিছামিছি গোটা পাঁচেক লোক খতম হ'ল, অথচ এমন কিছু জিনিস পাওয়া গেল না। মজুরী পোষাল না সর্দার।

ওরা কিছু পায় নি! মজুরীও পোষায় নি ওদের! কিন্তু বিশাল পেয়েছে। যে জিনিস মানুষ সারা জন্ম ধরে খুঁজে খুঁজে পায় না, তাই পেয়েছে। এর চেয়ে দামী জিনিস বিশালের জীবনে সে আর কোনদিন পায় নি।

দুটো হাত দিয়ে পুঁথিটা বিশাল আরও নিবিড় করে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল।

তুই এ কাজ করতে গেলি কেন সর্দার? কবিয়াল সখারামকে মারতে গেলি কেন? ওটা তো গান গায় আর ছড়া লেখে। ওকে আমরা ছেড়ে দিলুম, আর তুই রামদার ঘায়ে নিকেশ করলি? মিছামিছি মেহনত। ওর ট্যাকে কানাকড়িও তো থাকে না।

সখারাম কবিয়াল! পুঁথির এমন চমৎকার ছড়া সখারাম লিখেছে। শচীমায়ের ব্যথা, বিষ্ণুপ্রিয়ার দুঃখ। নিমাইয়ের বিশ্বপ্রেমের কাহিনী।

আর পারছে না বিশাল। গোটা জন্মের কান্না যেন কুণ্ডলি

পাকিয়ে উঠছে গলার কাছে। মনে হচ্ছে বিশালের বিরাট কাঠামোটা বুঝি ভেঙে চুরমার হ'য়ে যাবে।

কবিয়াল সখারামকে সে মারে নি, কবিয়ালই চরম আঘাত হেনেছে বিশাল সর্দারকে। এত তীব্র আঘাত যে জীবনে কোনদিন বিশাল আর মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে না। শক্ত মুঠিতে কোন দিন হাতিয়ার ধরতে পারবে না।

দলের পাশ কাটিয়ে বিশাল বাইরে চলে এল। কোপাইচণ্ডীর জঙ্গল পার হ'য়ে দ্রুতপায়ে চলতে শুরু করল। বার বার কাঁটা ঝোপের আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত হ'ল তার পা, গাছের নিচু ডাল লেগে কপালের অনেকখানি কেটে গেল।

বিশাল একেবারে বাণেশ্বরী নদীর পারে এসে থামল। ঘাটে দুটো নৌকা বাঁধা ছিল। তারই একটায় বিশাল উঠে বসল।

নৌকার পাটাতনের ওপর বিশাল চুপচাপ বসে রইল। কোপাইচণ্ডীর জঙ্গল ধীরে অস্পষ্ট হয়ে আসছে পিছনে। বিশালের ফেলে আসা অন্ধকার জীবনেরই প্রতীক যেন। সূর্যের আলোর প্রবেশ অধিকার নেই। তমসাচ্ছন্ন নিবিড় বনানী।

ভৈরবগঞ্জ, বৌঠকানির হাট, পলাশপুর পেরিয়ে নৌকা চলল। স্রোতের অনুকূলে নৌকা চলেছে। ভুবন মাঝি দাঁড় ছেড়ে শুধু হাল ধরে বসে আছে। আড়চোখে বিশালের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখল। এ আবার কি বেশ! আলুথালু চুল, দুচোখে জলের ধারা, ছোট একটা বই জড়িয়ে চুপচাপ বসে রয়েছে। ভগবান জানেন, কি মতলবে কোথায় চলেছে। নানা বেশে ঘোরে বিশাল সর্দার, বার বার ভোল পাল্টায়। সিপাইদের চোখে ধুলো দিয়ে কাজ হাসিল করে। কিন্তু নামবে কোথায় সর্দার? অন্ধকার হয়ে আসছে। সন্ধ্যার অন্ধকার। দুপারে আলোর জোনাকি। গাঁয়ের নিশানা।

বিশাল সর্দারকে তার গন্তব্যস্থল জিজ্ঞাসা করবে এমন বুকের পাটা ভুবন মাঝির নেই। তার বাপ ফটিক মাঝি বেঁচে থাকলে তারও সাহস হ'ত না। দয়া মায়া নেই লোকটার। মেজাজের ঠিক নেই। কোমর থেকে ছোরা বের করে একেবারে গলার নলি ফুটো করে দেবে। তারপর লাশটা পায়ে ক'রে বাণেশ্বরীর জলে ফেলে দেওয়া তো দু মিনিটের মামলা।

ভাগ্য ভুবন মাঝির। হঠাৎ বিশাল ভুবনের দিকে ফিরল।

আমরা কোথা দিয়ে চলেছি মাঝি?

আজ্ঞে ওপারে মতিপুকুব, এ পাশে বসিরগঞ্জ।

ওপারে নৌকা ভেড়াও।

ভুবন মাঝির যেন ঘাম দিয়ে জ্বব ছাড়ল। সর্দাবের খেয়ালের কথা কিছু বলা যায় না। সাবাবাতই হয়তো নৌকা বাইতে হ'ত তাকে।

নৌকা ঘাটে লাগতেই বিশাল উঠে দাঁড়াল। নামতে গিয়েও কি ভেবে নামল না। ভুবন মাঝির দিকে চেয়ে বলল, আমাব সঙ্গে কিছু নেই মাঝি। তুমি কোপাইচণ্ডীর জঙ্গলে গিয়ে দলেব কাছ থেকে আমার নাম কবে কিছু নিয়ে নিও। আমার কথা জিজ্ঞাসা করলে ব'ল আমি আব ফিবব না। আমার খোঁজ যেন কেউ না করে।

ভুবন মাঝি হাতযোড় কবেই ছিল, বিশাল নামতেই নৌকাব মুখ ঘুরিযে দ্রুত দাঁড় বাইতে লাগল।

কাদা ভেঙে বিশাল রাস্তার ওপর এসে দাঁড়াল। ঘন অন্ধকার। দূরে দূরে কয়েকটা আলোর আভাস। খুব ক্লান্ত লাগছে শরীর। আস্তে আস্তে পথ ধরে চলতে শুরু করল।

একটু এগিয়েই কিন্তু আর চলতে পারল না। রণ-পায়ে চড়ে দশ পনেরো মাইল বিশাল অবলীলাক্রমে পার হয়েছে, বিশ মাইল

দূরের গাঁ থেকে ডাকাতি করে রাতারাতি বাড়ী চলে এসেছে, কিন্তু আজকের মতন এমন পরিশ্রান্ত হয় নি।

সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত, সামর্থ্যের শেষ কণাও সখারাম কবিয়াল হরণ করে নিয়ে গেছে।

পথের ধারে বিরাট বটগাছ। ঝুরি নেমেছে মাটিতে। তলায় শুকনো পাতার রাশ। বিশাল সেখানেই শুয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙল মানুষের কথার আওয়াজে। চোখ মেলে চেয়ে অনেকক্ষণ এদিক ওদিক দেখল। কোপাইচণ্ডীর জঙ্গল নয়, নিজের আস্তানাও নয়, এ তবে কোথায় বিশাল রাত কাটাল!

একটু একটু করে সব মনে পড়ল। তারপরই চোখ ফিরিয়ে দেখল তুজন মেয়েছেলে দাঁড়িয়ে। একজন প্রৌঢ়া, কদমছাঁট চুল, হাতে কমণ্ডলু, আর একজন যুবতী।

বিশাল চোখ মেলতেই তুজনে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল।

প্রৌঢ়া বলল, বাবা দয়া কর। মুখ তুলে চাও।

বিশাল অবাক। বিস্ময় জড়ানো গলায় বলল, কি চাই মা?

তুমি অন্তর্যামী, সবই জান বাবা। এই অভাগীকে দয়া কর।

কথার সঙ্গে সঙ্গে প্রৌঢ়া কাছে দাঁড়ান অবগুণ্ঠনবতী যুবতীকে দেখিয়ে দিল।

চাপ চাপ দাড়ি বিশালের। হাতে, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। পরনের পোশাক ছিন্ন ভিন্ন। তাকে দেখে সাধু সন্ন্যাসী মনে হওয়া অবশ্য বিচিত্র নয়।

বিশাল হাতযোড় করল, আপনারা যা ভাবছেন, আমি তা নই, আমি নিজে পাপী, তাপী। আমার পাপের সীমা-পরিসীমা নেই। মুক্তির আশায় আমি পাগলের মতন ছুটে বেড়াচ্ছি।

প্রৌঢ়া আরো বিগলিত হ'ল। এই হ'চ্ছে আসল সাধুপুরুষের লক্ষণ। এমন বিনয় গুণীদেরই যোগ্য!

প্রৌঢ়া এগিয়ে একেবারে বিশালের দুটো পা জড়িয়ে ধরল।

এমন পা জড়িয়ে ধরা অবশ্য নতুন নয়। কোপাইচণ্ডীর জঙ্গলে অনেকবার এমন হয়েছে। স্বামীকে বাঁচাবার আশায়, নিজের সম্পদ রক্ষার জন্য এভাবেই দুটো পা জড়িয়ে ধরেছে। বিশাল কখনও ক্ষমা করেছে, কখনও করে নি। অবশ্য অলঙ্কারের শেষ টুকরোটুকু নিয়ে তবে মানুষের প্রাণভিক্ষা দিয়েছে।

কিন্তু আজ পা ছুঁতেই বিশাল শিউরে উঠল।

কি করছেন মা, বিশ্বাস করুন আমার কোন শক্তি নেই। প্রভুকে ডাকুন, তিনিই ত্রাণকর্তা, তিনিই নেবার আর দেবার মালিক।

প্রৌঢ়া কি বুঝল কে জানে। যুবতীর দিকে ফিরে বলল, বাবাকে প্রণাম কর। প্রভুর নাম জপ করতে বলছেন, তাই কর, আবার স্বামী মুখ তুলে চাইবে। ডাইনির কাছ থেকে তোর কাছে ফিরে আসবে।

যুবতীও প্রণাম করল তারপর দুজনে নদীর দিকে চলে গেল।

বিশাল চুপচাপ বসে রইল। এও প্রভুর অপার রহস্য। এক মুহূর্তে নরপিশাচকে সিদ্ধপুরুষে রূপান্তরিত করলেন।

একটু একটু করে লোকচলাচল শুরু হ'ল। বেশীর ভাগই স্নানার্থীর দল। দু একজন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিশালকে নিরীক্ষণ করল। কেউ কেউ প্রণামও করল। আবার অনেকে এদিক ওদিক না চেয়ে সোজা নিজেদের কাজে চলে গেল।

রোদ চড়া হ'তেই বিশাল উঠে পড়ল। একটু জল পেলে হ'ত, গলা শুকিয়ে কাঠ। রাত্রে মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে গেছে। তন্দ্রার ঘোরে বিভীষিকার সার। কবন্ধের দল। চোখের সামনে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে পিছনের রক্তাক্ত জীবন।

এধারে ওধারে ছোট ছোট কুঁড়ে। ইঁট বোঝাই গরুর গাড়ির সার চলেছে। বিশাল এগিয়ে চলল।

পাশেই বিরাট এক বাড়ী। চকমিলান। দেউড়িতে দারোয়ান। বাগানের মধ্যে এক পাতকুয়ো।

বিশাল দারোয়ানের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বলল, একটু জল।

দারোয়ান দরজার ফাঁক দিয়ে চেঁচাল, বনমালী, সাধুবাবাকে একটু জল দে।

বাগান থেকে এক মালী এসে দাঁড়াল দরজার ওপাশে। বোধ হয় কাজ করছিল।

দু হাতে কাদার ছোপ। দরজা ফাঁক করে বিশালকে নিয়ে গেল।

পাতকুয়োর পাশে বিশাল অঞ্জলি পেতে দাঁড়াল। বনমালী জল ঢেলে দিল হাতে।

সাধুবাবা বুঝি বীরপুরের আশ্রমে যাবেন?

বিশাল মুখ তুলে সোজা হয়ে দাঁড়াল। বলল, বীরপুরের আশ্রম? কি আছে সেখানে?

বছরের এই সময়ে খুব ধুমধাম হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মদিন। নানা জায়গা থেকে সাধু সন্ন্যাসী আসেন।

দু এক মিনিট বিশাল ভাবল, তারপর বলল, বীরপুর এখান থেকে আর কতদূর?

মাইল দুয়েক, আর কত। আপনি যদি চাঁদমারীর মাঠ ভেঙে যান তো আরো কম।

যাবার ইচ্ছা তো আছে, এখন মহাপ্রভুর কৃপা।

চলতে চলতে বিশাল জিজ্ঞাসা করল, এ কার কুঠি?

হরদয়াল মান্নার। বাবু কলকাতায় ব্যবসা করেন। মাসে দুবার বাড়ীতে আসেন। বাবুর ছোট ছেলে এখানে থাকেন, দয়া করে পায়ের ধুলো দেবেন একবার?

সময় নেই। বিশাল দ্রুতপায়ে দেউড়ী পার হয়ে পথে এসে দাঁড়াল।

একবার হাত দিয়ে বুকের কাছটা অনুভব করল। সখারাম কবিয়ালের পুঁথিটা ঠিক আছে।

সোজা চলতে শুরু করল। চাঁদমারীর মাঠ ভেঙে বীরপুরের আশ্রম।

কিছুটা এগিয়েই বিশাল দাঁড়িয়ে পড়ল। বীবপুবের আশ্রমে নানাদিক থেকে সাধু সন্ন্যাসী জড় হবে। দিগ্‌গজ সব পণ্ডিতের দল। কিন্তু সেখানে বিশাল কি নিয়ে দাঁড়াবে। কতটুকু তার সম্বল! ববং সে পবিত্র আবহাওয়া তার উপস্থিতিতে আবিল হ'য়ে উঠবে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিশাল ভাবতে লাগল। হঠাৎ পিছনে সমবেত কণ্ঠে কীর্তনের সুর। পিছন ফিবে বিশাল দেখল, একদল বৈষ্ণব চলেছে খোল করতাল বাজিয়ে। বিশালকে দেখে একজন বলল, একি দাঁড়িয়ে কেন? আসুন।

একটু ইতস্তত করল বিশাল। সামান্য দ্বিধা, তাবপব সব জড়তা কাটিয়ে দলেব মধ্যে ঢুকে গেল। এমনও হতে পাবে পুণ্যাত্মাদেব স্পর্শে তাব পাপ কেটে যাবে। তার চেয়ে কত বেশী পাপী তাপীকেও ক্ষমা কবেছেন মহাপ্রভু।

বীরপুব পৌছাল ঘণ্টা চাবেকেব মধ্যে।

বিরাট ব্যাপাব। মাঠে মাঠে তাঁবু পড়েছে। দলে দলে সন্ন্যাসীবা ঘুরছেন।

তাঁবুতেই আলাপ হ'ল। এক সাধু এসেছেন শান্তিপুব থেকে। তিনিই বিশালকে জিজ্ঞাসা কবলেন, মহাশয়ের নিবাস কোথায়?

হঠাৎ বিশালের মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, পোড়াগাঁ।

সাধু চমকে উঠলেন, পোড়াগাঁ? মানে শিবানীপুরের পাশে?

হ্যাঁ।

কোপাইচণ্ডীর জঙ্গলের কাছাকাছি না জায়গাটা?

বিশাল ঘাড় নাড়ল।

বড় ভয়ঙ্কর জায়গা। বিশাল ডাকাতের আস্তানা। তার অত্যাচারে যাত্রীরা অতিষ্ঠ। কতলোক যে এই নরখাদকের হাতে প্রাণ দিয়েছে তার ঠিক নেই। শুনছি নাকি ইংরেজ সরকার এবার ব্যবস্থা করছেন। জরীপের লোক ওই এলাকায় কাজ আরম্ভ করবে, সরকার তাদের সঙ্গে জনপঞ্চাশ সিপাই পাঠাচ্ছেন গোলাবারুদ নিয়ে, বিশে ডাকাত এবার খতম!

বিশাল হাসল, বলল, তার আর দরকার হবে না। বিশাল মারা গিয়েছে।

মারা গিয়েছে? কবে?

দিন দুই তিন হ'ল।

আপনি জানলেন কি করে?

পথে আসতে আসতে খবর পেলাম।

বড় সুসংবাদ দিলেন মশাই। ওব অত্যাচারে সাধু সন্ন্যাসীদের পর্যন্ত চলাফেরা করার উপায় ছিল না। দয়া নেই, মায়া নেই, দুরাত্মা রাক্ষসেরও অধম। গত বছর এই উৎসবে ও-অঞ্চল থেকে জন পাঁচেক সন্ন্যাসী রওনা হয়েছিলেন, এসে পৌঁছলেন মাত্র তিনজন। দুজন বিশালেব হাতে শেষ।

বিশাল কোন উত্তর দিল না। ব্যাপারটা তারও মনে পড়েছে। অনন্তপুরের চটিতে বিশাল নিজে গিয়েছিল শিকারের খোঁজে। পুবোহিতের ছদ্মবেশে গিয়ে দেখেছিল অনন্তপুরের চটি খালি। লোকের চিহ্নমাত্রও নেই। আশপাশের লোকের কাছে শুনল, চটিতে মড়ক লেগেছে। দুজন সন্ন্যাসীর ওলাউঠা শুরু হতেই চটির অন্য সব লোক পালিয়েছে। এমন কি সেই দুই সন্ন্যাসীর সঙ্গে আর যে তিনজন ছিল, তারাও। খুব সম্ভব বীরপুরে এসে তারাই রটিয়েছে যে দলের দুজন কোপাইচণ্ডীর জঙ্গলে খতম। সঙ্গীদের ফেলে পালিয়ে এসেছে এমন একটা খবর পরিবেশনযোগ্য নয়, সেটুকু খেয়াল তাদের ছিল।

ঘণ্টার শব্দ হ'তেই তাঁবুর সকলে উঠে দাঁড়াল। উৎসব শুরু হবে তারই সঙ্কেত।

প্রথমদিন নামগান। বিশাল পিছনের দিকে বসে কীর্তনের সুরে সুর মেলাল। বার বার দুচোখ জলে ঝাপসা হয়ে এল। অনেকদিন আগে ফেলে আসা জীবনের টুকরো চোখের সামনে ভেসে উঠল। রাধাগোবিন্দজীব মন্দির। কুমুর বাবা, কুমু আর বিশু নামগান করে চলেছে। সেদিন বিশুর জীবনে নাম কীর্তনের হয়তো ততটা প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু আজ প্রয়োজন অনেক বেশী। চিত্তশুদ্ধির দরকার, পবকালের জন্য প্রায়শ্চিত্ত।

গণ্ডগোল শুরু হ'ল পবের দিন। আলোচনা সভা। নানা দেশ বিদেশ থেকে পণ্ডিতেরা এসেছেন চৈতন্য মহাপ্রভুর ধর্ম নিয়ে আলোচনা কবতে। সেদিনও বিশাল একটা কোণে গিয়ে বসল।

দু একজন সংস্কৃত ভাষায় বললেন, বিশু একবর্ণও বুঝল না। অনেকেই বাংলায় আলোচনা করলেন। চৈতন্যের ধর্মকে নিজের সুবিধামত ব্যাখ্যা। আরও আশ্চর্যের কথা, নিজেরা যা বুঝেছেন সেটাই যে যথার্থ তাই নিয়ে তুমুল তর্ক আরম্ভ হ'ল। বক্তৃতার বিষয়বস্তু বিশাল খুব বুঝতে পারল না বটে, কিন্তু তর্কের ব্যাপারটা বেশ বুঝতে পারল। শেষকালে পণ্ডিতদেব মধ্যে প্রায় হাতাহাতি হবার উপক্রম।

বিশালের আশ্চর্য লাগল। কোপাইচণ্ডীর জঙ্গল বুঝি সে এখনও পার হতে পারেনি? লুটের মাল নিয়ে যেমন চেঁচামেচি হ'ত দলের মধ্যে, বখরা নিয়ে মন কষাকষি, এরা ধর্ম নিয়েও ঠিক তাই করছে।

সকলের অগোচরে বিশাল উঠে পড়ল। আস্তে আস্তে আশ্রমের বাগান পার হয়ে পথের ওপর এসে দাঁড়াল।

এ আশ্রমে মন টিকবে না। শান্তি পাবে না। অন্য কোথাও যেতে হবে। আরো দূরে কোথাও। কিন্তু যাবেই বা কোথায়! চোখ

বন্ধ করলেই সখারাম কবিয়ালের নিস্পন্দ মূর্তিটা ভেসে ওঠে। জামার ভিতর থেকে সখারামের পুঁথিটা বের করে বিশাল বিড় বিড় করে পড়ল। কি চমৎকার লেখা। মুহূর্তে মনকে কোথায় নিয়ে যায়। দুঃখ কষ্ট, শোক তাপ সব নিমেষে ভুলিয়ে দেয়।

খাবার চিন্তা নেই বিশালের। আশ্রমের লোকেদের কাছে মাধুকরী করতে শিখেছে। কারুর দরজায় গিয়ে দাঁড়ালেই হ'ল। এক বাড়ীতে না জোটে, অন্য বাড়ীর সামনে গিয়ে দাঁড়াবে। এক গাঁয়ে না জোটে, অন্য গাঁয়ে।

দিন পাঁচ ছয় এই ভাবে কাটল। কোথাও গৃহস্থরা সমাদর করে বসাল, আবার কোথাও মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিল। ভ্রূক্ষেপ নেই বিশালের। অনেক পাপ করেছে জীবনে, বহু লোকের সর্বনাশ করেছে, অনাদর নিপীড়ন, নির্যাতন যত হয় ততই ভাল। এতেই দোষ কেটে যাবে, পাপ-ক্ষয় হবে।

গাঁয়েব নাম দেবীপুর।

কবে বুঝি এ গাঁয়ের কোন মেয়েব ওপর দেবীর ভর হয়েছিল। লোককে যা বলত, তাই ফলত। মড়ক, অনাবৃষ্টি, রোগ সব রোধ করার ক্ষমতা ছিল। সেই থেকেই গাঁয়ের নাম দেবীপুর।

খালের পাশে ছোট ছোট কুঁড়ে। বিশাল এগিয়ে চলল। মুণ্ডিত মস্তক, আশ্রমে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই মস্তক মুণ্ডন করতে হয়েছিল। গলায়, হাতে রুদ্রাক্ষের মালা। পরনে গৈরিক।

জয় রাধে কৃষ্ণ, বলে একটা বাড়ীর উঠানে গিয়ে বিশাল দাঁড়াল।

ভিতর থেকে খনখনে গলায় উত্তর এল, কে রে সাত সকালে জ্বালাতে এল ?

বিশালের মনে পড়ে গেল খুড়িদের কথা। ঠিক এমনি কণ্ঠস্বর, এমনি সম্বোধনের ধারা।

দুটি ভিক্ষা পাই মা।

বিশাল আরো করুণ করল গলার আওয়াজ।

একটি স্ত্রীলোক বেরিয়ে এল। মাথার চুল চুড়োর আকারে বাঁধা। পরনে খাটো শাড়ি। দু চোখে রাত্রি জাগরণের কালিমা। মুখ চোখের ভঙ্গিতে পেশার ইতিহাস লেখা।

বাবা, এযে একেবারে চিতাবাঘ ? কোন জঙ্গল থেকে বেরোলে বাপু ?

চিতাবাঘ ! পরক্ষণেই বিশালের মনে পড়ে গেল। সকাল বেলা কপালে, নাকে, বুকে ছাপ দিয়েছিল। ঘামে কিছু মুছে গেছে, কিন্তু অনেকটা রয়েছে।

দুটি ভিক্ষা পাই। বিশাল আবার বলল।

স্ত্রীলোকটি খুঁটি ধরে দাওয়ার ওপর বসল। মুচকি হেসে বলল, এখানে সুবিধা হবে না বাবাজী। বাড়ীতে চাল বাড়ন্ত। তুমি বরং ওই ঘরে যাও। ভিক্ষেও মিলবে, চাই কি বরাতে থাকলে বোষ্টুমীও মিলে যেতে পারে। অবশ্য বোষ্টুমী যদি ইতিমধ্যে দেহরক্ষা না করে থাকে।

কথাগুলো বিশাল ভাল বুঝতে পারল না, তবে এটুকু বুঝল এখানে ভিক্ষা পাবার আশা নেই।

আস্তে আস্তে সরে গেল উঠান থেকে।

গ্রামের বাইরে কয়েকটা কুঁড়ে ঘর। বোধ হয় পতিতাদের আস্তানা। কিন্তু বৈষ্ণবের তাতে কোন অসুবিধা নেই। সবাই কৃষ্ণের জীব। ভিক্ষা সকলের হাত থেকেই নেওয়া যেতে পারে।

কয়েকটা কুঁড়ে বাদ দিয়ে বিশাল একেবারে কোণে এসে দাঁড়াল। জরাজীর্ণ অবস্থা। ঘরের চাল সামনে ঝুঁকে পড়েছে। আগামী বর্ষায় বোধ হয় দেহ রাখবে। উঠানে আগাছার জঙ্গল।

দুটি ভিক্ষে দেবেন। বিশাল একটু গলা চড়াল।

কে ? ভিতর থেকে খুব ক্ষীণ গলার স্বর ভেসে এল।

আমি বৈষ্ণব। এক মুঠো চাল দেবেন দয়া করে।

ভিতরে আসুন, দাওয়ার কাছে।

বিশাল উঠান পার হ'য়ে দাওয়ার ওপর গিয়ে দাঁড়াল।

ময়লা বিছানা। দেওয়ালে হেলান দিয়ে একটি অস্থিসার স্ত্রীলোক। সামান্য কটা কথা বলেই হাঁপাতে শুরু করেছে।

বিশাল উঠতেই স্ত্রীলোকটি চোখ ফেরাল। বিশালকে অনেকক্ষণ ধরে দেখল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। বোধ হয় চিনতে পারল না, কিন্তু বিশাল এক নজরেই চিনেছে। পুরানো দিনের কাঠামো, ভগ্নাবশেষ, কিন্তু চোখ, মুখ, কথা বলার ভঙ্গী এগুলো তো বদলায় নি।

কুমু! বিশালের গলা আবেগ-চঞ্চল।

স্ত্রীলোকটি চমকে উঠল। নিষ্প্রভ দুটি চোখে ক্ষণেকের জন্য দীপ্তির ঝিলিক। দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে পাঁজরগুলো প্রকট হ'য়ে উঠল।

আমি বিশু।

বিশু! শূন্য দৃষ্টি মেলে কুমু যেন পুরানো অতীতকে খোঁজার চেষ্টা করল, তুমি বিশু, গোবিন্দপুরের ?

হ্যা, হ্যা, বিশাল ছুটে গিয়ে চৌকাঠের ওপর বসল, আমি সেই বিশু। সোনাচাঁপা গাছ থেকে ফুল পেড়ে দিয়েছিলাম তোমাকে ? রাধাগোবিন্দজীর মন্দিরে যেতাম ? মনে পড়ছে না ?

কুমু ঘাড় নাড়ল, হ্যা, মনে পড়ছে, খুব পড়ছে। সেগুলোই যদি ভুলে যাব তো আর জীবনে কি রইল। কিসের দিকে চেয়ে তাপদগ্ধ জীবন কাটাব।

কিন্তু তোমার এ কি চেহারা হ'য়েছে কুমু ?

বিশাল চৌকাঠ পার হ'য়ে আর একটু এগোবার চেষ্টা করতেই কুমু হাত নেড়ে বারণ করল, না, না, কাছে এস না। আমার খুব খারাপ রোগ। এ রোগের নিশ্বাসও খারাপ। তাছাড়া, আমি নষ্ট হয়ে গেছি।

দু হাতে মুখ ঢেকে কুমু হাঁউ মাউ করে কেঁদে উঠল।

বিশাল বারণ শুনল না। এগিয়ে কুমুর পাশে বসল।

সেদিনের মগডালের সোনাচাঁপা পথের ধুলোয় পড়ে গেছে? এ ফুল আর দেবতাকে নিবেদন করা যাবে না?

কিন্তু কুমু আর কতটুকু নষ্ট হয়েছে! সেদিনের বিশু আজ কোপাইচণ্ডীর জঙ্গল পার হয়ে এসেছে। পাপের পঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করেছে নিজেকে।

বিশাল বলল, তুমি আর কতটুকু নষ্ট হয়েছ? আমি কোথায় নেমেছি জান?

শীর্ণ মুখ তুলে কুমু চেয়ে রইল।

কোপাইচণ্ডীর বিশাল সর্দারের নাম শুনেছ? কত যে খুন খারাপী করেছে যার লেখাজোখা নেই। দয়া নেই, মায়া নেই, পরিপূর্ণ একটা নবদানব।

কুমু ঘাড় নাড়ল।

না, নাম শোনে নি। তবে এটুকু শুনেছে কোপাইচণ্ডীর জঙ্গলে দুর্ধর্ষ ডাকাতের দল আছে। ভয়ে লোকে যাতায়াত করে না সেখান দিয়ে। যারা যায়, তারা অনেকেই আর ফেরে না।

সেই বিশাল সর্দার আমি। মানুষের রক্তে আমার দুটো হাত লাল হ'য়ে উঠেছে। সারাজীবন ধরে ধুলেও এ রঙের ছোপ যাবে না।

তুমি? কুমুব দু চোখে বিস্ময়ের ছিটে।

হ্যা।

কিন্তু তুমি যেন বলেছিলে শহরে যাচ্ছ?

তাই যাব ভেবেছিলাম, কিন্তু তুমি আমায় ভুল বুঝলে কুমু। শহরে যাবার পথরোধ করে দিলে। কোপাইচণ্ডীর জঙ্গল কেড়ে নিল আমাকে।

ভুল বুঝলাম তোমাকে? কুমু সোজা হ'য়ে উঠে বসার চেষ্টা

করল। উত্তেজনায় আরক্তিম হ'ল মুখ। দু হাতে বুক চেপে দম নিল।

বুঝলে বৈ কি। বিশাল মাথা নিচু করল। একটা হাত দিয়ে কুমুর বিছানায় আঁচড় কাটতে কাটতে বলল, তোমাকে নিয়ে আমি বিদ্যাসাগরের কাছে যেতে চেয়েছিলাম। যাতে তিনি দয়া করেন তোমাকে। তোমার জীবনকে নতুন রূপে উজ্জ্বল করে দিতে পারেন। বিধবা বিবাহ চল করেছিলেন তিনি, অল্পবয়সী বিধবাদের দুঃখ মোচন করার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। আমার জন্য তোমায় চাই নি কুমু। এত নিচে তুমি আমাকে কেন নামিয়ে দিলে ?

বিশালের গলায় অভিমানের সুর। অনেকগুলো বছর পার হ'য়ে যেন সে আগের মতন চাঁপাগাছতলায় দাঁড়িয়েছে কুমুর মুখো-মুখি। আগের বয়স আর আগের মন নিয়ে।

কথা বলতে গিয়েই কুমু কাশতে সুরু করল। প্রাণান্তকর কাশি। পাঁজরে পাঁজরে কামারের হাপরের টান। মনে হ'ল গলার শিরা বুঝি ছিঁড়ে যাবে কাশির দমকে।

বুঝি তাই হ'ল। কুমু উপুড় হ'য়ে পড়তেই ঠোঁটের দু পাশ দিয়ে রক্তের স্রোত গড়িয়ে পড়ল। হাত বাড়িয়ে কুমু মাটির একটা পাত্র টেনে নিল, কিন্তু তবুও বিছানার পাশ লাল হ'য়ে উঠল রক্তের ছিটে লেগে।

রক্ত বিশাল অনেক দেখেছে। শড়কীর ফলা লেগে ছিটকে পড়েছে গরম রক্ত। ফিনকি দিয়ে উঠেছে। লাল হ'য়ে গেছে কোপাইচণ্ডীর গোলপাতার ঝোপ। তবু এ রক্ত দেখে বিশালের মাথাটা ঘুরে উঠল।

বালিশের ওপর মাথা দিয়ে কুমু নিস্তেজ হ'য়ে পড়ে আছে। শ্বাস নেবার কষ্ট। সমস্ত শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে।

বিশাল আরো এগিয়ে গেল। কুমুর খুব কাছাকাছি। একটা হাত রাখল তার কপালের ওপর। গা একটু গরম।

একটু সামলে নিয়ে কুমু বিশালের দিকে ফিরল। দম নিয়ে বলল, তুমি যাঁর নাম করলে তাঁব দয়া আমি পেয়েছি। আমি তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারি নি, কিন্তু তিনি নেমে এসে দাঁড়িয়েছিলেন আমার সামনে।

কে দাঁড়িয়েছিলেন তোমার সামনে?

মুহূর্তে কুমুর মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। দু চোখে বিদ্যুতের ঝিলিক। আস্তে আস্তে থেমে থেমে বলল, বিদ্যাসাগর।

কথাটা বলেই শীর্ণ দুটি হাত তুলে নমস্কাব কবল মহাপুরুষেব উদ্দেশে।

শুনবে আমাব কথা?

কুমু বালিশে ভব দিয়ে সোজা হয়ে বসবাব চেষ্টা কবতেই বিশাল বাধা দিল, এখন থাক। তোমাব শবীরের এ অবস্থায় কথা বলে দবকার নেই। তুমি সেবে উঠলে ববং শুনব।

কুমু ম্লান হাসল, সেবে উঠলে শুনবে? তা হ'লে এ জন্মে আব তোমার শোনা হবে না। বোগটা যে কি তা বোধ হয় টেব পেয়েছ?

বিশাল উত্তর দিল না। মাথা নিচু করে রইল।

কাশবোগ। হয়েছে অনেকদিন। টেব পাবাব পবেই শহব থেকে আমায় এখানে রেখে দিয়ে গেছে।

কিন্তু চিকিৎসার কি হচ্ছে?

এ রোগেব চিকিৎসা নেই। তাছাড়া কোন বৈদ্য এ অঞ্চলে আসবে আমাদের সেবা করতে? পতিতাদেব চিকিৎসা কবতে এসে নিজেরা পতিত হবে?

এবারও বিশাল কোন কথা বলল না। মনে পড়ল নীলকর সায়েবের কথা। বন্দুক উচিয়ে যে অনঙ্গ কবিরাজকে ধবে নিয়ে এসেছিল, কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারে নি।

তার চেয়ে বসে বসে আমার কথা শোন। আমি বুঝতে পেরেছি

আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে। সে জন্য আক্ষেপ নেই। তাঁর স্পর্শ পেয়েছি। মরতে আর আমার ভয় নেই।

দু'জনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ।

বাইরের জানলা দিয়ে আকাশের কিছুটা দেখা যাচ্ছে। অনেক-গুলো তালগাছ আর উড়ন্ত একগাদা চিল। অনেক দূরে কোথাও মিহি সুরে বাছুর ডাকছে। মাকেই খুঁজছে বোধ হয়।

বাবা হঠাৎ মারা গেলেন। অত্যাচার তার আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। মন্দিরের চাতালে লোক অপেক্ষা করত। একলা পেলেই নানারকম প্রলোভনের কথা। কখনো কখনো ভয় দেখানো। মাঝে মাঝে চিঠির টুকরোও গায়ে এসে পড়তে লাগল। শহরে নিয়ে গিয়ে আমাকে অনেক সুখে রাখবে। সারাজীবন কোন কষ্ট পেতে হবে না।

বাবার পায়ে বেলগাছের কাঁটা ফুটল। পা ফুলে পেকে উঠল। বদ্যি কবিরাজ কেউ এল না। অনঙ্গ কবিরাজের .পায়ে পর্যন্ত পড়েছি, কিন্তু তিনি আসতে রাজী হন নি। বলেছেন, আমার বাবাকে চিকিৎসা করলে প্রতাপ নন্দী তাঁকে একঘরে করবে। ঘরের চালা কেটে বাস উঠিয়ে দেবে।

বাবা মারা যাবার পর এতদিন যে লোকটা নেপথ্যে ছিল, লোকদের মারফত প্রস্তাব পাঠাচ্ছিল, সে সামনে এসে দাঁড়াল। তাকে তুমি চেন, খুব ভাল করেই চেন। গাঁয়ের মাথা পঞ্চানন চক্রবর্তী।

পঞ্চানন চক্রবর্তী ? বিশাল স্থান কাল ভুলে চেঁচিয়ে উঠল।

হ্যাঁ। ·তিনিই আড়াল থেকে আমায় কাছে ডাকছিলেন, এবার একেবারে মুখোমুখি দাঁড়ালেন। সন্ধ্যার ঝোঁকে দাওয়ায় বসে বসে নিজের ভাগ্যের কথা ভাবছিলাম। নতুন সেবায়েত আসবে ভিন গাঁ থেকে। আমাকে চলে যেতে হবে এখান থেকে। কিন্তু যাব কোথায়! যেখানেই যাব আমার বয়স আমায় বাধা দেবে। বয়স আর পোড়া রূপ।

হঠাৎ কাশিব শব্দে চমকে উঠলাম। ফিবে দেখি দাওয়ার ওপাশে পঞ্চানন চক্রবর্তী। একেবাবে নবযুবকের বেশ।

সেই এক কথা। মাথাব মণি করে রাখবে। পায়ে কাঁটাটি ফুটতে দেবে না। সারাজীবন শাড়ি গহনায় মুড়ে বাখবে। মাথার মধ্যে যেন আগুন জ্বলে উঠল। হাতেব কাছে উঠান ঝাঁট দেবাব ঝাঁটাটা ছিল। কিছু না ভেবেই সেটা তুলে নিয়ে সপাং কবে শয়তানেব মুখের ওপব এক ঘা বসিয়ে দিলাম।

দবজায় ঠুক ঠুক শব্দ। বিশাল ফিবে বসল।

বাইবে থেকে নাবী কণ্ঠেব আওয়াজ, মা।

কুমু আস্তে বলল, কে মানী, আয় ভেতবে আয়।

আধবয়সী একটি মেয়েছেলে ঘবে ঢুকে পুরুষমানুষ দেখেই তাডা-তাডি মাথায় ঘোমটা দিয়ে বাইবে গিয়ে দাঁডাল।

কুমু আবাব ডাকল, আয মানী ভেতবে আয। এ আমাব গাঁযেব লোক, এব কাছে লজ্জা কবাব দবকাব নেই।

মানী ঘবেব মধ্যে এসে দাঁড়াতেই কুমু বিশালেব দিকে ফিবে বলল, এই হচ্ছে মানদা। কৈবর্তদেব মেয়ে। এই আমাব দেখাশোনা তদ্বিব তদাবক সব কবে। এব হাতে খেতে তোমাব আপত্তি নেই তো?

বিশাল হাসল। কোন উত্তব দিল না।

বান্নাব নির্দেশ নিয়ে মানদা চলে গেল। বিশাল জিজ্ঞাসা কবল, তোমাব চলে কি ক'বে?

পুবানো পুঁজি ভেঙে ভেঙে, আব কি ক'বে। পুঁজি অবশ্য শেষ হ'য়ে এসেছে, তবে আশাব কথা জীবনেব আব দিনও বেশী বাকি নেই।

অলসদৃষ্টি দিয়ে কুমু কিছুক্ষণ বাইবের দিকে চেয়ে বইল তাবপব মুখ ফিবিয়ে বলল, শোন যা বলছিলাম।

তোমার বলতে কষ্ট হচ্ছে কুমু, আজ বরং থাক।

কষ্ট? কুমু ম্লান হাসল, বলল, বলতে না পারলে কষ্ট আরো বেশী হবে। পরলোকে গিয়েও শান্তি পাব না।

বিশাল আর আপত্তি করল না। চুপ করে পা মুড়ে বসল।

সেই রাত্রেই বাড়ীতে আগুন লাগল। ঘুম আসছে না, বিছানায় শুয়ে ছটফট করছি, হঠাৎ গরম হাওয়া জানলার ফাঁক দিয়ে। উঠেই দেখলাম ও-পাশের ঘরটা জ্বলছে। অনেকখানি উঁচুতে উঠেছে আগুনের শিখা। তাড়াতাড়ি উঠানে এসে দাঁড়ালাম। আগুনের আভায় সব স্পষ্ট, এমন কি আমার নিজের ভবিষ্যতটুকুও।

বালতীর খোঁজে এদিক ওদিক করতে যাবার মুখেই বাধা পেলাম। কে আমায় পিছন থেকে জাপটে ধরল। পঞ্চানন চক্রবর্তী নয়, আরো বলিষ্ঠ হাত। চেঁচাবার আগেই গামছা দিয়ে মুখ বেঁধে দিল, তারপর কাঁধে করে নিয়ে চলল মাঠের ওপর দিয়ে।

এই পর্যন্ত ব'লেই কুমু আবার থেমে গেল। শ্বাসের কষ্ট হচ্ছে। ছু হাতে বুকটা চেপে ধরে একটু বাতাসেব আশায় টেনে টেনে নিশ্বাস নিতে শুরু করল।

থাক এখন আর আমি কিছু শুনব না। বিশাল উঠে দাঁড়াল।

কাশতে কাশতেই কুমু হাত নেড়ে বিশালকে উঠতে বারণ করল। কাশির বেগ একটু সামলে নিয়ে বলল, বেশ, এখন থাক। তুমি খাওয়া দাওয়া সেরে বিশ্রাম করে নাও, তারপর বলব। তুমি বুঝতে পারছ না, দেরী করলে যে এসব কথা আমার বলাই হবে না।

বেলা পড়তে বিশাল আবাব দবজার কাছে উঁকি দিল। খাওয়া দাওয়া সেরে দাওয়ার ওপর বিশাল একটু গড়িয়ে নিয়েছে। ঘুমাতে পারে নি। পুরানো সব কথা, আর পুরানো জীবন সার দিয়ে দাঁড়িয়েছে চোখের সামনে। কয়েক বছরের অন্ধকার জীবন নিঃশেষে মুছে গেছে। গোবিন্দপুর ফিরে এসেছে তার সোনাচাঁপা গাছ আর চাঁপারঙা মেয়েকে নিয়ে।

এস। কুমু দরজার দিকেই আকুল দৃষ্টি মেলে চেয়েছিল। বোধ হয় বিশালেরই আশায়।

বিশাল কুমুর পাশে গিয়ে বসল। মৃদু গলায় জিজ্ঞাসা করল, এখন কেমন আছ ?

ভাল, খুব ভাল। কুমু হাসল।

বিশালেব দিকে ফিরে বলল, একটা কাজ করতে পাব ?

কি ?

আমাকে পিঠে একটা বালিশ দিয়ে একটু বসিয়ে দেবে। শুয়ে শুয়ে পিঠের শিরদাঁড়া যেন অবশ হয়ে গেছে।

বিশাল সাবধানে বালিশটা কাত করে কুমুকে ধরে বসিয়ে দিল।

ঠিক আছে। এইবার শোন।

কুমু মৃদু গলায় বলতে শুরু কবল।

ঘুম ভেঙে দেখলাম বজরায় শুয়ে রয়েছি। যমদূতের মতন সব চেহারা চারপাশে ঘোরাফেরা কবছে। তাদেব মাঝখানে পঞ্চানন চক্রবর্তীও বসে রয়েছে। আমি চোখ খুলতেই আপদটা কাছে এসে দাঁড়াল। এক গাল হেসে বলল, কেমন আছ এখন ? চোখ বন্ধ করলাম। শবীরটা খুব ক্লান্ত লাগছিল।

দু রাত দু দিন বজরায় কেটেছে। দাঁতে জল পর্যন্ত দিই নি। পঞ্চানন চক্রবর্তী মুড়ি গুড় কাছে রেখেছিল, পা দিয়ে জলে ফেলে দিয়েছি। বজরা থেকে নেমে গরুর গাড়ীতে উঠলাম। তারপর আবার বজরায়। এবাব ঘাটে নেমেই অবাক হলাম। অবশ্য বেশী কিছু দেখবার সুযোগ পাই নি। ঘাটের চাতালেই পালকি ছিল। তার মধ্যে গিয়ে ঢুকলাম।

কিন্তু যতটুকু দেখেছি, তাতেই আশ্চর্য লাগল। লোক গিজ গিজ করছে রাস্তায়। পালকির ছড়াছড়ি। ঘোড়ায় টানা গাড়ীও চলছে। লালমুখো সব সায়েবরা বেড়াচ্ছে নদীর ধাবে। লাল গোঁফ দাড়ি,

কারো কারো সঙ্গে আবার ঝলমলে পোশাক পরা মেমসায়েব। পরনে কুচি দেওয়া কাপড় মাটিতে লুটাচ্ছে। শহরের নাম কলকাতা। এই কলকাতা! পালকির দরজা ফাঁক করে দেখতে দেখতে চললাম।

বিশালের চোখের পলক পড়ল না। একমনে শুনছে। ওর স্বপ্নের শহর কলকাতা। ছেলেবেলার একমাত্র আশা কলকাতায় গিয়ে দাঁড়াবে। বিদ্যাসাগরের পায়ের কাছে। মানুষ হবার সঙ্কল্প নিয়ে। বিশাল যেতে পারে নি, কুমু গিয়েছে। কিন্তু গিয়েই বা কি লাভ হয়েছে। শহরে পেয়েছে আর এক কোপাইচণ্ডীর জঙ্গলের জীবন। দু হাতে কালি লেপে দিয়েছে শহরের লোক। টেনে হিঁচড়ে কুমুকে পাতালের অন্ধকারে নামিয়েছে।

বেশীক্ষণ দেখার সুবিধা হ'ল না। পাশে পাশে লাঠি হাতে যে পাইকটা যাচ্ছিল, সে টেনে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

গিয়ে উঠলাম বসাকবাড়ীতে। বিরাট বাগান বাড়ী। দেউড়িতে দারোয়ান। ঘরে ঘরে দামী আসবাব, বিরাট ঝাড়লণ্ঠন, দেয়াল-আয়না। বাগানের মাঝে মাঝে পাথরের মূর্তি। বসাকদের ছোট ছেলে রামজীবন বসাক। সবে ডানা গজিয়েছে। উড়তে শুরু করেছে। পঞ্চানন আমাকে তার হাতে তুলে দিয়ে সরে পড়ল।

মাস দুয়েক। প্রথম প্রথম রুখে দাঁড়িয়েছিলাম। হাতের কাছে যা পেয়েছি, ছুঁড়ে মেরেছি রামজীবনকে। কিন্তু ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে পড়লাম। জীবনে ঘৃণা এল, মরণে ভয়, অদ্ভুত এক জীবন্মৃত অবস্থা। রামজীবন ঘরে বন্ধ করে তালা দিয়ে গেল। বলে গেল পেটে ভাত না পড়লেই মেজাজ নরম হবে, ফণা গুটিয়ে মাটিতে বুক দিয়ে হাঁটবে সাপিনী।

কিন্তু ততদিন আর অপেক্ষা করতে হ'ল না। মাঝরাতে রামজীবন ঘরে ঢুকে সর্বনাশ করল। উঁচু মাথা ধুলোয় মিশিয়ে দিল।

শাড়ি হ'ল, গহনা হ'ল, নিজের পালকি, নিজের ঝি, চাকর সব পেলাম। ঠুনকো সতীত্বের বদলে এতগুলো জিনিস।

কুমু মুখ বেঁকিয়ে হাসল।

বিশাল দু হাঁটুর ওপর মুখ রেখে একাগ্রচিত্তে শুনতে লাগল। ছোটছেলেব রূপকথা শোনার মতন।

তারপর একদিন আদালতের পিয়াদা এসে বাড়ীর দখল নিল। তার আগে প্রায় মাস দুয়েক রামজীবন গা ঢাকা দিয়েছিল। ব্যবসায় পড়তি অবস্থা। মাঝদরিয়ায় বাণিজ্যের জাহাজ ডুবেছে, সে ঢেউ বসাকবাড়ীর ভিত্তিমূলে এসে লাগল। এত দিনেব গড়ে তোলা ব্যবসা টলমল করতে লাগল।

নিজের জিনিসপত্র টাকাকড়ি গুছিয়ে নিয়ে পথে এসে দাঁড়ালাম। সঙ্গে সহায় ছিল। শোভাবাজাবের গুপ্তদের বাড়ীর ছেলে শিবনারাণ। মাঝে মাঝে রামজীবনের সঙ্গে আসত আমার কাছে। রামজীবন সরে যেতে সে এগিয়ে এল।

ভ্রূ কুঁচকে বাইবের দিকে চেয়ে রইল বিশাল। মুখে চোখে বিরক্তির আঁচড়। আর শুনতে ভাল লাগছে না। ধাপে ধাপে মানুষের অবতরণের কাহিনী।

বিশালের ভাবান্তর কুমুর চোখ এড়াল না।

কি, ভাল লাগছে না বুঝি?

না। বিশাল ঘাড় নাড়ল, বুঝলাম কতকগুলো মানুষ তোমাকে নিয়ে আর তোমার জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে, তারপর কি হ'ল বল?

বলতে গিয়েই কুমু থেমে গেল। আবার কাশির বেগ। আবাব রক্তের ছিটে বিছানার ওপর।

বিশালের দিকে করুণ দৃষ্টি মেলে কুমু বলল, আজ আর পারছি না। বড় কষ্ট হচ্ছে। কাল শোনাব তোমায়। বাকি কাহিনী বলব একটু একটু ক'রে।

পরের দিন হ'ল না। কুমুর অবস্থা খুব খারাপ। সারা রাত কাশল, সারা দিন। দু কান চেপে বিশাল ঘরের দাওয়ায় বসে রইল। কি পাপে কুমুর এই শাস্তি! দশটা কুকুর ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়েছে ওকে, সেকি ওর দোষ!

মানদার কাছে খোঁজ নিয়ে বিশাল বদ্যির বাড়ী গিয়ে দাঁড়াল অসুখের খবর পেয়ে ছাতি বগলে করে বদ্যি বিশালের সঙ্গে কয়েক পা এগিয়েছিল। কিন্তু কোথায় যেতে হবে শুনে একেবারে অগ্নিশর্মা।

পাপিষ্ঠ কোথাকার! আমার তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে। আমার সর্বনাশ করার চেষ্টা!

বদ্যি তীরবেগে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে শাপশাপান্ত আরম্ভ করল।

মুহূর্তের জন্য বিশালের দুটো চোখ জ্বলে উঠল। গরম হয়ে উঠল শরীরের রক্ত। দুটো হাত দিয়ে বদ্যির গলাটা টিপে ধরে তার জিভ টেনে বের করতে হয়। যাবে না চিকিৎসা করতে। আলবৎ যাবে, একশোবার যাবে।

দু পা এগিয়েই বিশাল দাঁড়িয়ে পড়ল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে বোঝাল। বিশাল কবে মরে গেছে, তবে কিসের তেজ, কিসের স্পর্ধা! বৈষ্ণব হবে তৃণের চেয়ে নিচু। আশ্রমের সাধুরা তো এই কথাই বলেছিলেন। কে কার চিকিৎসা করে, কে কাকে পরমায়ু দেয়। প্রেমে বশ করতে হয় মানুষকে। রাগ, দ্বেষ, ঘৃণা এসব চণ্ডালের ধর্ম, বৈষ্ণবের নয়।

ফিরে গিয়ে বিশাল অনুনয় বিনয় করল, কিন্তু ফল হ'ল না। বদ্যি যেতে নারাজ।

মাথা নিচু করে বিশাল ফিরে গেল। মানুষে মানুষে কেন এ ভেদাভেদ! বিশু যে রূপান্তরিত হয়েছিল বিশাল সর্দারে, সে দোষ কি তার? আজ যে কুমু জীবনের সার সম্পদ হারিয়েছে, কে তার জন্য দায়ী?

আশ্চর্য, এরাই মানুষকে ঠেলে দেবে পাঁকের অতলে, আবার এরাই ঘৃণায় মুখ ফেরাবে। কতদিন চলবে এই অব্যবস্থা!

কুমু অনেকটা সামলে নিয়েছে। কাশির বেগ কম। দু চোখ বন্ধ করে চুপচাপ শুয়ে আছে।

বিশাল কাছে গিয়ে বসতেই কুমু চোখ খুলল।

কোথায় গিয়েছিলে?

বস্তির কাছে।

কি হ'ল? মিছামিছি পণ্ডশ্রম হ'ল তো? তোমার যেমন ছটফটানি। বস্তি এসে কি কববে? একি সারবাব ব্যায়বাম?

বিকালের দিকে মানদাকে দিয়ে কুমু বিশালকে ডেকে পাঠাল। বিশাল উঠানে চুপচাপ বসেছিল। কুমুব ডাকে ভিতবে এসে ঢুকল।

কি, এত বড় দুর্ধর্ষ ডাকাত ছিলে, আব মানুষেব এইটুকু কষ্ট দেখতে পারছ না? পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছ?

বিশাল অন্য দিকে মুখ ফেরাল। ছল ছল করছে দুটো চোখ। কুমুর দিকে সোজাসুজি চাইতে গেলেই ধবা পড়ে যাবে।

এস, বস এখানে। শবীবটা ভাল বোধ হচ্ছে না। বাকিটুকু তোমায় না বললে স্বস্তি পাব না।

বিশাল কাছে বসল। কুমুর একটা হাত টেনে নিল নিজের হাতে। শীর্ণ হাত, শিরার জট এখানে ওখানে। কুমুকে কোন দিন বিশাল সে ভাবে দেখে নি, তবু তার টেঁপীব কথা মনে পড়ে গেল। অটুট স্বাস্থ্য, যৌবন-দৃপ্ত দেহ। কিন্তু মানুষেব ঈর্ষায় সে নিটোল দেহও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। ঠিকই বলত নিমে সর্দার, মানুষের চেয়ে ভয়ানক জীব বুঝি ত্রিভুবনে নেই।

বছরের পর বছর কাটল। এক হাত থেকে ছিটকে পড়লাম আর

আর একজনের হাতে। · যৌবন নিয়ে লোফালুফি খেলা চলল। রোগ ধরল, তাও নিস্তার নেই। মানুষের দেহের খিদে মেটাতে নিজের দেহ জরাজীর্ণ হয়ে গেল। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষের মোহও কমে এল। দালান থেকে নেমে নেমে খোলার ঘরে এসে পৌছলাম। আগে বাবুরা আসতেন, এবার আসতে শুরু করল তাদের নায়েব গোমস্তারা। ক্রমে ক্রমে অবস্থা চরমে উঠল।

শীতের রাত। পরনে শতছিন্ন শাড়ি। চিমটি কাটলে বোধ হয় ময়লা উঠে আসে। একলা নয়, আরো দু জন সঙ্গে ছিল। দু দিন খদ্দের আসে নি। আমরা রাস্তার ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম। এ পথে মজুররা ফিরবে। তাদের দু একজন যদি চোখ ফেরায়।

রাস্তায় লোক চলাচল নেই বললেই হয়। মাঝে মাঝে বড়লোকের দু একটা জুড়ি গাড়ি বাগানবাড়ীর দিকে চলেছে হঠাৎ হন হন করে একটি লোক এগোতে লাগলেন রাস্তার ওপর দিয়ে। গায়ে একটা মোটা চাদর, পায়ে চটি। রাস্তার টিমটিমে আলোতেও লোকটির প্রশস্ত ললাট চক চক করে উঠল। খদ্দের ভেবে তিনজনেই এগিয়ে গিয়েছিলাম, লোকটি আড়চোখে একবার দেখে সোজা হাঁটতে শুরু করলেন। কয়েক পা গিয়েই কিন্তু থেমে গেলেন। পিছন ফিরে ফিরে দেখলেন।

হাড় কাঁপানো শীত। কনকনে উত্তরে হাওয়া। দলের দু জন ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছিল। আমি তখনও বাইরে দাঁড়িয়ে। লোকটি ফিরে এসে আমার মুখোমুখি দাঁড়ালেন।

করুণাভরা দুটি চোখ। সে চোখের দৃষ্টির সামনে নিজের থেকেই মাথা হেঁট হয়ে আসে।

এই শীতে এই পোশাকে এ ভাবে দাঁড়িয়ে আছ কেন মা? অসুখ বিসুখ হয়ে যাবে যে?

এমন কথা বাবা চোখ বোজবার পর আর কারো কাছ থেকে শুনি

নি। নিজেকে সংযত করতে পারলাম না। বললাম নিজেদের পেশার কাহিনী, সমাজ থেকে ছিটকে পড়ার ইতিহাস।

লোকটির দুটি চোখ জলে ভরে এল। নিজের গায়ের চাদর খুলে আমার গায়ে দিয়ে দিলেন। বেদনার্দ্র গলায় বললেন, তুমি আজ পথে এসে দাঁড়াও নি মা, পথে দাঁড়িয়েছে আমাদের তৈরী বিকৃত গলিত সমাজ। পাপ করেছি আমরা। সে পাপের ভার তোমরা নিয়েছ। তোমাদের কথাও ভাবছি মা। তোমাদের জন্যও কিছু একটা না করতে পারলে আমার কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। অনেক কাজের ভার ঘাড়ে এসে পড়েছে, অথচ সাহায্য করা দূরে থাক, এ দেশের লোক কেবল বাধা দিচ্ছে। ছড়া বাঁধছে আমাকে নিয়ে, আমাকে হেয় করে জেলেপাড়ার সং বের করছে। তবে এসব কিছু নয় মা। প্রথমে যে নতুন কিছু করে তাকে এসব আঘাত সইতেই হয়, এসব অসুবিধাও ভোগ করতে হয়। চলি মা, আশীর্বাদ কবি এ জীবনেব শেষে যেন শান্তি পাও।

ততক্ষণে আমি লোকটির পায়ের কাছে বসে পড়েছি। ইচ্ছা ছিল, তাঁর দু পায়ের ধুলো নিয়ে সর্বাঙ্গে মাখি, কিন্তু তাঁকে ছুঁতে সাহস হ'ল না। কেবল বললাম, আপনি কে বাবা? অভাগিনীর ওপর এত কৃপা?

ভদ্রলোক হাসলেন। চোখে জল, মুখে হাসি। একটু থেমে কি ভাবলেন, তারপর বললেন, এ দেশের লোক আমায় বিদ্যাসাগর বলে। আসল নামটা কবে চাপা পড়ে গেছে।

বিদ্যাসাগরের নাম তোমার কাছে প্রথম শুনেছিলাম, তারপর কলকাতায় অনেকবার শুনেছি। বাবুরা কেউ ভাল বলতেন, কেউ গালাগাল দিতেন। অনেক গরীবদের ছেলেকে স্কুলের মাইনে পর্যন্ত তিনি দিতেন। বসাকবাড়ীর রাঁধুনীর কাছেই শুনেছিলাম। তার ভাইপোকে স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিল, বিদ্যাসাগরের ভরসায়।

সেই বিদ্যাসাগর! আমরা মুখ্যসুখ্য মানুষ, আমাদের কাছে তিনি বিদ্যাসাগর নন, তিনি দয়ার সাগর।

তিনি চলে যাবার অনেকক্ষণ পর পর্যন্ত সেই পথের ওপর বসেছিলাম। দু হাতে পথের ধুলো নিয়ে মাথায় দিয়েছি। তাঁর পায়ের ছোঁয়ায় পথের ধুলোও পবিত্র।

বিশালের জ্ঞান নেই, চেতনা নেই। সমস্ত ইন্দ্রিয়কে কেন্দ্রীভূত করেছে দুটি কানে। বিদ্যাসাগর তার কাছে শুধু একটা নাম। কৈশোরের স্বপ্ন। কিন্তু কুমু ভাগ্যবতী, তাঁর দর্শন পেয়েছে, স্নেহের স্পর্শ পেয়েছে।

তারপর?

তাবপর আর কিছু নেই। আমার কথাটা ফুরালো। তাঁর দর্শন পাবার পর থেকে আর পথে দাঁড়াতে পারলাম না। দেহকে আর পণ্য বলে মনে হ'ল না। এর জন্য সঙ্গিনীদের টিটকারি, বাড়ীওয়ালীর নির্যাতন সব সহ্য করেছি মুখ বুজে। বেশীদিন সহ্য করতে হ'ল না। শরীরে রোগ ধরল, কাশি আগেই হয়েছিল। একদিন আচল দিয়ে কাশির বেগ চাপতে যেতেই আঁচলে রংয়ের ছিটে লাগল। আশ পাশ থেকে সবাই সরে দাঁড়াল। কালব্যাধি। কে মরতে কাছে এসে দাঁড়াবে!

বাড়ীওয়ালী বন্দোবস্ত করে দেবীপুরে পাঠিয়ে দিল। নিজের কিছু সোনাব গহনা ছিল, তাই ভেঙে এ ক মাস চলল। আসবার সময় সঙ্গের মেয়েছেলেরাও কিছু টাকা দিয়েছিল। তাদের সামর্থ্য-অনুযায়ী।

কুমু থামল। চোখ দুটো বন্ধ করে চুপচাপ শুয়ে রইল কিছুক্ষণ। নিশ্বাস আটকে আসছে। বুকটা ফুলে ফুলে উঠছে, কিন্তু মুখের রেখায় যন্ত্রণার সামান্য আভাসও নেই।

বিকেলে একটু দুধ মুখে দেয়। রাত্রে আর কিছু নয়। কিন্তু

সেদিন দুধটুকুও পেটে গেল না। মুখ দিয়ে আর নাক দিয়ে সবটা বেরিয়ে গেল।

রাত তখন অনেক। এলোমেলো ঝোড়ো হাওয়া বইতে আরম্ভ করেছে। দু এক ফোঁটা বৃষ্টিও শুরু হয়েছে। দাওয়ার ওপর বিশাল শুয়েছিল। রান্নাবান্না সেরে মানদা সন্ধ্যার পরেই বাড়ী চলে যায়।

হঠাৎ গোঙানির আওয়াজে বিশালের ঘুম ভেঙে গেল। শব্দ আসছে কুমুর ঘর থেকে। তাড়াতাড়ি উঠে বিশাল দরজা ঠেলে ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকল।

কুমু ছটফট করছে। বিস্ফারিত দুটি চোখ। যন্ত্রণায় দুটো ঠোঁট কুঁচকে আসছে। পাশের মাটির পাত্রে রক্ত জমে কাল হ'য়ে রয়েছে। ঠোঁটের দু পাশেও রক্তের ছোপ।

সাবধানে নিজের ধুতির কোণ দিয়ে বিশাল রক্ত মুছিয়ে দিল। কুমুর মাথাটা বালিশ থেকে নেমে গিয়েছিল, সন্তর্পণে মাথাটা ঠিক ক'রে দিল।

ঝুঁকে পড়ে ডাকল, কুমু, কুমু।

কুমু বিশালের দিকে মুখ ফেরাল। ইসারা করল চোখের।

কিছু বলবে আমায়?

কুমু শীর্ণ একটা হাত দিয়ে কোণেব কাঠেব বাক্সের দিকে দেখিয়ে অস্ফুট গলায় বলল, চাবি।

দু একবার বলার পর বিশাল বুঝতে পারল। উঠে কাঠের বাক্স খুলল। একেবারে কোণের দিকে ছোট টিনের কৌটায় মরচে ধরা একটা চাবি।

বিশালের হাতের ওপর হাত রেখে কুমু বলল, রাধাগোবিন্দজীর মন্দিরের চাবি। আমার কাছে ছিল। ফেরত দেবার সুযোগ পাই নি। তুমি রাখ।

আমি রাখব? মন্দিরের সেবায়েত নিশ্চয় আছেন একজন?

কুমু ঘাড় নাড়ল। জানি না। তুমি রেখে দাও। সম্ভব হ'লে খোঁজ ক'র।

কাশি আসতেই কুমু আবার থেমে গেল।

মাথা নিচু করে বিশাল চুপচাপ বসে রইল। ছু চোখ বেয়ে টপ টপ করে জলের ফোঁটা মেঝের ওপর পড়ল।

আর একটা কথা। অনেকক্ষণ পরে কুমু কথা বলল।

বল।

বাক্সেব মধ্যে সেই চাদরটা আছে, সেটা আমি যাবার সময় আমাব গায়ে দিয়ে দিও।

বিশাল আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়ল।

কুমু একদৃষ্টে চেয়ে রইল বিশালেব দিকে। এক সময় অস্পষ্ট গলায় বলল, এ কি, তুমি কাঁদছ? তার চেয়ে আমায় ভগবানের নাম শোনাও। যাবার সময় ভাল কথা কিছু শুনে যাই।

কিন্তু ভগবানের নাম বিশাল কি শোনাবে! কতটুকু তার পুঁজি! আর জানেই বা কি।

হঠাৎ কথাটা তার মনে পড়ে গেল। পরশপাথর তো সঙ্গেই রয়েছে। কিসের ভয়। এর স্পর্শে বিশাল মুক্তি পেয়েছে। কোপাই-চণ্ডীর আরণ্য-আত্মার গ্রাস থেকে। কুমু তো আরো নির্ভয়। মহাপুরুষেব আশীর্বাদ রয়েছে তাকে ঘিরে।

বিশাল সখারামের পুঁথি বেব করে পড়তে আরম্ভ করল। পড়তে পড়তে তার ছু চোখের পাতা ভিজে উঠল। কুমুর চোখও শুকনো রইল না।

অনেক রাতে বিশাল উঠে পড়ল। কুমু বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। বাইরে ঝড়ের দাপটে নুয়ে নুয়ে পড়ছে গাছের মাথাগুলো। চাপ চাপ মেঘ জমেছে আকাশে। হয়তো তুমুল বর্ষণ শুরু হবে।

একেবারে দাওয়ার কোণে বিশাল শুয়ে পড়ল। ভোরের দিকে বৃষ্টির ফোঁটা গায়ে পড়তেই উঠে পড়ল। দারুণ ঝড় জল শুরু হয়েছে। দমকা হাওয়ায় গাছের একটা ডাল আছড়ে এসে পড়ল উঠানের ওপর। একদিকের দর্মার বেড়া কাত হয়ে পড়ল।

জানলার শব্দ হ'তেই বিশাল চমকে উঠল। কুমুর মাথার কাছের জানলাটা বাতাসে খুলে গেছে। এখনি ঘরের মধ্যে জল আসবে।

সাবধানে দরজাটা খুলে বিশাল ঘরের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল। কুমুর বিছানা ভিজে গেছে। জানলা দিয়ে ঝোড়ো হাওয়ায় পাতার কুচি এসে পড়েছে ঘরের মেঝেয়।

বিছানার পাশ দিয়ে এগোতে গিয়েই বিশালের সন্দেহ হ'ল। হাঁটু মুড়ে বসে একটা হাত রাখল কুমুব নাকের নিচে। না, নিশ্বাস পড়ছে না। বুকে হাত রাখল। নিস্পন্দ। সমস্ত শবীব বরফেব মতন ঠাণ্ডা।

গলার কাছে কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠল কান্না। কত বছব আগেকার এক স্বর্ণ চাঁপা, অনাদরে অযত্নে একটু একটু করে তাব সৌবভ, বর্ণ, দীপ্তি সব হারিয়েছিল। আজ একেবাবে নিশ্চিহ্ন হ'ল। মুছে গেল পৃথিবী থেকে।

একটুখানি দাঁড়িয়ে বিশাল কাঠের বাক্স থেকে সন্তর্পণে মোটা চাদরটা বের করে কুমুর আপাদমস্তক ঢাকা দিয়ে দিল।

আর ভয় নেই। মহাপুরুষের স্নেহ-স্পর্শ আচ্ছন্ন কবে রাখবে কুমুর নশ্বর দেহ। অগ্নিশুদ্ধি হবাব আগে পর্যন্ত পরম প্রশান্তি।

পা মুড়ে বিশাল বসল। কোলের ওপর সখারাম কবিয়ালের পুঁথি। চিৎকার করে নয়, খুব আস্তে, প্রায় অস্পষ্ট কণ্ঠে বিশাল পড়তে শুরু করল।

নিমাই গৃহত্যাগ করেছে। চোখে অন্ধকার দেখছেন শচীমাতা। করুণ-স্বরে বিলাপ করে চলেছেন। বিলাপ-ধ্বনির অনুরণন উঠেছে শূন্য গৃহে, প্রান্তরে, শহরে, বুঝি সারা বিশ্বে।

সব শেষ হ'তে বিশাল আবার পথের ওপর এসে দাঁড়াল। ধুতির কোণে চাবিটা শক্ত করে বেঁধে নিয়ে এগোতে আরম্ভ করল। একটা কাজের ভার দিয়েছে কুমু। তার শেষ নির্দেশ। এ কাজটা শেষ হ'লেই বিশালের ছুটি।

বিশাল থামল না। দিন রাত সমানে হাঁটল। নদীর ধারে যখন এসে পৌঁছল তখন রুক্ষ মাথা, এক মুখ দাড়ি, হাঁটু পর্যন্ত ধুলো।

নদীতে নেমে আঁজলা আঁজলা জল খেল। জল নিয়ে মুখে চোখে দিল, তারপর ঘাটে বাঁধা নৌকার মাঝির দিকে ফিরে বলল, পার করে দেবে ভাই? পারের কড়ি কিন্তু নেই।

মাঝি চেয়ে দেখল। পরনে গেরুয়া। কাঁধে ঝুলি। খালি পা।

যাবে কোথায় গো বাবাজী?

গোবিন্দপুরে, পোড়াগাঁ পার হয়ে।

সে তো অনেকটা দূর। অপেক্ষা করতে হবে, যদি যাত্রী পাই তো যাব।

বিশাল ঘাটের ধারে এক গাছের ছায়ায় বসল।

যাত্রী জুটে গেল। জন দুয়েক যাবে শিবানীপুর, আর এক যাত্রার দল যাবে গোবিন্দপুর পার হ'য়ে সুন্দবীর হাট।

গুটি গুটি বিশাল উঠে বসল।

গোবিন্দপুরের ঘাটে এসে যখন পৌঁছল, তখন সবে ভোর হ'চ্ছে। পুবের আকাশে রক্তাক্ত আঁচড়।

অনেক বদলে গেছে গোবিন্দপুব। বনজঙ্গল অনেক পরিষ্কাব। এধারে ওধারে পাকা দালান উঠেছে।

বিশাল একটু দাঁড়িয়ে আবার চলতে শুরু করল।

পথ ঘাট আর কিছুই তার মনে নেই। পথ ছেড়ে জঙ্গলের দিকে মোড় ঘুরল।

নরহরি মুখুজ্জের বাড়ী গিয়ে লাভ নেই। এত বছর পরে আর কেউ তাকে চিনবে না। দেবার মত পরিচয়ও তার কিছু নেই। লোকালয়ে আর নয়। কোপাইচণ্ডীর জঙ্গলেও আর ফিরে যাবে না। অন্য কোথাও, যেখানে ওর ফেলে আসা ঘৃণিত জীবনের কোন ছাপ থাকবে না, কেউ আলোচনা করবে না তা নিয়ে।

চলতে চলতেই বিশাল থেমে পড়ল। চাঁপাগাছ আর নেই, কুমুও যেমন নেই। পাশেব আশশ্যাওড়া গাছটা আজো দাঁড়িয়ে রয়েছে। এদিকের বিরাট বটগাছটাও। আরও ঝুরি নেমেছে। নতুন শাখাপ্রশাখায় আরো জমজমাট মনে হ'চ্ছে।

বাঁ হাতি পথ ধরে বিশাল দ্রুত পা চালাল। কুমুদের চালাঘর নিশ্চিহ্ন। সেখানে বিরাট একটা ইঁটখোলা। পোড়া আধপোড়া ইঁটের সোঁদা সোঁদা গন্ধ। কেউ কোথাও নেই।

একটু দাঁড়িয়ে থেকে বিশাল আবার চলতে শুরু করল। এবার গতি অনেক মন্থর।

ঠিক সামনে রাধাগোবিন্দজীর মন্দির। একদিকের দেয়াল ভেঙে পড়েছে। বট আর অশত্থের শিকড় আঁকড়ে ধরেছে ইঁটের গোছা। চাতাল ফেটে চৌচির। সিঁড়ির কাছ বরাবর যেতেই ঝটপট ক'রে বাদুড়ের পাল মন্দির থেকে উড়ে সামনের গাছে গিয়ে বসল। পাশের জঙ্গলের মধ্যে সরসর করে একটা শব্দ। এঁকে বেঁকে চলার ভঙ্গী শ্যাওলায় সবুজ হ'য়ে গিয়েছে মন্দিবের দেয়াল।

চাবি দিয়ে বিশাল সন্তর্পণে তালা খুলল।

দরজার সামনে দাঁড়িয়েই বিশাল অবাক।

মেঝে পুরু হ'য়ে উঠেছে ধুলোয়, মাকড়শার জালে ভিতরে ঢোকাই দুষ্কর। আরতির পঞ্চপ্রদীপ একপাশে পড়ে রয়েছে। [illegible] নৈবেদ্যের থালা।

কিন্তু চারপাশের আবর্জনা আর মালিন্য মূর্তি দুটোকে একটুও [illegible]

করতে পারেনি। ঠিক তেমনি পূতশুভ্র রাধিকার বিগ্রহ, তেমনি উজ্জ্বল গোবিন্দজীর প্রস্তর দেহ।

সারা গোবিন্দপুর বদলে গেছে। চেনা মানুষজন কেউ কোথাও নেই। কেবল এই যুগলমূর্তি ছাড়া। প্রেমাকুল চোখে ঠিক আগের মতনই এরা চেয়ে আছে। তাপীতারণ স্নিগ্ধ দৃষ্টি। আর বুঝি বিশালের ভয় নেই। এবার অন্ধকার কেটে যাবে। সারা জন্মের নিকষ কালো অন্ধকার।

পরনের কাপড়ের কিছুটা খুলে বিশাল মেঝে পরিষ্কার করতে শুরু করল। একটুও দাগ যেন না থাকে, কোথাও সামান্য ময়লা নয়। কাজ শেষ করে বিশাল সাষ্টাঙ্গে যুগল বিগ্রহের সামনে প্রণাম করল।

মন্দিরের অপরিচ্ছন্নতা মুছে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে নিজের জীবনের মালিন্যও কি মুছে যাবে না? রাধাগোবিন্দজীর সামনে নিজেকে নিবেদন করলেও?

